أَخْلَاقُ النَّبِيِّ ﷺ

আখলাকুন্ নবী (সা)

হাফিয আবূ শায়খ ইস্‌ফাহানী (র)

অনুবাদ

মাওলানা মুশতাক আহমদ

মুহাম্মদ হাসান রহমতী

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

অধ্যাপক মোজাম্মেল হক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

আখলাকুন্ নবী (সা)
হাফিয আবু শায়খ ইসফাহানী (র)
মাওলানা মুশতাক আহমদ, মুহাম্মদ হাসান রহমতী, মাওলানা মুহাম্মদ মূসা এবং অধ্যাপক
মোজাম্মেল হক অনূদিত
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪২০

অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ১২৭
ইফাবা প্রকাশনা : ১৭৮২/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৬৩
ISBN : 984-06-0185-7

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ১৯৯৪

তৃতীয় সংস্করণ
মার্চ ২০০৪
চৈত্র ১৪১০
মুহাররম ১৪২৫

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ শিল্পী
মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম

মূল্য : ১১৯ টাকা

AKHLAKUN NABEE (SM) [Salient Features of the Prophet's (SM) Holy Character] : Written by Hafiz Abu Shaikh Isfahani (Rh) in Arabic, translated by Maulana Mushtaque Ahmed, Muhammad Hasan Rahmati, Maulana Musa and Prof. Mozammel Haque into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication Department, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 March 2004

E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 119..00 ; US Dollar : 4.50

মহাপরিচালকের কথা

মহান আল্লাহ্ তা'আলার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টি না করলে বিশ্বজগতের আর কিছু সৃষ্টি করতেন না। মহামহিম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাঁর আখলাকও স্বাভাবিকভাবে শ্রেষ্ঠতম। আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি রাসূল পাক (সা) প্রশিক্ষিত হন। এ জন্যই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) সংক্ষেপে বলেছিলেন তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। অর্থাৎ পবিত্র কুরআনে উত্তম চরিত্র ও মহান নৈতিকতার যে বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হয়েছে, রাসূল (সা)-এর মাঝে তার সবই বিদ্যমান ছিল।

এ কথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে 'উসওয়াতুন হাসানা' বা সুন্দরতম আদর্শ হিসেবেই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাঁর চরিত্র, আচার-আচরণ তথা সকল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারই নজির রেখে গেছেন। সাহাবায়ে কিরাম প্রিয় নবী (সা)-এর সকল সুন্দরতম আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও রীতি-নীতি যথাযথভাবে বিশ্বস্ত বর্ণনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। মহানবী (সা)-এর এই অতুলনীয় চরিত্র মাধুরী বিশ্বমানবের জন্য অনুকরণীয়।

রাসূল (সা)-এর জীবনের অনুপম চরিত্র মাধুরীর উপর যুগে যুগে বহু গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এর মধ্যে মুহাদ্দিস হাফিয আবূ মুহাম্মদ আবূ শায়খ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মদ ইবন জাফর ইবন হায়্যান আনসারী ইসফাহানীর রচিত 'আখলাকুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লাম ওয়া আদাবিহী' গ্রন্থটি অন্যতম। উল্লেখ্য, আবূ শায়খ ইবন আসফাহানী ৮৮৭ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৮২ খৃস্টাব্দে ৯৫ বয়সে ইন্তিকাল করেন। তিনি এ গ্রন্থে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্র ও নৈতিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন যা শুধু মুসলিম উম্মাহ্ই নয়—বিশ্বের যে কোন দেশের যে কোন মানুষের জন্য নির্দ্বিধায় তা অনুসরণীয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এ গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ 'আখলাকুন্ নবী (সা)' নামে প্রকাশ করেছে। বর্তমানে এ গ্রন্থের তৃতীয় মুদ্রণই এর বিপুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে।

মহান আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে সুন্দরতম চরিত্র ও গুণাবলীর অধিকারী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামকে মানব জাতির জন্য একমাত্র দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। এর পূর্ণতা দান করেছেন তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা) যেমন ইসলাম প্রচার করেছেন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছায় তার প্রসার ও বিকাশ ঘটিয়েছেন, তেমনি নিজের জীবনাচরণ, চরিত্র ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবেও নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেছেন এভাবে ঃ "তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (৩৩ ঃ ২১)

হযরত মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্র প্রেরিত নবী ও রাসূল হিসেবে ছিলেন সম্পূর্ণরূপে সফল। নিজের অনন্যতার বিষয়টি তিনি কখনোই উল্লেখ না করলেও সেই বিশেষণেই তিনি ভূষিত হয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনে এমন কিছুই করেন নি যার কোন ত্রুটি বা খুঁত চোখে পড়ে কিংবা তার সমালোচনা করা যায়। বস্তুত এমন নিখুঁত, অমলিন ও পরিপূর্ণ জীবন ও চরিত্র বিশ্বের আর কোন মানুষের মাঝে দেখা যায় না।

'আখলাকুন্ নবী (সা)' গ্রন্থটি রাসূল (সা)-এর জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিকের একটি বিশ্বস্ত বিবরণ। এ গ্রন্থের মূল রচয়িতা প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হাফিয আবূ শায়খ ইসফাহানী (জন্ম ২৭৪ হিজরী, ইন্তিকাল ৩৬৯ হিজরী)। অত্যন্ত সুখ্যাতিসম্পন্ন এ গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদ করেন মাওলানা ড. মুহাম্মদ আহমাদ মুখতার কমর। বহু পরিশ্রমে তিনি এর সহায়ক ভাষ্যও তৈরি করেন। বলা বাহুল্য, এই উর্দু অনুবাদটিও বিপুল খ্যাতিলাভ করে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বাংলাভাষী মুসলমানদের বিষয়টি বিবেচনা করে এ গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯৪ সালের অক্টোবর মাসে 'আখলাকুন্ নবী (সা)' প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন এই গ্রন্থটি পাঠক মহলে বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে এর পুনর্মুদ্রণ করা হয়। পাঠকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে বর্তমানে গ্রন্থটির তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো।

আমরা গ্রন্থটির অনুবাদসহ এর প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ। অতীতের ন্যায় বর্তমানেও পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি সাদরে গৃহীত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর প্রিয় হাবীবের অনুপম চরিত্র অনুযায়ী জীবন গড়ার তওফিক দিন। আমীন!

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদ প্রসঙ্গে দু'টি কথা

আল্‌হামদুলিল্লাহ্। মানুষ আল্লাহ্‌র খলীফা বা প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধির দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তাই তাঁদের কথা, কাজ ও আচরণ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত। আমাদের নবীজী সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের জন্য রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

আল্লাহ্ তা'আলা যাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশংসাপত্র দান করেন তাঁর চরিত্র যে কত উন্নত, কত মহান ও মহীয়ান হতে পারে তা কারও পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। তাই লক্ষ্য করছি, নবী চরিতের যে দিকটিই পড়ছি তাতেই তাঁকে সুশোভিত দেখতে পাচ্ছি। এজন্যই আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে আমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন ঃ "রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদের বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাক" (৫৯ ঃ ৭)। তাঁর প্রতিটি কথা, প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি ভংগী অনুসরণযোগ্য। মহানবী (সা)-এর অনুসরণ করতে হলে তাঁর জীবন চরিত সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নের প্রয়োজন।

এ প্রয়োজন পূরণের তাগিদেই মুহাদ্দিস আবূ শায়খ ইবন হায়্যান ইসফাহানী (মৃঃ ৩৬৯ হিজরী) আলোচ্য গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানিতে নবীচরিত সম্পূর্ণরূপে হাদীস ভিত্তিতে আলোচনা করা হয়েছে। এটা ধারাবাহিক কোন জীবনী গ্রন্থ নয়। গ্রন্থখানির উর্দূ অনুবাদকের ব্যাখ্যাও কোথাও হুবহু, কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও সংযোজন সহ পেশ করা হয়েছে।

বস্তুত ইসলামে আকীদা-বিশ্বাস ও অবশ্যপালনীয় ইবাদতের পরেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে "আখলাক" বা চরিত্র-নৈতিকতা। সদাচার, সদ্ব্যবহার, সৎস্বভাব, মনুষ্যত্ব, ভদ্রতা, দয়া সবই আখলাক তথা মানব চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। যার চরিত্র যত উন্নত সে তত মহৎ মর্যাদার অধিকারী। যার আচার-ব্যবহার খারাপ তাকে কেউই পছন্দ করে না। তাই চরিত্রের উন্নতি সাধন করতে হলে মহানবী (সা)-কে অবশ্যই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সেই আদর্শ মানদণ্ডই আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। গ্রন্থখানি পাঠে পাঠক-পঠিকাগণ এবং বিশেষত নবী-প্রেমিকগণ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হবেন।

গ্রন্থখানি নবী চরিতের উত্তম বর্ণনাধারা আমাদেরকে এর অনুবাদে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছে। এর বিনিময় এ জগতে নয়, আখিরাতে পাবার আশায় আমরা গ্রন্থখানির রয়্যালটি বাবদ প্রাপ্য মসজিদ-মাদ্রাসা-এতিমখানার জন্য ওয়াকফ করে দিলাম। আল্লাহ্ পাক আমাদের এ মেহনতকে ইবাদত হিসাবে কবূল করুন। আমীন!

মাওলানা মুশতাক আহমদ, মুহাম্মদ হাসান রহমতী,
মুহাম্মদ মূসা, অধ্যাপক মোজাম্মেল হক

কোন কোনও রিওয়ায়াতে আছে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ভালবাসা লাভের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ احب عباد الله الى الله احسنهم اخلاقا "আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাঁর প্রিয়তম বান্দা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সবচেয়ে অধিক ভাল।" (তাবারানী)

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে ঃ

ان من احبكم الى واقربكم منى فى الاخرة مجلسا احاسنهم اخلاقا -

"তোমাদের মধ্যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং আখিরাতে আমার মজলিসসমূহে আমার সবচেয়ে নিকটতম হবে সেই ব্যক্তি যে সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের অধিকারী।"

শামায়েল ও আখলাক সম্পর্কিত গ্রন্থরাজি একথার সাক্ষী যে, সাহাবায়ে কিরাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমস্ত সুন্দরতম আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ও রীতি-নীতি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁরা তাঁদের বর্ণনা দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছেন। অতঃপর তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন এবং হাদীসের হাফিযগণ এই অমূল্য রত্নের সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং মাগাযী, সীরাত, শামায়েল ও আখলাক শিরোনামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ সংকলন করেছেন। খুব সম্ভব এ বিষয়ে সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচনা করেন ইমাম বুখারী (র)-এর উস্তাদবৃন্দের উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম ইবন শিহাব যুহরী (র) (মৃত্যু ১২৪ হিজরী)। অতঃপর এ ধারা অব্যাহত থাকে। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় কালের উলামায়ে কিরাম এ সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করে এই রত্নভাণ্ডারের হিফাযত করেছেন। আল্লামা শিবলী (র) তাঁর গৌরবময় গ্রন্থ 'সীরাতুন নবী'-তে সেই সকল মুহাদ্দিসের একটি দীর্ঘ তালিকা পেশ করেছেন, যাঁদেরকে সীরাত বিষয়ের নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ রূপে গণ্য করা হয়। তাঁদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবূ বকর (রা)-এর দৌহিত্র উরওয়া ইবন যুবায়র (র) (মৃত্যু ৯৪ হিজরী); হযরত শাবী (র) (মৃত্যু ১০৯ হিজরী); ইবন কাতাদা আনসারী (র) (মৃত্যু ১২৪ হিজরী) মাগাযী ও সিয়ার সম্পর্কে তাঁদের বিপুল জানাশোনা ছিল। ইমাম যুহরী (র); মূসা ইবন উকবা আসাদী (র) (মৃত্যু ১৪১ হিজরী); প্রসিদ্ধ সীরাত সংকলক হিশাম ইবন উরওয়া (র) (মৃত্যু ১৪৬ হিজরী); মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক (র) (মৃত্যু ১৫০ হিজরী); উমার ইবন রাশিদ আযদী (র) (মৃত্যু ১৫২ হিজরী); (সীরাত সম্পর্কে তাঁর রচনা 'المغازى' একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ) মুহাম্মাদ ইবন উমার আল ওয়াকিদী (র) (মৃত্যু ২০৭); উমর ইবন শুহব বসরী (র) (মৃত্যু ২৬২ হিজরী); মুহাম্মাদ ইবন ঈসা তিরমিযী (র) [মৃত্যু ২৭৯ হিজরী]; যিনি সিহাহ্ সিত্তা সংকলকদের অন্যতম এবং সীরাত ও শামায়েল বিষয়ক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'শামায়েলে

তিরমিযী'-এর রচয়িতা। এ ছাড়াও অনেক বড় বড় মনীষী রয়েছেন, আল্লামা শিবলী (র) যাঁদের নাম উল্লেখ করেন নি। নিম্নে এরূপ কতিপয় মনীষীর নাম উল্লেখ করা গেল।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবূ শায়খ ইবন হায়্যান ইসফাহানী [মৃত্যু ৩৬৯ হিজরী] তিনি সুবিখ্যাত গ্রন্থ "اخلاق النبى صلى اللّٰه عليه وسلم وادابه" -এর রচয়িতা। সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ যার তরজমা আপনাদের সম্মুখে পেশ করা যাচ্ছে। হাফেয আবূ বাকর মাকরীযী (র) [মৃত্যু ৩৮১ হিজরী]; তিনি 'الشمائل' নামক গ্রন্থের রচয়িতা। হাফিয আবুল আব্বাস মুসতাগফিরী (র) [মৃত্যু ৪৩২] এবং "الانوار فى شمائل النبى المختار" শীর্ষক গ্রন্থের রচয়িতা হাফিয আবূ মুহাম্মাদ হুসায়ন ইবন মাসউদ বাগাবী (র) মৃত্যু ৫১৬ হিজরী]। এঁরা সকলে স্বনামধন্য মনীষী এবং প্রাচীন সিয়ার ও মাগাযী সংকলক। তাঁদের পরবর্তীকালেও অনেক বড় বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। এ সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তাঁদের তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। তজ্জন্য ইসলামী গ্রন্থাগারসমূহের শরণাপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ "اخلاق النبى صلى اللّٰه عليه وسلم وادابه"-এর রচয়িতা হাফিয আবূ মুহাম্মদ আবূ শায়খ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ ইবন জাফর ইবন হায়্যান আনসারী ইসফাহানী। তিনি ২৭৪ হিজরী মুতাবিক ৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন এবং বড় বড় মুহাদ্দিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর উস্তাদবর্গের মধ্যে স্বীয় নানা মাহ্মূদ ইবন ফারাজ (র), শায়খ ইবরাহীম ইবন সা'দান (র), আবূ বাকর ইবন আবূ আসিম (র) ও হাফিয আবূ ইয়ালা (র) উল্লেখযোগ্য। অনুরূপ তাঁর উল্লেখযোগ্য শিষ্য হচ্ছেন হাফিয আবূ বাকর ইবন মারদাওয়ায়হ (র), হাফিয আবূ সাদ আল-মালানী (র), হাফিয আবূ নুআয়ম ইসফাহানী (র) প্রমুখ। হাফিয আবূ নুআয়ম তাঁর "حلية الاولياء" ও "دلائل النبوة" গ্রন্থ দু'টিতে আবূ শায়খ (র) সূত্রে বহু হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর রচনাবলির মধ্যে اخلاق النبى - الاذان - الاحكام العظمة - التفسير - النتف، النوادر، التوبيخ - ثواب الاعمال - وادابه - صلى اللّٰه عليه وسلم প্রভৃতি বিখ্যাত। তবে এখন পর্যন্ত সব পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত একমাত্র আখলাকুন নবী ছাড়া। আবূ মানদা (র), হাফিয আবূ বাকর খাতীব (র), হাফিয আবূ নুআয়ম ইসফাহানী (র), হাফিয যাহাবী (র) প্রমুখ তাঁর সপ্রশংস প্রত্যয়ন করেছেন। তাঁর ছাত্র আবূ নুআয়ম ইসফাহানীর বর্ণনামতে তিনি মুহাররাম ৩৬৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা শায়খ আবুল ফাদল আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ সিদ্দীক (র)-কে উত্তম বদলা দিন। তিনি মিসরের হাদীস গ্রন্থসমূহের প্রকাশ ও প্রচারের সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটির বারবার অনুরোধে اخلاق النبى صلى اللّٰه عليه وسلم وأدابه গ্রন্থখানি সম্পাদনা করে হিজরী

১৩৭৮ সনে সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। অতঃপর শায়খ আহ্‌মাদ মুহাম্মাদ মারসী কৃত গবেষণা ও সংযোজনসহ ১২৯১ হিজরীতে এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়। গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ সম্পর্কে শায়খ আবদুল্লাহ্ ইবন মুহাম্মাদ সিদ্দীক লেখেন, আমার ভাই আবুল ফায়দ আহ্‌মাদ ইবন সিদ্দীক, শামায়েলে তিরমিযীর নির্ঘণ্ট তৈরি করেছিলেন। এ সময় তিনি জানতে পারেন হাফিয ইরাকী তাঁর 'تخريج احاديث احياء العلوم' শীর্ষক গ্রন্থে আবূ শায়খ ইসফাহানী রচিত 'اخلاق النبى صلى الله عليه وسلم وآدابه' এবং ইবনুদ দাহ্‌হাক কৃত 'الشمائل' গ্রন্থের খুব বেশি বরাত দিয়ে থাকেন। কাজেই তিনি এ গ্রন্থদ্বয়ের পাণ্ডুলিপি অনুসন্ধানে লেগে পড়েন। তিনি ইসকোরিয়াল গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি সূচির প্রতি চোখ বুলালে তাতে এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির উল্লেখ পান। সুতরাং তিনি ১৩৭৭ হিজরী দ্বিতীয়বার যখন মাদ্রিদ সফর করেন, তখন পাণ্ডুলিপির ফটোকপি লাভে সক্ষম হন। এভাবে আমি এর সংশোধন, সম্পাদনা ও মুদ্রণের সুযোগ পেয়ে যাই। যে ফটোকপির উপর আমি নির্ভর করি, তাতে অনুলিখনের তারিখ লেখা রয়েছে রবিউল আউয়াল ৫৬৬ হিজরী।

উপক্রমণিকা লেখক এ মূল্যবান গ্রন্থের সর্বপ্রথম উর্দু তরজমা করে পাঠকের সামনে পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করছে। এ রত্নভাণ্ডার এখন গ্রন্থ আকারে উর্দুভাষীদের সম্মুখে। আমি ১৩৮৩ হিজরীতে এর তরজমার কাজ শুরু করি। প্রথম দিকে তা প্রবন্ধ আকারে মাসিক 'বায়্যিনাত'-এ প্রকাশ পেত। তখন আমার শায়খ, মুর্শিদ, মহান উস্তাদ ও যুগের ইমাম শায়খুল হাদীস মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ ইউসুফ বিননূরী (র)-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আমার অপর উস্তাদ শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ নোমানী (মু. জি.)-এর সম্পাদনায় মাসিক পত্রটি প্রকাশিত হতো। তরজমার বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এ গ্রন্থের পুরো তরজমা হযরত আল্লামা ইমামুল আসর সায়্যিদ মুহাম্মাদ ইউসুফ বিননূরী (র) প্রশংসার চোখে দেখেন এবং মাসিক 'বায়্যিনাত'-এ প্রকাশ করার আদেশ দেন। হযরত মাওলানা ইদরীস মীরাঠী, মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী, মুফতী ওলী হাসান প্রমুখ উস্তাদ এর খুঁটিনাটি সব সংশোধন করে দিতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আরা তাঁদের সবাইকে উত্তম বদলা দিন।

সবশেষে আমি তাঁদের সকলের শুকরিয়া আদায় করছি, যাঁরা এই তরজমাকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সাহস যুগিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে আমার প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। বিশেষত শায়েখ তরীকত হযরত সায়্যিদ রাযিউদ দীন আহমাদ ফাখরী এবং আমার স্নেহাস্পদ ভাই ড. মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ্ মুখতার-এর। আমি তাঁদের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমার এই তুচ্ছ মেহনত কবুল করুন। আমাদের সকলকে নববী চরিত্র ও মুহাম্মাদী গুণাবলিতে ভূষিত হওয়ার তাওফীক দিন।

اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لايهدى لاحسنها الاانت واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و صحبه وسلم ـ

মুহাম্মাদ আহমাদ মুখতার কমর
মক্কা মুকাররমা
৯ মুহাররাম, ১৪০৯ হিজরী

সূচিপত্র

নবী (সা)-এর চারিত্রিক সৌন্দর্য	২১
নবী (সা)-এর দয়া, পরম ধৈর্য ও ক্রোধ সংবরণ	৩৮
নবী (সা)-এর পরম লজ্জাবোধ	৪৩
নবী (সা)-এর ক্ষমাগুণ সম্পর্কিত বর্ণনা	৪৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বদান্যতা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ	৬৪
নবী (সা)-এর সাহসিকতা ও বীরত্ব	৭৭
নবী (সা)-এর নম্রতা ও বিনয়	৮৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বোঝা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ	১০৮
নবী (সা) কর্তৃক অপছন্দনীয় জিনিস পরিহার ও এড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ	১১৪
উম্মতের প্রতি নবী (সা)-এর সহানুভূতি সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ	১২৩
নবী (সা)-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং ক্রোধ সংবরণ বিষয়ক রিওয়ায়াতসমূহ	১৩৭
নবী (সা)-এর ক্রন্দন করা ও দুঃখিত হওয়ার বর্ণনা	১৫৬
নবী (সা)-এর কথাবার্তা বলার নীতি	১৫৮
নবী (সা)-এর পথচলা এবং চলার পথে এদিক-সেদিক দৃষ্টিপাত করার নীতি	১৬১
কোন মজলিস ত্যাগ করার সময় নবী (সা)-এর পঠিত দু'আ	১৬৭
নবী (সা)-এর সুগন্ধি পছন্দ করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করার বর্ণনা	১৬৯
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা	১৭৩
নবী (সা)-এর জামা এবং জামা পরিধানের সময় মহান আল্লাহ্র প্রতি হাম্‌দ ও প্রশংসা	১৭৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নতুন পোশাক পরিধান করার বর্ণনা	১৮২
নবী (সা)-এর জুব্বা মুবারক-এর বর্ণনা	১৮৩
নবী (সা)-এর লুঙ্গি ও চাদরের বর্ণনা	১৮৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পবিত্র চাদরের বর্ণনা	১৯১
নবী (সা)-এর পোশাকের বর্ণনা	১৯৪
নবী (সা)-এর চাদরের বর্ণনা	১৯৬
নবী (সা)-এর পাগড়ির বর্ণনা	২০০

নবী (সা)-এর টুপির বর্ণনা	২০৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পায়জামার বর্ণনা	২০৫
নবী (সা)-এর পশমী পোশাকের বর্ণনা	২০৬
নবী (সা)-এর কাতান, তুলা ও ইয়ামানী পোশাক ব্যবহার করার বর্ণনা	২০৯
নবী (সা)-এর আংটির বর্ণনা	২১০
নবী (সা)-এর মোজার বর্ণনা	২২০
নবী (সা)-এর চপ্পলের বর্ণনা	২২১
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ধনুকের বর্ণনা	২২৬
নবী (সা)-এর বর্শার বর্ণনা	২২৭
নবী (সা)-এর তরবারির বর্ণনা	২২৭
নবী (সা)-এর লৌহ বর্মের বর্ণনা	২৩০
নবী (সা)-এর শিরস্ত্রাণের বর্ণনা	২৩১
নবী (সা)-এর পতাকার বর্ণনা	২৩২
নবী (সা)-এর বড় পতাকার বর্ণনা	২৩৩
নবী (সা)-এর বল্লমের বর্ণনা	২৩৪
নবী (সা)-এর ছড়ির বর্ণনা	২৩৫
নবী (সা)-এর কুরসীর বর্ণনা	২৩৬
নবী (সা)-এর তাঁবুর বর্ণনা	২৩৭
নবী (সা)-এর ঘোড়ার বর্ণনা	২৩৮
নবী (সা)-এর ঘোড়ার জিনের বর্ণনা	২৪১
নবী (সা)-এর খচ্চরের বর্ণনা	২৪১
নবী (সা)-এর গাধার বর্ণনা	২৪৩
নবী (সা)-এর উট্নীর বর্ণনা	২৪৩
যুদ্ধে নবী (সা)-এর ব্যবহৃত সাংকেতিক চিহ্নের বর্ণনা	২৪৫
নবী (সা)-এর বিছানার বর্ণনা	২৪৭
নবী (সা)-এর লেপের বর্ণনা	২৫১
নবী (সা)-এর মখমলের চাদরের বর্ণনা	২৫৫
নবী (সা)-এর বালিশের বর্ণনা	২৫৫
নবী (সা)-এর খাটের বর্ণনা	২৫৬
নবী (সা)-এর মাদুরের বর্ণনা	২৫৯
নবী (সা)-এর ঘুমের সময়কার আমল	২৬১

ঘুমানোর পূর্বে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চোখে সুরমা লাগানোর বর্ণনা ২৬৬
রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আয়না দেখা, চুলে চিরুনি করা এবং মাথায় তৈল মাখার বর্ণনা ২৬৭
রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাতে, ঘুমের সময়, ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে এবং বিছানা ত্যাগের সময় যে আমল করতেন ২৭১
নবী (সা)-এর কিরাআতের বর্ণনা ২৮২
নবী (সা)-এর মুজাহাদা (সাধনা), ইবাদত, বিনয় ও দীর্ঘ কিয়াম করার বর্ণনা ২৮৫
নবী (সা)-এর পানাহার, বিবাহ ও দাম্পত্য জীবনের শিষ্টাচার ২৯১
নবী (সা)-এর পানাহারে বিনয়ীভাব প্রকাশ করার বর্ণনা ২৯৮
নবী (সা)-এর দস্তরখানের বর্ণনা ৩০১
নবী (সা)-এর পানপাত্রের বর্ণনা ৩০১
নবী (সা)-এর গোশত খাওয়ার বর্ণনা ৩০২
নবী (সা) মিষ্টি দ্রব্য পছন্দ করতেন ৩০৪
নবী (সা) শুকনা ও গাছপাকা খেজুর পছন্দ করতেন ৩০৫
নবী (সা)-এর খেজুর ভক্ষণ এবং তার আঁটি নিক্ষেপণ ৩০৬
নবী (সা) ঘি খেয়েছেন ৩০৭
নবী (সা)-এর দুধপান এবং এ সম্পর্কে তাঁর বর্ণনা ৩০৯
নবীয (শরবত) পান করা এবং তার পন্থা ৩১০
নবী (সা)-এর পানকৃত নবীযের বিবরণ ৩১১
নবী (সা)-এর ছাতু আহার করা সম্পর্কে ৩১৩
নবী (সা)-এর হায়স (সুস্বাদু খাদ্য) আহার করা সম্পর্কে ৩১৩
নবী (সা) সিরকা এবং যায়তুনের তেল আহার করেছেন ৩১৪
নবী (সা) কদু খেয়েছেন এবং তা খুবই পছন্দ করতেন ৩১৪
রাসূলুল্লাহ্ (সা) শসা খেয়েছেন ৩১৭
নবী (সা)-এর আহার শেষে হাত ধোয়ার বিবরণ ৩২০
আহার শেষে নবী (সা)-এর যে সব দু'আ করতেন এবং যা বলে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতেন তার বর্ণনা ৩২১
নবী (সা) যে সব পাত্রে পানি পান করতেন তার বর্ণনা ৩২৪
পানি পানের সময় নবী (সা)-এর শ্বাস গ্রহণের বর্ণনা ৩২৬
অন্যদের পানি পান করানোর সময় নবী (সা) নিজে সবার শেষে পান করতেন ৩২৯
নবী (সা)-এর দাঁড়িয়ে ও বসে পানি পান করার বর্ণনা ৩৩১

নবী (সা)-এর জন্য মিঠা পানি সরবরাহ করার বর্ণনা ৩৩৩

নবী (সা)-এর বাণী ঃ নারী ও সুগন্ধিকে আমার প্রিয় বানিয়ে দেয়া হয়েছে ৩৩৫

নবী (সা)-এর বাণী ঃ আমাকে বিশেষ যৌনক্ষমতা দান করা হয়েছে ৩৪০

একদিন বা একরাতে সকল স্ত্রীর সাথে নবী (সা)-এর সাক্ষাতের বর্ণনা ৩৪১

স্ত্রীদের সাথে সহবাসের সময় নবী (সা)-এর পর্দা করা ও চোখ বন্ধ রাখার বর্ণনা ৩৪২

নবী (সা) বাসর রাতে তাঁর স্ত্রীদের সালাম দিয়েছেন ৩৪৩

নবী (সা)-এর উপহার গ্রহণ করা এবং তার প্রতিদান দেওয়ার বর্ণনা ৩৪৩

নবী (সা)-এর রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করার বর্ণনা ৩৪৮

হাঁচি দেয়ার মুহূর্তে মহানবী (সা)-এর কর্মনীতি ৩৫০

নবী (সা)-এর ডান হাত ও বাম হাত ব্যবহার করার বর্ণনা ৩৫২

নবী (সা)-এর তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে বহুল পরিমাণে পরামর্শ করা ৩৫৩

নবী (সা) এবং লাঠির উপর ভর দিয়ে চলার বর্ণনা ৩৫৩

নবী (সা)-এর তাঁর সাহাবীদের সালামের জওয়াব দেওয়া ৩৫৪

নবী (সা)-এর কোন পছন্দনীয় জিনিস দেখে দু'আর বর্ণনা ৩৫৫

সাহাবায়ে কিরামের কোন সফরে যাত্রাকালে নবী (সা)-এর তাঁদেরকে কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার বর্ণনা ৩৫৫

নবী (সা) সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় সাহাবীগণের তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর বর্ণনা ৩৫৭

নবী (সা) যে সব দিনে সফরে যাত্রা করতে ভালবাসতেন এবং সফর চলাকালীন সময়ে তাঁর আমলের বর্ণনা ৩৫৭

নবী (সা)-এর উপবেশন, হেলান দেয়া ও চাদর মুড়ি দেওয়া ও পথ চলার বর্ণনা ৩৬১

নবী (সা)-এর মিষ্টি ভাষণ ও শুভ লক্ষণ গ্রহণের প্রতি অনুরাগের বর্ণনা ৩৬৭

নবী (সা)-এর কথা বলার মধ্যে ফারসী শব্দ ব্যবহার করার বর্ণনা ৩৭৪

নবী (সা) জুমু'আর ফযীলত ও বরকত অর্জনার্থে জুমু'আর দিবস ও রজনীতে যে সব বিশেষ আমল করতেন সে সবের বর্ণনা ৩৭৬

নবী (সা)-এর নাভীর নিচের পশম পরিষ্কারের বর্ণনা ৩৭৮

নবী (সা)-এর সিঙ্গা লাগানো এবং নির্গত রক্ত দাফন করার বর্ণনা ৩৭৯

নবী (সা)-এর গোঁফ কাটার বর্ণনা ৩৮০

নবী (সা)-এর ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা এবং আল্লাহ্র যিকরের মধ্যে ব্যাপৃত থাকার বর্ণনা ৩৮১

নবী (সা)-এর পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং তা খত্‌ম করার সময়সীমা সম্পর্কে বর্ণনা ৩৮১
মৌসুমের প্রথম বৃষ্টির সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) যা করতেন ৩৮৩
রাসূলুল্লাহ্ (সা) সমস্ত কাজ ডান দিক থেকে শুরু করতে পছন্দ করতেন ৩৮৪
নবী (সা) পার্থিব বস্তুর প্রতি অনাসক্ত, ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে নিজের তুলনায় অপরকে প্রাধান্য দিতেন, দুর্বলদের মাঝে সম্পদ বন্টন করে দিতেন। দানশীলতা আর অল্পে তুষ্ট থাকা ছিলো তাঁর স্বভাবজাত গুণ। তিনি পার্থিব বস্তুর চাইতে পরকালীন বিষয়কে অধিক ভালোবাসতেন। এ ছাড়া তিনি কোনো যাঞ্চাকারীকে কখনোই খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না, কোনো আবেদনকারীকেই নিষেধ করতেন না ৩৮৫

حُسْنُ خُلُقِهٖ ﷺ

নবী ﷺ -এর চারিত্রিক সৌন্দর্য

١. عَنِ الصَّادِقِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ خُلُقًا–

১. হযরত (জা'ফর) সাদিক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاكَانَ اَحَدٌ اَحْسَنَ خُلُقًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَا دَعَاهُ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ وَلاَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهٖ اِلاَّ قَالَ لَبَّيْكَ، فَلِذٰلِكَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ–

২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী (দুনিয়ায়) আর কোন লোক ছিল না। তাঁর সাহাবা ও পরিবারবর্গের কেউ যখন তাঁকে ডাকতেন, তখন তিনি তার জবাবে বলতেন ঃ 'লাব্বায়িক' 'আমি হাযির আমি হাযির'। এ কারণেই মহান আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে নাযিল করেছেন ঃ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ নিঃসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।

٣. عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ، يَالَبَّيْكَ –

৩. হযরত আবূ জা'ফর [মুহাম্মদ বাকের (র)] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জবাবে তিনি বললেন ঃ 'ইয়া লাব্বায়ক'।

٤. عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كُنَّا اِذَا جَلَسْنَا اِلَيْهِ اِنْ اَخَذْنَا بِحَدِيْثٍ فِىْ ذِكْرِ الْاٰخِرَةِ اَخَذَ مَعَنَا– وَ اِنْ اَخَذْنَا فِىْ ذِكْرِ الدُّنْيَا اَخَذَ مَعَنَا ، وَاِنْ اَخَذْنَا فِىْ ذِكْرِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اَخَذَ مَعَنَا فَكُلُّ هٰذَا اُحَدِّثُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ –

৪. হযরত যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ -এর কাছে বসতাম, তখন যদি আমরা আখিরাতের কথা আলোচনা শুরু করতাম, তিনিও আমাদের সাথে তাতে মশগুল হতেন। আমরা যদি দুনিয়ার আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতেন। আর আমরা যদি পানাহারের আলোচনা করতাম তিনিও তাতে অংশ নিতেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে এ সমুদয় কথা তোমাদেরকে বলছি।

٥. قَالَ (خَارِجَةُ) قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَخْبِرْنَا عَنْ اَخْلَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَنْ اَيِّ اَخْلَاقِهِ اَخْبِرُكُمْ كُنْتُ جَارَهُ فَاِذَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْىُ بَعَثَ اِلَىَّ فَاكْتُبُهُ وَكُنَّا اِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا (فَذَكَرَ مِثْلَهُ)

৫. খারিজা (র) বলেন, আমরা যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চরিত্র সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমি তাঁর কোন্ কোন্ চরিত্র সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো। আমি তো তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম। তাঁর উপর যখনই ওহী নাযিল হতো, আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি তা লিখে ফেলতাম। আর আমরা যখন দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতাম; তিনিও আমাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিতেন। এরপর পূর্বানুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন।

٦. سِمَاكٌ عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ وَكَانَ طَوِيْلَ الصَّمْتِ وَكَانَ اَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ عِنْدَهُ وَيَذْكُرُوْنَ اَشْيَاءَ مِنْ اَمْرِالْجَاهِلِيَّةِ وَ يَضْحَكُوْنَ فَيَتَبَسَّمُ مَعَهُمْ اِذَا ضَحِكُوْا -

৬. সিমাক (র) বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্যে বসতেন ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। (আমি তাঁর সাহচর্যে বসে দেখলাম) তিনি অধিকতর নীরব থাকতেন। সাহাবা (রা) তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করতেন; জাহিলী যুগের প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন এবং পরিহাস করতেন। তাঁরা যখন হাসতেন, তখন তিনিও মুচকি হাসতেন।

٧. عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ اَكَلْتُ ثُوْمًا فَانْتَهَيْتُ اِلَى الْمُصَلّٰى وَقَدْ سُبِقْتُ بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِيْحَ الثُّوْمِ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ قَالَ مَنْ اَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّا حَتّٰى يَذْهَبَ رِيْحُهَا (اَوْرِيْحُهُ) فَلَمَّا قَضَيْتُ صَلَاتِىْ جِئْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لَتُعْطِيَنِّىْ يَدَكَ فَاَعْطَاهُ يَدَهُ (قَالَ حُمَيْدُ اِذَنْ لَيَجِدَنَّهُ سَهْلاً قَرِيْبًا)

فَاَدْخَلْتُ يَدَهُ فِى كُمِّىْ فَوَضَعْتُهَا عَلَى صَدْرِى، فَاِذَا اَنَا مَعْصُوْبَ الصَّدْرِ،
فَقَالَ اَمَا اِنَّ لَكَ عُذْرًا –

৭. **হযরত** মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রসুন **খেয়েই মসজিদে** গেলাম। (সালাত) এক রাকআত আমার ছুটে ছিল। আমি মসজিদে প্রবেশ **করতেই** রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রসুনের গন্ধ অনুভব করলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, **এই বৃক্ষ** (রসুন) কেউ ভক্ষণ করলে তার গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন আমাদের কাছে না আসে। (রাবী বলেন) আমি সালাত শেষ করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্‌র কসম! আপনি আপনার হাত মুবারক একটু আমাকে দিন। তিনি তাঁর হাতখানা আমাকে দিলেন। [হুমাইদ (র) বলেন, এ সময় তো মুগীরা নবী ﷺ -কে অবশ্যই কোমল ও নিকটবর্তী পেয়ে থাকবেন]।[১] তখন আমি তাঁর হাতখানা আমার জামার হাতার মধ্য দিয়ে আমার বক্ষের উপর রাখলাম। তখন নবী ﷺ লক্ষ করলেন যে, আমার বুকের উপর একটি পট্টি বাঁধা রয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ আরে তোমার তো ওযর রয়েছে।

٨. عَنْ جَرِيْرٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِهِ فَامْتَلاَ الْبَيْتُ وَدَخَلَ جَرِيْرٌ فَقَعَدَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَابَصَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَاَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَفَّهُ وَرَمَى بِهِ اِلَيْهِ وَقَالَ اِجْلِسْ عَلَى هٰذَا فَاَخَذَهُ جَرِيْرٌ وَوَضَعَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَقَبَّلَهُ –

৮. হযরত জারীর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর একটি গৃহে প্রবেশ করলেন। গৃহটি লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। [তাই জারীর (রা) বসার স্থান না পেয়ে] গৃহের বাইরে বসে পড়লেন। নবী ﷺ যখন তাঁকে (বাইরে বসতে) দেখলেন, তখন তিনি তাঁর কাপড় ভাঁজ করে জারীর (রা)-এর দিকে ছুঁড়ে দিলেন এবং বললেন, এই কাপড়টির উপর বসো। জারীর (রা) ঐ কাপড়টি তুলে তাঁর চেহারায় লাগালেন এবং চুমু দিলেন।

ফায়দা ঃ নবী ﷺ -এর ন্যায় উন্নত চরিত্রের অধিকারীর পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না যে, তিনি তাঁর গৃহের মধ্যে ফরাশে উপবিষ্ট থাকতেন এবং জারীর (রা) বাইরে মাটিতে বসবেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে নিজের কাপড় ছুঁড়ে দিলেন যাতে সেটি বিছিয়ে তিনি তার উপরে বসতে পারেন। কিন্তু জারীর (রা) এটা কিভাবে পছন্দ করতে পারেন যে, নবী ﷺ -এর পবিত্র কাপড় মাটিতে বিছিয়ে তার উপর তিনি বসবেন। তাই তিনি ঐ পবিত্র কাপড়টি তুলে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে নিজের চোখে লাগালেন এবং তার উপর চুমু খেলেন।

---

১. হুমাইদ (র) নীচুস্তরে এ হাদীসের একজন রাবী ছিলেন। তিনি যখন এই হাদীস বর্ণনা করতে করতে এই পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন স্থানের উপযুক্ততা হেতু সহসা এই বাক্যটি তাঁর মুখ থেকে বের হয়ে গেলো। অর্থাৎ স্বীয় এই কর্মপদ্ধতি দ্বারা হযরত মুগীরা (রা) নবী ﷺ-কে নিজের জন্য কোমল ও নিকটবর্তী করে নেন।

٩. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا فَسَأَلْتُهَا عَنْ خُلُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتِ الْقُرْآنُ -

৯. জুবায়র ইব্‌ন নুফায়র (র) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র ছিল 'আল-কুরআন'। অর্থাৎ নবী ﷺ-এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআনে যতগুলো চারিত্রিক দিক-নিদের্শনা দেয়া হয়েছে নবী ﷺ-এর জীবন ছিল তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব নমুনা।

١٠. عَنِ الْحَسَنْ فِيْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ قَالَ هٰذَا خُلُقُ مُحَمَّدٍ ﷺ نَعَتَهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ -

১০. ইমাম হাসান বসরী (র) কুরআন কারীমের আয়াত فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ (হে মুহাম্মদ) ﷺ আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, এই ছিল মুহাম্মদ ﷺ-এর চরিত্র, যা আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করেছেন।

١١. عَنِ الاَسْوَدِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ اَهْلِهِ؟ قَالَتْ كَانَ فِيْ مَهْنَةِ اَهْلِهِ فَاِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ قَامَ فَصَلَّى

১১. আসওয়াদ (র) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর পরিজনের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন ? তিনি বললেন, তিনি তাঁর পরিজনের সাথে কাজে লেগে থাকতেন। যখন সালাতের সময় হতো, তখন উঠে দাঁড়াতেন এবং সালাত আদায় করতেন।

ফায়দা ঃ এটাই ছিল আকায়ে নামদার সরদারে দু'জাহান ﷺ-এর পবিত্রতম জীবনের দৃষ্টান্ত। একদিকে তিনি ছিলেন স্বীয় উম্মতের ভাবনায় সর্বদা নিমগ্ন এবং অন্যদিকে তিনি গার্হস্থ্য কাজেও তাঁর পরিজনকে সহযোগিতা করতেন।

١٢. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا سُئِلَتْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَعْمَلُ كَعَمَلِ اَحَدِكُمْ فِيْ بَيْتِهِ، يَخِيْطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ -

১২. হযরত হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে তাঁর গৃহে সময় কাটাতেন ?

তিনি বললেন, তিনিও তোমাদের মতো গৃহস্থালীর কাজকর্মে মশগুল থাকতেন। নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন এবং নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেলো যে, নবী ﷺ-এর গৃহ-জীবন ছিল সাধারণ মানুষের মতো। কোন সাধারণ কাজ করতেও তিনি সংকোচ বোধ করতেন না।

١٣. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَاكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ اِذَا خَلاَ؟ قَالَتْ يَخِيطُ ثَوْبَهُ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ فِىْ اَهْلِهِ -

১৩. উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ একান্তে কি কি কাজ করতেন ? তিনি বললেন, তিনি তাঁর কাপড় সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং একজন মানুষ তার ঘরে বসে যে সব কাজ করে থাকে, তিনি তা সবই করতেন।

١٤. عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِثْلَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِهِ ؟ فَقَالَتْ كَاَحَدِكُمْ يَرْفَعُ شَيْئًا وَيَضَعُهُ وَكَانَ اَحَبُّ الْعَمَلِ اِلَيْهِ الْخِيَاطَةُ -

১৪. হযরত উরওয়া (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে অনুরূপ প্রশ্ন করা হলো। যুহরী (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গৃহের মধ্যে কি ধরনের আচরণ করতেন ? তিনি বললেন, তোমরা যেরূপ কোন একটি বস্তু উপরে তুলে রাখো এবং নিচে নামিয়ে রাখো তিনিও সেরূপ করতেন। তবে সেলাই কাজই ছিল তার সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ।

ফায়দা ঃ একজন সাধারণ মানুষ তার ঘরে বসে যেসব কাজ করে থাকে, নবী ﷺও সে সব কাজই করতেন। "এবং সেলাই করার কাজই তাঁর সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ ছিল" এ বাক্যটি বর্ণনাকারীর নিজস্ব মন্তব্য। এতে পূর্ববর্তী রিওয়ায়াতের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। অর্থাৎ নবী ﷺ তাঁর নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন এবং নিজের জুতা নিজে মেরামত করতেন।

١٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ اَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ فِىْ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَكُنَّ لِىْ صَوَاحِبُ يَاْتِيْنِى فَيَلْعَبْنَ مَعِىْ، فَيَنْقَمِعْنَ اِذَا رَاَيْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَرِّبُهُنَّ اِلَىَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِىْ -

১৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর গৃহে কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার কিছু সখীও ছিল। তারা আমার কাছে এসে

আমার সাথে খেলা করতো। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আসতে দেখলে গৃহের এদিক সেদিক লুকিয়ে থাকতো। রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাদেরকে এদিক সেদিক থেকে একত্র করে পুনরায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তারা পুনরায় আমার সাথে খেলা শুরু করতো।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ -এর সুসামাজিকতার দর্পণ স্বরূপ। স্বীয় পরিবার পরিজনের মনরক্ষা ও সন্তোষ বিধান পদ্ধতিও এ হাদীস থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়।

١٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَدمْتُ النَّبِىَّ ﷺ تِسْعَ سِنِيْنَ فَمَا اَعْلَمُهُ قَالَ قَطُّ هَلاَّ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلاَ عَابَ عَلَى شَيْئًا قَطُّ -

১৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নয় বছর পর্যন্ত নবী ﷺ -এর খিদমত করেছি। কিন্তু আমার জানা নেই, তিনি কখনো আমাকে বলেছেন, তুমি এরূপ কেন করেছো ? এবং তিনি কখনো আমার কোনো কাজে সামান্যতম দোষও ধরেননি।

ফায়দা ঃ এই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর অনুপম চরিত্রের নমুনা। এ যুগে কাজের লোকদের সাথে দুর্ব্যবহারকারীরা এই হাদীসটির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবেন এবং নবী ﷺ -এর এই মহান কর্মপদ্ধতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন।

١٧. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ اَبِىْ عَنْ دُخُوْلِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ دُخُوْلُهُ لِنَفْسِهِ مَاذُوْنًا لَهُ فِىْ ذٰلِكَ، وَكَانَ اِذَا اَتَى اِلَى مَنْزِلِهِ جَزَّءَ دُخُوْلَهُ ثَلاَثَةَ اَجْزَاءٍ جُزْءٌ لِلّٰهِ وَجُزْءٌ لِاَهْلِهِ وَجُزْءٌ لِنَفْسِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ جُزْأَهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَرُدُّ ذٰلِكَ عَلَى الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ وَلاَ يَدَّخِرُ عَنْهُمْ شَيْئًا فَكَانَ مِنْ سِيْرَتِهِ فِىْ جُزْءِ الاَمَّةِ اِيْثَارُ اَهْلِ الْفَضْلِ بِاِذْنِهِ وَقِسْمَتِهِ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِمْ فِى الدِّيْنِ مِنْهُمْ ذُو الْحَاجَةِ وَمِنْهُمْ ذُو الْحَاجَتَيْنِ وَمِنْهُمْ ذُوْ الْحَوَائِجِ فَيَشْتَغِلُ بِهِمْ وَيَشْغَلُهُمْ فِيْمَا يُصْلِحُهِمَ وَالاُمَّةَ مِنْ مَسْاَلَتِهِ عَنْهُمْ وَاَخْبَارِهِمْ بِالَّذِىْ يَنْبَغِىْ لَهُمْ يَقُوْلُ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ وَاَبْلِغُوْنِىْ حَاجَةَ مَنْ لاَيَسْتَطِيْعُ اِبْلاَغِىْ حَاجَتَهُ فَاِنَّهُ مَنْ اَبْلَغَ سُلْطَانًا حَاجَةَ مَنْ لاَيَسْتَطِيْعُ اِبْلاَغَهَا ثَبَّتَ اللّٰهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَيَذْكُرُ عِنْدَهُ اِلاَّ ذٰلِكَ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْ اَحَدٍ غَيْرَهُ قَالَ فِىْ حَدِيْثِ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيْعٍ يَدْخُلُوْنَ رُوَّادًا وَلاَ يَتَفَرَّقُوْنَ اِلاَّ عَنْ ذَوَاقٍ وَيَخْرُجُوْنَ اَدِلَّةً يَعْنِىْ فُقَهَاءَ - قُلْتُ فَاَخْبِرْنِىْ عَنْ مَخْرَجِهِ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِيْهِ ؟

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْزَنُ لِسَانَهُ إِلاَّمِمَّا يَعْنِيْهِمْ وَيُؤَلِّفُهُمْ وَلاَيُفَرِّقُهُمْ،
يُكْرِمُ كَرِيْمَ كُلِّ قَوْمٍ وَيُوَلِّيْهِ عَلَيْهِمْ وَيَحْذَرُ النَّاسَ وَيَحْتَرِسُ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَطْوِيَ عَنْ أَحَدٍ بِشْرَهُ وَخُلُقَهُ، وَيَتَفَقَّدُ أَصْحَابَهُ وَيَسْئَالُ النَّاسَ عَمَّا فِيْ النَّاسِ
وَيُحَسِّنُ الْحُسْنَ وَيُصَوِّبُهُ، وَيُقَبِّحُ الْقَبِيْحَ وَيُوْهِنُهُ، مُعْتَدِلُ الاَمْرِ غَيْرُ مُخْتَلِفٍ،
لاَيَغْفُلُ مَخَافَةَ اَنْ يَغْفُلُوْا أَوْيَمِلُّوْا، لِكُلِّ حَالٍ عِنْدَهُ عِتَادٌ، لاَيَقْصُرُ عَنِ الْحَقِّ
وَلاَيُجَاوِزُهُ إِلَى غَيْرِهِ، الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُ مِنَ النَّاسِ خِيَارُهُمْ وَأَفْضَلُهُمْ عِنْدَهُ أَعَمُّهُمْ
نَصِيْحَةً وَأَعْظَمُهُمْ عِنْدَهُ مَنْزِلَةً أَحْسَنُهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَازَرَةً، وَسَأَلْتُهُ عَنْ
مَجْلِسِهِ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَيَجْلِسُ وَلاَ يَقُوْمُ إِلاَّ ذَكَرَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ
وَلاَيُوْطِنُ الاَمَاكِنَ وَيَنْهَى عَنْ إِيْطَانِهَا وَاِذَا جَلَسَ إِلَى قَوْمٍ جَلَسَ حَيْثُ يَنْتَهِيْ
بِهِ الْمَجْلِسُ وَيَامُرُ بِذَلِكَ وَيُعْطِيْ كُلَّ جُلَسَائِهِ بِنَصِيْبِهٖ لاَيَحْسِبُ أَحَدٌ مِنْ
جُلَسَائِهِ أَن أَحَدًا أَكْرَمُ عَلَيْهِ مِنْهُ مَنْ جَالَسَهُ أَوْقَاوَمَهُ لِحَاجَةٍ صَابَرَهُ حَتَّى
يَكُوْنَ هُوَ الْمُنْصَرِفُ وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَنْصَرِفْ اِلاَّ بِهَاأَوْبِمَيْسُوْرٍ مِنَ الْقَوْلِ-
قَدْوَسَّعَ النَّاسُ مِنْهُ خُلُقَهُ فَصَارَلَهُمْ اَبًا وَصَارُوْا عِنْدَهُ فِيْ الْحَقِّ سِوَاءً مَجْلِسُهُ
مَجْلِسُ حِلْمٍ وَحَيَاءٍ وَصِدْقٍ وَأَمَانَةٍ لاَتُرْفَعُ فِيْهِ الأَصْوَاتُ وَلاَ تُؤْبَنُ فِيْهِ الْحُرَمُ
وَلاَتُنْثَنِيْ فَلَتَاتُهُ مُعْتَدِلِيْنَ يَتَوَا صَلُوْنَ بِالتَّقْوٰى مُتَوَاضِعِيْنَ يُوَقِّرُوْنَ فِيْهِ
الْكَبِيْرَ وَيَرْحَمُوْنَ فِيْهِ الصَّغِيْرَ وَيُؤْثِرُوْنَ ذَالْحَاجَةِ وَيَحْفَظُوْنَ الْغَرِيْبَ-

قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ سِيْرَتُهُ فِيْ جُلَسَائِهِ؟ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَائِمَ الْبِشْرِ
سَهْلَ الْخُلُقِ لَيِّنَ الْجَانِبِ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَغَلِيْظٍ وَلاَصَخَّابٍ فِيْ الاَسْوَاقِ وَلاَفَاحِشًا
وَلاَعَيَّابًا وَلاَمَدَّاحًا يَتَغَافَلُ عَمَّا لاَيَشْتَهِيْ وَيُؤْيِسُ مِنْهُ وَلاَيُجِيْبُ فِيْهِ قَدْتَرَكَ
نَفْسَهُ مِنَ ثَلاَثٍ الْمِرَاءِ وَالإِكْثَارِ وَمَالاَيَعْنِيْهِ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنَ ثَلاَثٍ، كَانَ لاَيَذُمُّ
أَحَدًا وَلاَيُعَيِّرُهُ وَلاَيَطْلُبُ عَوْرَاتِهِ وَلاَيَتَكَلَّمُ إِلاَّ فِيْمَا رَجَا ثَوَابَهُ إِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ
جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُسِهِمُ الطَّيْرُ، وَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوْا وَلاَ يَتَنَازَعُوْنَ عِنْدَهُ

الْحَدِيْثَ مَنْ تَكَلَّمَ أَنْصَتُوْالَهُ حَتَّى يَفْرُغَ حَدِيْثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيْثُ أَوَّلِهِمْ يَضْحَكُ
مِمَّا يَضْحَكُوْنَ وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُوْنَ، وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيْبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِيْ
مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ لَيَسْتَجْلِبُوْنَهُمْ فَيَقُوْلُ إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ
الْحَاجَةِ يَطْلُبُهَا فَارْفِدُوْهُ وَلَايَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلاَّ مِنْ مُكَافٍ، وَلَايَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ
حَدِيْثَهُ حَتَّى يَجُوْزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ، فَسَأَلْتُ كَيْفَ كَانَ سُكُوْتُ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ سُكُوْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَرْبَعٍ عَلَى الْحِلْمِ وَالْحَذْرِ
التَّقْدِيْرِوالتَّفْكِيْرِ، فَأَمَّا تَقْدِيْرُهُ فَفِيْ تَسْوِيَةُ النَّظْرِ وَالاسْتِمَاعِ مِنَ النَّاسِ وَأَمَّا
تَفْكِيْرُهُ فَفِيْمَا يَبْقٰى وَلَايَفْنِى وَجُمِعَ لَهُ الْحِلْمُ فِىْ الصَّبْرِ فَكَانَ لَايَغْضَبُهُ
شَئٌى وَلَايَسْتَفِزُّهُ، وَجُمِعَ لَهُ الْحَذَرُ فِىْ أَرْبَعٍ أَخْذُهُ بِالْحُسْنِ لِيُقْتَدَى بِهِ، وَتَرْكُهُ
الْقَبِيْحَ لِيُنْتَهَى عَنْهُ وَاجْتِهَادُهُ الرَّأىَ فِيْمَا أَصْلَحَ أُمَّتَهُ، وَالقِيَامُ فِيْمَا هُوَ خَيْرُ
لَهُمْ جَمَعَ لَهُمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالاٰخِرَةِ۔

১৭. হযরত হাসান ইব্‌ন আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে [হযরত আলী (রা)-কে] নবী ﷺ-এর গৃহ-মধ্যকার কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এ অনুমতি ছিল যে, যখনই ইচ্ছা করতেন, তখনই তিনি গৃহে প্রবেশ করতে পারতেন।[১] (তবুও) তাঁর অভ্যাস ছিল, যখনই গৃহে গমন করতেন, তাঁর সময়কে তিন ভাগ করতেন। এক ভাগ আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য, দ্বিতীয় ভাগ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ নিজের আরামের জন্য। আবার নিজ আরামের সময়টুকুও লোকজনকে দিয়ে দিতেন। আর তা এইভাবে যে, বিশেষদের মাধ্যমে তার উপকারিতাও সাধারণদের মধ্যে ফিরিয়ে দিতেন। অর্থাৎ ঐ সময় বিশেষ বিশেষ সাহাবা কিরাম প্রবেশ করতেন এবং তাঁর কাছে দীনী মাসায়েল ও মর্মকথা শ্রবণ করে সাধারণ লোকদের মধ্যে পৌঁছে দিতেন। তাঁদের কাছে কোনো কথা গোপন রাখতেন না অর্থাৎ দীন ও দুনিয়ার লাভজনক সব কথাই বলতেন। তাঁর অভ্যাস ছিল, উম্মতের জন্য নির্ধারিত সময়ে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী জ্ঞানীদেরকে প্রাধান্য দিতেন এবং ঐ সময়ের বণ্টনে দীনী মর্যাদা হিসাবে তারতম্য ঘটতো।[২] তাদের মধ্যে কারো থাকতো একটি কাজ, কারো দু'টি কাজ এবং কারো কয়েকটি কাজ। তিনি তাদের কাজে লেগে যেতেন এবং তাদেরকেও ঐসব কাজে মশগুল রাখতেন। তাতে তাদের এবং উম্মতের সংশোধন হতো। তিনি তাদের সমস্যাবলি জানতে

১. অর্থাৎ নবী ﷺ-এর বাইরে থাকার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না বরং আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এ অনুমতি ছিল যে, তিনি যখন ইচ্ছা করতেন, গৃহে গমন করতে পারতেন।

২. নবী ﷺ-এর কাছে প্রত্যেক ব্যক্তির মর্যাদা মূল্যায়িত হতো। প্রত্যেক ব্যক্তি তার দীনী মর্যাদা হিসেবে তাঁর দরবারে স্থান লাভ করতো।

চাইতেন এবং তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদেরকে পরামর্শ দিতেন। বলতেন, যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা যেন তা অনুপস্থিতদেরকে পৌছে দেয়। (তিনি বলতেন) আমাকে সেই ব্যক্তির প্রয়োজন অবগত করো, যে তার প্রয়োজন আমার কাছে পৌছাতে পারে না। কেননা যে ব্যক্তি আমীর (প্রশাসক) পর্যন্ত এমন কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনকে পৌছে দিয়েছে, যে তার নিজের প্রয়োজন ঐ পর্যন্ত পৌছাতে পারে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে দৃঢ়পদ রাখবেন। এ কথাই তাঁর কাছে আলোচিত হতো এবং এ ছাড়া তিনি কারো কোনো কথা পছন্দ করতেন না।

সুফিয়ান ইব্‌ন ওয়াকী'র রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবা তাঁর (নবী ﷺ) কাছে ইল্‌ম ও দীন অন্বেষী হয়ে যেতেন এবং স্বাদ না নিয়ে সেখান থেকে ফিরতেন না। আর যখন বের হতেন, তখন পথ-প্রদর্শক হয়ে বের হতেন। বর্ণনাকারী পথ-প্রদর্শকের ব্যাখ্যা করেছেন 'ফুকাহা' শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ দীনের অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে উঠে আসতেন)।

হযরত হুসাইন (রা)[১] বলেন, তারপর আমি (আমার পিতাকে) জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর (নবী ﷺ) গৃহের বাইরের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুটা বলুন। অর্থাৎ গৃহের বাইরে তিনি কি কাজকর্ম করতেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অনর্থক কথাবার্তা থেকে স্বীয় রসনা মুবারককে রক্ষা করতেন। মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতেন। বিচ্ছিন্ন হতে দিতেন না। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন এবং তাকেই তাদের নেতা ও অভিভাবক বানাতেন। তিনি মানুষের সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সব সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু কারো সাথে স্বীয় আন্তরিকতা ও প্রফুল্লচিত্ততার ক্ষেত্রে তারতম্য করতেন না। স্বীয় সঙ্গীদের খোঁজ-খবর নিতেন। মানুষকে তাদের হাল অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। ভাল কথাকে ভাল বলতেন এবং তার প্রশংসা করতেন। আর মন্দ কথাকে মন্দ বলতেন এবং তার নিন্দা করতেন। প্রত্যেক কাজে তাঁর ভারসাম্য বজায় থাকতো, এদিকে-ওদিকে ঝুঁকে পড়তেন না। তিনি মানুষের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতেন যাতে তারা অমনোযোগী না হয়ে পড়ে কিংবা অতিষ্ঠ হয়ে না ওঠে। প্রত্যেক অবস্থার জন্যই তাঁর নিকট তার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতো। সত্য গ্রহণেও ত্রুটি করতেন না এবং সত্য ত্যাগ করেও অন্য দিকে চলে যেতেন না। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ছিলেন উত্তম লোক। তাঁর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সবার মঙ্গল কামনা করতেন। এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাশীল ছিলেন সেই ব্যক্তি, যেনি তাদের সমব্যথী ও সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম।

[হযরত হুসাইন (রা) বলেন,] এরপর আমি (আমার পিতাকে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মজলিস ও উঠাবসার অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠতে বসতে আল্লাহ্‌র যিকর করতেন। তিনি কোনো স্থানকে নিজের জন্য নির্ধারিত করতেন না এবং অন্য লোককেও এরূপ করতে নিষেধ করতেন।[২] তিনি যখন মানুষের সাথে বসতেন, তখন

---

১. এখান থেকে হযরত হুসাইন (রা) রিওয়ায়াত শুরু হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীসের প্রথম হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এ অংশটি হযরত হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত।

২. প্রকাশ থাকে যে, এ অবস্থা ছিল প্রথম দিকের। পরবর্তী সময়ে যখন প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয় এবং বহিরাগতদের পক্ষে তাঁকে চিনতে অসুবিধা হয়, তখন তিনি তাঁর জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করতে সাহাবা কিরামকে অনুমতি দেন।

যেখানেই বসার স্থান পেতেন বসে পড়তেন এবং মানুষকেও এরূপ করতে নির্দেশ দিতেন। তিনি তাঁর মজলিসের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতেন। কেউ একথা অনুভব করতো না যে, সে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁর বেশি প্রিয় ব্যক্তি। যে ব্যক্তি (কোনো প্রয়োজন) তাঁর কাছে এসে বসতো কিংবা উঠে যেত তিনি তার সাথে নিজেকে সেই সময় পর্যন্ত আটকে রাখতেন যে পর্যন্ত সে নিজেই চলে না যেত। কেউ যদি তাঁর কাছে কোনো কিছু চাইতে আসতো, সে তার বাসনা পূরণ করে ফিরে যেতো কিংবা কোমল ব্যবহার ও সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যেতো। তাঁর ব্যবহার সমস্ত লোকের জন্য সমান ছিল। (স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে) তিনি ছিলেন তাঁদের পিতা। আর লোকেরা সব (অধিকারের ক্ষেত্রে) তাঁর কাছে ছিল সমান। তাঁর মজলিস ছিল ধৈর্যশীলতা, লজ্জাশীলতা, সত্যতা ও আমানতের মজলিস। সেখানে উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা হতো না। কারো ইযযত-আব্রুর উপর কলংক আরোপ করা হতো না। কারো দোষত্রুটি সমালোচিত হতো না। সভার সদস্যদের মধ্যে সংযত ভাব ছিল। তাক্ওয়া বজায় থাকতো। পরস্পরে ভদ্রতা ও নম্র আচরণ করতো। বড়দের শ্রদ্ধা করতো, ছোটদের স্নেহ করতো। অভাবগ্রস্তদের প্রাধান্য দিতো। অপরিচিত আগন্তুকদের প্রতি খেয়াল রাখতো।

হযরত হুসাইন (রা) বলেন, তারপর আমি (আমার পিতাকে) জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তাঁর সভার সদস্যদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন ? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁদের সাথে আনন্দচিত্তে মিলিত হতেন। তিনি নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। কঠোর ও দুর্বিনীত ছিলেন না। তিনি হাট-বাজারে হৈহুল্লোড় করতেন না। অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতেন না। কাউকে দোষারোপ করতেন না। কারো অহেতুক প্রশংসাও করতেন না। অপছন্দনীয় জিনিস থেকে তিনি দূরে থাকতেন এবং এ ব্যাপারে মানুষ তাঁর সম্পর্কে নিরাশ হতো। তিনি সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্যও করতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি নিজকে দূরে রেখেছিলেন। এক. ঝগড়া-বিবাদ থেকে, দুই. বেশি কথা বলা থেকে, তিন. অর্থহীন কাজ থেকে। তিনটি বিষয় থেকে তিনি অন্য মানুষকে রক্ষা করেছিলেন। এক. কারো কুৎসা রটনা করতেন না। দুই. কাউকে লজ্জা দিতেন না। তিন. কারো দোষ অন্বেষণ করতেন না। যে কথা বললে সাওয়াবের আশা করা যেতো, তিনি তাই বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন সভাসদগণ তাঁদের গর্দান এমনভাবে ঝুঁকিয়ে রাখতেন যেনো তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তিনি যখন কথা বন্ধ করতেন তখন অন্যরা কথা বলতেন। তাঁর সামনে কেউ কারো কথার প্রতিবাদ করতেন না। যখন কেউ কোনো কথা শুরু করতেন, তখন অন্যরা তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকতেন। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের কথাই তাঁর কাছে ততটুকু গুরুত্বের অধিকারী হতো, যতটুকু গুরুত্ব পেতো প্রথম ব্যক্তির কথা। সবাই যে কথা শুনে হাসতো, তিনিও তাতে হাসতেন। সবাই যাতে আশ্চর্য হতো, তিনিও তাতে আশ্চর্য হতেন। আগন্তুকের অসংলগ্ন কথাবার্তা ও প্রশ্নাবলি তিনি ধৈর্যসহকারে শ্রবণ করতেন। তাঁর সাহাবীগণ এরূপ লোকদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসতেন (যাতে তাদের প্রশ্নাবলি থেকে নতুন বিষয় জানা যায়)। তিনি বলতেন, তোমরা যখন কোনো অভাবগ্রস্তকে তার অভাব দূর করার প্রার্থনা করতে দেখো, তখন তাকে সাহায্য করো। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক, তিনি তা পছন্দ করতেন না। তবে কেউ কৃতজ্ঞতা বশত কিছু বললে তা ছিল স্বতন্ত্র। তিনি কারো কথার প্রতিবাদ করতেন না। অবশ্য সে যদি সীমা অতিক্রম করে যেতো, তবে তার কথার প্রতিবাদ করতেন। হয়তো তাকে নিষেধ করতেন কিংবা সেখান থেকে তিনি উঠে দাঁড়াতেন।

[হযরত হাসান (রা) বলেন] এরপর আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুপ থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চুপ থাকা ছিল চারটি কারণে। এক. সহনশীলতার কারণে, দুই. সাবধানতার দরুন, তিন. আন্দাজ করার উদ্দেশ্যে ও চার. চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। তাঁর আন্দাজ করা ছিল অবস্থার উপর পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করা এবং মানুষের আলাপ-আলোচনা শ্রবণ করা। আর তিনি চিন্তা-ভাবনা করতেন সেসব বিষয়ে, যা অবশিষ্ট থাকে এবং বিলীন হয় না। আর সহনশীলতা তাঁর ধৈর্যের মধ্যেই একত্র করা হয়েছিল। অর্থাৎ কোনো বিষয় তাঁকে ক্রুদ্ধও করতে পারতো না এবং অস্থিরও করতে পারতো না। আর সাবধানতা তাঁর জন্য চারটি জিনিসের মধ্যে একত্র করা হয়েছে। (আর তা হচ্ছে) তিনি উত্তম বস্তুটি গ্রহণ করতেন, যাতে মানুষ তাঁকে গ্রহণ করে এবং তিনি মন্দ বস্তু পরিত্যাগ করতেন, যাতে মানুষ তা থেকে বিরত থাকে। এবং যে জিনিসে তাঁর উম্মতের সংশোধন হতো, তিনি তার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করতেন আর যাতে তাদের কল্যাণ হতো, তিনি সে বিষয়ে সক্রিয় থাকতেন। এভাবে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণকে সমন্বিত করেছিলেন।

١٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهِ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشْرَ سِنِيْنَ، وَشَمَمْتُ الْعِطْرَ كُلَّهُ فَلَمْ اَشُمَّ نِكْهَةً أَطْيَبَ مِنْ نِكْهَتِهِ، وَكَانَ اذَا لَقِيَهُ اَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَامَ مَعَهُ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجلُ يَنْصَرِفُ عَنْهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَلَمْ يَنْزِعْ مِنْهُ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَالَّذِىْ يَنْزِعُ عَنْهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذُنَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَلَمْ يَنْزِعْهَا عَنْهُ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَالَّذِىْ يَنْزِعُهَا عَنْهُ -

১৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দশ বছর পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাহচর্যে ছিলাম এবং সব রকমের আতরের আমি ঘ্রাণ নিয়েছি। কিন্তু তাঁর মুখের ঘ্রাণ থেকে উত্তম কোনো ঘ্রাণ আমি শুকিনি। সাহাবাদের মধ্যে কারো সাথে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হতো, তখন তিনি তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং যে পর্যন্ত তিনি তাঁর থেকে পৃথক না হতেন, তিনি নিজে তাঁর থেকে পৃথক হতেন না। আর যখন কোনো সাহাবী তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার সময় তাঁর হাত মুবারক তাঁর হাতে নিতেন তখন যে পর্যন্ত ঐ সাহাবী তাঁর হাত গুটিয়ে না নিতেন, তিনি তাঁর হাত মুবারক গুটিয়ে নিতেন না। আর কোনো সাহাবী যখন তাঁর সাথে মিলিত হয়ে তাঁর কানে কানে কোনো কথা বলতে চাইতেন, তখন তিনি তাঁর কান তার দিকে পেতে দিতেন এবং সেই সময় পর্যন্ত তাঁর কান সরিয়ে আনতেন না, যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিজে না সরিয়ে নিতেন।

١٩. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ أَتَتْ بِى أُمِّى إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خُوَيْدِمُكَ، فَخَدَمْتُ النَّبِىُّ ﷺ تِسْعَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِىْ لِشَىْءٍ قَطُّ أَسَأْتَ وَلَا بِئْسَ مَاصَنَعْتَ -

১৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং তাঁকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই আপনার ছোট্ট সেবক। তারপর আমি নয় বছর পর্যন্ত নবী ﷺ-এর সেবা করলাম। (এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) তিনি কখনো আমাকে বলেননি যে, তুমি এ কাজটি ভাল করোনি কিংবা তুমি এ কাজটি খারাপ করেছো।[১]

٢٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ وَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى بَابِ حُجْرَتِى والْحَبْشُ يَلْعَبُوْنَ بِحَرَابِهِمْ فِى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُمْتُ أَنْظُرُ اِلَيْهِمْ فَقَامَ يَسْتُرُنِىْ بِرِدَائِهِ حَتَّى اِنْصَرَفْتُ أَنَا مِنْ قِبَلِ نَفْسِىْ فَاقْدُرُوْا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيْثَةِ السِّنِّ الْحَرِيْصَةِ عَلَى اللَّهْوِ -

২০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাবশী লোকেরা তখন মসজিদে নববীতে যুদ্ধের কসরত দেখাচ্ছিল। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কসরত দেখছিলাম। তখন তিনি আমাকে তাঁর চাদর দ্বারা আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং যে পর্যন্ত আমি সেখান থেকে সরে না এসেছি, তখন পর্যন্ত তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা অনুমান করো, একজন অল্প বয়সী বালিকার খেলাধুলার প্রতি কতখানি আগ্রহ থাকতে পারে (এবং তিনি কত দীর্ঘসময় পর্যন্ত তখন সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন)।

٢١ . عَنْ يَزِيْدَ بْنِ بَابْنُوْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا فَقُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَاكَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ كَانَ خُلُقُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْقُرْاٰنُ ثُمَّ قَالَتْ أَتَقْرَؤُنَ سَوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قُلْنَا نَعَمْ، قَالَتْ اِقْرَأْ، فَقَرَأتُ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ والَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ - فَقَالَتْ هٰكَذَا كَانَ خُلُقُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২১. হযরত ইয়াযীদ ইব্‌ন বাবনূস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) -এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চরিত্র কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআন। তারপর বলেন, তোমরা কি সূরা মু'মিনূন পড়ো না? আমরা বললাম, হ্যাঁ, পড়ি। তিনি বলেন, পড়ো, তখন আমি

১. এ হাদীস থেকে সেসব লোকের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা নিজেদের চাকর-নওকর ও কর্মচারীদের সাথে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করে থাকেন। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে অনুসরণ করা এবং নবী ﷺ-এর সুন্দরতম চরিত্রকে নিজেদের জীবনের অঙ্গীভূত করা। কেননা, নবী ﷺ-এর আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া মুক্তির কোন উপায় নেই।

পড়লাম "অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ; যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে; যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে; যারা যাকাত দানে সক্রিয়; যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে।" তারপর হযতর আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চরিত্র এরূপই ছিল।

٢٢ . عَنْ خَارِجَةَ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْعَرَاقِ دَخَلُوْا عَلَى زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا -

২২. হযরত খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা)-এর কাছে কিছু লোক ইরাক থেকে আগমন করলো। তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্যে ছিলাম। আমরা যখন দুনিয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করতাম তিনিও আমাদের সাথে ঐ প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন। আমরা যখন আখিরাত প্রসঙ্গ আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। আমরা যখন আহার সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সে বিষয়ে আলোচনা করতেন।[১]

٢٣ . عَنْ عُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَتْ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا خَلاَ ؟ قَالَتْ كَانَ أَبَرَّ النَّاسِ وَأَكْرَمَ النَّاسِ ضَحَّاكًا بَسَّامًا -

২৩. উমরাহ বিন্ত আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একান্তে কিভাবে কাটাতেন ? তিনি বললেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে পুণ্যবান ও ভদ্র এবং খুব হাসিখুশি ব্যক্তিত্ব।

٢٤. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ يَقُوْلُ مَارَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস ইব্ন জুয্ই (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেয়ে অধিক হাসিখুশি লোক দেখিনি।

٢٥. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ امْرَأَةً كَانَ فِىْ عَقْلِهَا شَئٌ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ لِىْ إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا أُمَّ فُلاَنٍ خُذِىْ فِىْ أَىِّ

১. এর দ্বারা জানা গেলো যে, নবী ﷺ-এর জীবনে কঠোরতা ছিল না। এবং নবী ﷺ-এর মজলিস ছিল সহজ-সরল। দীন ও দুনিয়ার সব রকম কথাই সেখানে আলোচিত হতো।

الطَّرِيْقِ شِئْتِ قُوْمِيْ فِيْهِ حَتَّى أَقُوْمَ مَعَكِ ؟ فَخَلاَ مَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
يُنَاجِيْهَا حَتَّى قَضَتْ حَاجَتَهَا -

২৫. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে কিছুটা ত্রুটি ছিল। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে অমুকের মা! তুমি যে কোনো এক রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও। যাতে আমিও তোমার সাথে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। তারপর তিনি তার সাথে গিয়ে একান্তে কথাবার্তা বললেন–যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রীলোকটি তার প্রয়োজন পূর্ণ করেন।

٢٦. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنْ كَانَتْ اَلْوَلِيْدَةُ مِنْ وَلاَئِدِ الْمَدِيْنَةِ تَجِيْ
فَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا حَتَّى تَذْهَبَ بِهِ حَيْثُ
شَاءَتْ -

২৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনার ছোট্ট মেয়েদের মধ্যে কোনো এক মেয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে আসতো এবং তাঁর হাত ধরতো। তিনি মেয়েটির হাত থেকে নিজের হাত গুটিয়ে নিতেন না। সে যেখানে ইচ্ছা তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যেতো।

٢٧. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَتْ اَلْاَمَةُ مِنْ اِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ
ﷺ فَيَدُوْرُبِهَا فِيْ حَوَائِجِهَا حَتَّى تَفْرُغَ ثُمَّ تَرْجِعُ -

২৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদীনাবাসী দাসীদের মধ্য থেকে কোন এক দাসী এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত ধরতো। তিনি তাকে সাথে নিয়ে তার প্রয়োজনের জন্য ঘুরে বেড়াতেন যে পর্যন্ত সে তার কাজ শেষ করে ফিরে না যেতো।

٢٨. عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَارَأَيْتُ رَجُلاً قَطُّ أَخَذَ بِيَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَتْرُكُ يَدَهُ
حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ يَنْزِعُ يَدَهُ -

২৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কখনো এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর হাত নিজের হাতে নিয়েছে আর তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত সে নিজেই তার হাত গুটিয়ে না নিতো।

٢٩. وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ وَمَارَأَيْتُ رَجُلاً قَطُّ اَلْتَقَمَ أُذُنَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيُنَحِّيْ
رَأْسَهُ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يُنَحِّيْ رَأْسَهُ يَعْنِي الرَّجُلَ-

২৯. হযরত আনাস (রা)-এর অন্য এক রিওয়ায়াতে আরো বর্ণিত আছে যে, (তিনি বলেন) আমি কখনো এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি, যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কানে কানে কোন কথা বলার জন্য তাঁর দিকে ঝুঁকেছে আর তিনি তাঁর শির তার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন যে পর্যন্ত সে তার নিজের মাথা সরিয়ে না নিতো।

٣٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُبَّمَا نَزَلَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَقَدْ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَيَعْرِضُ الرَّجُلُ فَيُحَدِّثُهُ طَوِيْلاً ثُمَّ يَتَقَدَّمُ اِلَى الصَّلَاةِ -

৩০. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কখনো এমনও হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতের জন্য মিম্বার থেকে নেমেছেন। সালাতের ইকামতও বলা হয়েছে, এমন সময় কোন ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে লম্বা আলাপ জুড়ে দিয়েছে। আলাপ শেষ হওয়ার পর তিনি সালাতের জন্য অগ্রসর হয়েছেন।

٣١. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ أَوْ بِلَالاً كَانَ يُقِيْمُ فَيَدْخُلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيَسْتَقْبِلُهُ الرَّجُلُ فَيَقِيْمُ مَعَهُ حَتّٰى يَخْفِقَ عَامَّتُهُمْ بِرُؤُسِهِمْ -

৩১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুয়ায্যিন (কিংবা বলেন, বিলাল) ইকামত বলতো এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে প্রবেশ করতেন। এরপর কোনো ব্যক্তি তাঁর সামনে আসতো এবং তিনি তার সাথে এতো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তন্দ্রায় লোকদের মাথা ঢুলতে থাকত।

٣٢. عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ، فَوَاللّٰهِ مَاقَالَ لِىْ أُفٍّ قَطُّ، وَلَمْ يَقُلْ لِشَىْءٍ فَعَلْتُهُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَ اَوْكَذَا؟ وَلَا لِشَىْءٍ لَمْ اَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَ كَذَا؟

৩২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমত করেছি। আল্লাহ্র কসম! তিনি আমার কাজে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি। আমার কোন কাজে তিনি একথাও বলেননি যে, তুমি এ কাজটি কেন করেছো ? আর কোনো কাজ না করলে তিনি একথাও বলেননি যে, তুমি এ কাজটি কেন করলে না ?

٣٣. عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمْ يُعَيِّرْ عَلَىَّ شَيْئًا قَطُّ أَسَأْتُ فِيْهِ -

৩৩. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি আমার কোনো ত্রুটিতে কখনো আমাকে লজ্জা দেননি।

٣٤. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجِيْئُ إِلَيْنَا وَأَخٌ لِيْ صَغِيْرٌ فَيَقُوْلُ يَاأَبَا عُمَيْرٍ! مَافَعَلَ النُّغَيْرُ؟

৩৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের বাড়িতে আগমন করতেন। আমার একটি ছোট ভাই ছিল। তিনি (কৌতুক করে তাকে) বলতেন, হে আবূ উমায়র! কোথায় গেল তোমার নুগায়র ?

٣٥. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُخَالِطُنَا وَيَغْشَانَا، وَكَانَ مَعَنَا صَبِيٌّ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ عُمَيْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاأَبَا عُمَيْرُ مَافَعَلَ النُّغَيْرُ؟

৩৫. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের সাথে সদ্ভাব রাখতেন এবং আমাদের এখানে আসা-যাওয়া করতেন। আমাদের সাথে একটি ছেলে ছিল। তাকে আবূ উমায়র নামে ডাকা হতো। (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কৌতুক করে তাকে বললেন, হে আবূ উমায়র! কোথা গেল তোমার নুগায়র ?[১]

٣٦. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِيْ أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُوْ عُمَيْرٍ أَحْسِبُهُ قَالَ فَطِيْمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَآهُ قَالَ أَبُوْ عُمَيْرٍ! مَافَعَلَ النُّغَيْرُ؟ نُغَيْرُ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ -

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ ابْنَ لَهُ يُكَنَّى أَبَا عُمَيْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ أَبَا عُمَيْرٍ! مَافَعَلَ النُّغَيْرُ؟

৩৬. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ উমায়র নামে আমার এক ভাই ছিল। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেছিলেন, তার দুধ ছাড়ানো হয়েছিল) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন তাকে দেখতেন, তখন বলতেন, হে আবূ উমায়র! কোথায় গেলে তোমার নুগায়র ? নুগায়রের সাথে ঐ ছেলেটি খেলা করতো।

হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবূ তালহা (রা)-এর একটি ছেলের কুনিয়াত ছিল আবূ উমায়র। নবী ﷺ তাকে বলতেন, হে আবূ উমায়র! কোথায় গেলে নুগায়র ?

٣٧. عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَاشَمَمْتُ رَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ وَلَا تَنَاوَلَ أَحَدٌ يَدَهُ فَيَتْرُكُهَا حَتَّى يَكُوْنَ هُوَ الَّذِيْ يَتْرُكُهَا، وَمَا أَخْرَجَ رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ جَلِيْسٍ لَهُ قَطُّ، وَمَا قَعَدَ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ قَطُّ فَقَامَ حَتَّى يَقُوْمَ -

১. নুগায়র বুলবুল কিংবা লাল পাখিকে বলা হয়।

৩৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর চেয়ে উত্তম কোনো সুগন্ধি শুঁকিনি। [হযরত আনাস (রা) বলেন] এমন কখনো হয়নি যে, কোন ব্যক্তি তাঁর সাথে হাত মিলিয়েছে আর তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দিয়েছেন। যে পর্যন্ত সে তার হাত ছেড়ে না দিত। তিনি কখনো তাঁর কাছে কোনো উপবেশনকারীর সামনে হাঁটু প্রসারিত করেননি। আর এমন কখনো হয়নি যে, কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে বসেছে এবং তিনি তার দাঁড়ানোর পূর্বে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

٣٨. عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَاأَخْرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُكْبَتَيْهِ قَطُّ بَيْنَ يَدَىْ جَلِيْسٍ لَهُ وَلَا قَعَدَ أَحَدٌ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَيَقُوْمَ حَتَّى يَقُوْمَ الاَ خَرُ وَلَا نَاوَلَ يَدَهُ النَّبِىَّ ﷺ فَيَتْرُكُ يَدَهُ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَيَتْرُكُهَا -

৩৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো তাঁর কাছে উপবেশনকারীর সামনে হাঁটু ছড়িয়ে বসেননি। আর এমন কখনো হয়নি যে, তাঁর কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে এসে বসেছে এবং সে উঠে যাওয়ার পূর্বে তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর এমনও কখনো হয়নি যে, কোনো ব্যক্তি তার হাত নবী ﷺ-এর মুবারক হাতের সাথে মিলিয়েছে এবং তিনি তাঁর হাত ছেড়ে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি তাঁর হাত ছেড়ে না দিত।

٣٩. عَنْ أَبِىْ مَالِكٍ الاَ شْجَعِىُّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كُنَّا نُجَالِسُ النَّبِىَّ ﷺ فَمَا رَأَيْتُ أَطْوَلَ صَمْتًا مِنْهُ وَكَانُوْا اِذَا اَكْثَرُوْا عَلَيْهِ تَبَسَّمَ -

৩৯. আবূ মালিক আশজাঈ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর নিকট উপবেশন করতাম। আমি তাঁর চেয়ে অধিক নির্বাক কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি। সাহাবীগণ যখন তাঁর নীরবতাকে অধিক উপভোগ করতেন, তখন তিনি হেসে দিতেন।

٤٠. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِىَّ ﷺ رَجُلاً سَهْلاً إِذَا هَوِيَتْ يَعْنِىْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا الشَّئْ تَابَعَهَا عَلَيْهِ -

৪০. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অত্যন্ত শিষ্ট নবী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) যখন কোনো কিছু কামনা করতেন, তখন তিনি তা পূরণ করতেন।

٤١ عَنِ ابْنِ اَبِىْ اَوْفٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُكْثِرُ الذِكْرَ وَيُقِلُّ اللَّغْنَ وَيُطِيْلُ الصَّلاَةَ وَيَقْصُرُ الْخُطْبَةَ وَكَانَ لاَ يَانِفُ وَلاَ يَسْتَكْبِرُ أَنْ يَمْشِىَ مَعَ الأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ فَيَقْضِىْ لَهُ حَاجَتَهُ -

৪১. হযরত ইব্‌ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করতেন এবং কাউকে অভিশাপ করতেন না। তিনি সালাত দীর্ঘ করতেন এবং খুত্‌বা সংক্ষেপ করতেন। বিধবা ও মিস্‌কীনদের সাথে চলে তাদের অভাব পূর্ণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। নিজকে তাদের চেয়ে বড়ও মনে করতেন না।

٤٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سِنِيْنَ فَمَا سَبَّنِى سَبَّةً قَطُّ، وَلاَ ضَرَبَنِى ضَرْبَةً وَلاَ انْتَهَرَنِىْ وَلاَ عَبَسَ فِىْ وَجْهِىْ، وَلاَ أَمَرَنِى بِأَمْرٍ فَتَوَانَيْتُ فِيْهِ فَعَاتَبَنِىْ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَاتَبَنِى عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ قَالَ دَعُوْهُ فَلَوْ قُدِرَ شَيْئٌ كَانَ -

৪২. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর বহু বছর খিদমত করেছি। (এই দীর্ঘ সময়ে) তিনি আমাকে কখনো গালি দেননি, মারপিট করেননি, ধমক দেননি, চোখ রাঙাননি। আর এমন কোনো বিষয়ে তিনি আমাকে তিরস্কারও করেননি, যা তিনি আমাকে করতে আদেশ করেছেন অথচ আমি তা করতে আলস্য করেছি। তাঁর গৃহের কেউ যদি এ ব্যাপারে আমাকে ভর্ৎসনা করতো, তবে তিনি বলতেন, আরে রাখো তো! যদি তকদীরে থাকত তাহলে তো তা ঘটতই।

وَمَارُوِىَ مِنْ كَرَمِهِ، كَثْرَةِ احْتِمَالِهِ وَكَظْمِهِ الْغَيْظَ

নবী ﷺ -এর দয়া, পরম ধৈর্য ও ক্রোধ সংবরণ

٤٣. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ امْرَأَةً قَطُّ وَلاَ ضَرَبَ خَادِمًا قَطُّ وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلاَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ نِيْلَ مِنْهُ فَانْتَقَمَ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ اَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُهُ فَيَنْتَقِمُ -

৪৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনো কোনো স্ত্রীকে মারেননি। কখনো কোনো খাদিমকেও মারেননি এবং কারো উপর তিনি তাঁর হাত কখনো তোলেননি। তবে তিনি যখন আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করতে বের হতেন তখনকার কথা আলাদা। আর এমনও কখনো হয়নি যে, কেউ তাঁকে কষ্ট দিয়েছে এবং তিনি তার প্রতিশোধ নিয়েছেন। তবে কেউ যদি দীনের বিধি-নিষেধ অমান্য করতো, তিনি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

٤٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَ هُمَا مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ -

৪৪. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যখন কোন দু'টি বিষয়ের মধ্যে ইখ্তিয়ার দেয়া হতো, তখন তিনি সবচেয়ে সহজ পন্থাটি গ্রহণ করতেন, আর যদি তা পাপের কাজ হতো, তবে তিনি তা থেকে সবার চেয়ে অধিক দূরে থাকতেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর নিজস্ব ব্যাপারে কখনো কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধ যদি লঙ্ঘন করা হতো (তখন তিনি তার অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন)।

٤٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُنْتَصِرًا مِنْ ظَلاَمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ إِلاَّ أَنْ يُنْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ شَيْئٌ وَإِذَا انْتُهِكَ مِنْ مَحَارِمِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئٌ كَانَ أَشَدَّهُمْ فِيْ ذٰلِكَ وَمَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا -

৪৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনো তাঁর উপর কৃত জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে দেখিনি। তবে আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের অবমাননা করা হলে সে সময়ের কথা স্বতন্ত্র। আর যখন আল্লাহ্র বিধি-নিষেধের সামান্যতমও অবমাননা করা হতো, তখন তিনি সে ব্যাপারে সবার চেয়ে অধিক কঠোরতা অবলম্বন করতেন। আর যখনই তাঁকে কোনো দু'টি বিষয়ের মধ্যে ইখ্তিয়ার দেয়া হয়েছে, তিনি তার মধ্যে সহজতর পথটি গ্রহণ করেছেন।

٤٦. عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ وَأَنَا غُلاَمٌ لَيْسَ كُلُّ أَمْرِ أَمْرَنِيْ كَمَا يَشْتَهِيْ صَاحِبِيْ أَنْ يَكُوْنَ ، فَمَا قَالَ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا؟ أَوْ أَلاَّ فَعَلْتَ هٰذَا ؟

৪৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খেদমত করেছি। আমি তখন ছোট্ট ছিলাম। তাই সব কাজ আমি তাঁর মন মতো করতে পারতাম না। তবুও তিনি কখনো আমাকে এ কথা বলেননি যে, তুমি এরূপ কেন করলে ? কিংবা এরূপ কেন করলে না ?

٤٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِشَيْءٍ قَطُّ لِمَ صَنَعْتَ كَذَا أَوْ كَذَا؟

৪৭. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহচর্যে ছিলাম। (এই দীর্ঘ সময়ে) তিনি কখনো কোনো ব্যাপারে আমাকে বলেননি যে, তুমি এরূপ এরূপ করলে কেন ?

٤٨. عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ لَمْ يَقُلْ لِشَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَ فَعَلْتَ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ أَلَا فَعَلْتَهُ؟

৪৮. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী ﷺ-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি আমার কোনো কৃতকর্মের উপর একথা বলেননি যে, তুমি এরূপ কেন করলে ? আর কোনো কাজ না করলেও বলেননি যে, তুমি এ কাজটি কেন করোনি ?

٤٩. عَنْ أَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ تِسْعَ سِنِيْنَ، فَمَا قَالَ لِشَيْءٍ أَسَأْتَ وَلَا بِئْسَ مَاصَنَعْتَ ، وَكَانَ إِذَا أَنْكَرَ الشَّيْءَ يَقُوْلُ كَذَا قُضِيَ -

৪৯. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নয় বছর পর্যন্ত নবী ﷺ -এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি কোনো ব্যাপারেই একথা বলেননি যে, তুমি খারাপ করেছো এবং একথা বলেননি যে, তুমি মন্দ কাজ করেছো। আর যখন তিনি কোনো বিষয়কে অপছন্দ করতেন, তখন বলতেন, এরূপ কথাই বলা ছিল।

٥٠. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ فِيْ شَيْءٍ فَعَلْتُ لِمَ فَعَلْتَ؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ لِمَ لَمْ تَفْعَلْهُ؟ زَادَ مَعْمَرٌ وَمَا سَبَّنِيْ سَبَّةً قَطُّ -

৫০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী ﷺ-এর খিদমত করেছি। কিন্তু তিনি আমার কোনো কাজ সম্পর্কেই একথা বলেননি যে, তুমি এটি কেন করেছ এবং আমি কোনো কাজ না করলে একথা বলেননি যে, তুমি এটি করলে না কেন ? এ রিওয়ায়াতে মামার থেকে এ বাক্যটিও বর্ণিত আছে যে, এবং তিনি আমাকে কখনো গালমন্দও করেননি।[১]

---

১ হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনাগুলোর বিষয়বস্তু যদিও অভিন্ন, কিন্তু যেহেতু হাদীসসমূহ বিবিধ সূত্র থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাই হাফিয আবূ শায়খ ইস্ফাহানী (র) প্রতিটি বর্ণনাকে ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃত করেছেন।

٥١. عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَبَّابًا وَلَا فَحَّاشًا كَانَ يَقُوْلُ لِاحَدِنَا فِىْ الْمَعْتَبَةِ مَالَهُ تَرِبَتْ يَمِيْنُهُ!

৫১. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাউকে গালাগালও করতেন না এবং কাউকে অশালীন কথাও বলতেন না। তিনি যখন আমাদের কাউকে ভর্ৎসনা করতে চাইতেন, তখন বলতেন ঃ তার কি হয়েছে ? তার হাত ধুলিমলিন হোক।

٥٢. عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ خِيَارُكُمْ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا -

৫২. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ না অশ্লীল ভাষী ছিলেন, না নির্লজ্জর মত ভাষা প্রয়োগ করতেন। বরং তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সর্বোত্তম।

٥٣ . عَنْ أَبِىْ ذَرَّ قَالَ كَانَ النَبِىُّ ﷺ بِأَبِىْ وَأُمِّىْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا وَلَا سَخَّابًا فِى الأَسْوَاقِ -

৫৩. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাতা-পিতা নবী ﷺ -এর জন্য কুরবান, তিনি না অশ্লীল ভাষী ছিলেন, না নির্লজ্জের মত ভাষা প্রয়োগ করতেন। আর না তিনি হাট-বাজারে চিৎকার করে কথা বলতেন।

٥٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا صَافَحَ رَجُلًا لَمْ يَنْزِعْ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِىْ يَنْزِعُ يَدَهُ، وَلَا يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَالَّذِيْنَ يَصْرِفُ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ بَيْنَ يَدَىْ جَلِيْسٍ لَهُ قَطُّ -

৫৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কারো সাথে মুসাফাহা করতেন, তখন ঐ ব্যক্তি তার হাত গুটিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর হাত মুবারক গুটিয়ে নিতেন না এবং তিনি তাঁর চেহারা মুবারক ঐ ব্যক্তির থেকে ফিরিয়ে নিতেন না, যে পর্যন্ত সে তার চেহারা ফিরিয়ে না নিতো। আর কখনো তাঁকে এমন অবস্থায়ও দেখা যায়নি যে, তিনি তাঁর কাছে কোনো উপবেশনকারীর দিকে তাঁর হাঁটু বাড়িয়ে দিয়েছেন।

٥٥. عَنْ يَزِيْدَ الرُّقَاشِى عَنْ أَنَسٍ مِثْلَهُ

৫৫. ইয়াযীদ রাক্কাশীও হযরত আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٥٦. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ مَاسَأَلَ سَائِلَ قَطُّ إِلاَّ أَصْغَى إِلَيْهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَالَّذِىْ يَنْصَرِفُ، وَمَا تَنَاوَلَ أَحَدٌ يَدَهُ قَطُّ إِلاَّ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ فَلَمْ يَنْزِعْهَا مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَكُوْنَ هُوَالَّذِىْ يَنْزِعُهَا -

৫৬. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট যখনই কোনো প্রশ্নকারী প্রশ্ন করতো, তিনি তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী থাকতেন যে পর্যন্ত সে নিজে সরে না যেতো। আর যখন কোনো ব্যক্তি তার হাতে তাঁর হাত মুবারক নিতো তখন তিনি তাঁর হাত মুবারক তাকে প্রদান করতেন। তারপর যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি তার নিজের হাত ছাড়িয়ে না নিতো, তিনি তাঁর হাত মুবারক ছাড়িয়ে নিতেন না।

٥٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَ سِنِيْنَ فَشَمَمْتُ الْعِطْرَ وَلَمْ أَشُمَّ نَكْهَةً أَطْيَبَ مِنْ نَكْهَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَامَ مَعَهُ لَمْ يَنْصَرِفْ عَنْهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ يَدَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ لَمْ يَنْزِعْهَا مِنْهُ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَالَّذِىْ يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْهُ، وَإِذَا لَقِيَهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَتَنَاوَلَ أُذُنَهُ نَاوَلَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ لَمْ يَنْزِعْهَا مِنْهُ حَتَّى يَكُوْنَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِىْ يَنْزِعُهَا مِنْهُ -

৫৭. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমত করেছি। আর আমি (সব রকমের) আতরের ঘ্রাণ শুঁকেছি কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখের ঘ্রাণ থেকে উত্তম কোনো সুগন্ধি শুঁকিনি। সাহাবাদের মধ্য থেকে যখনই কারো সাথে তাঁর সাক্ষাত হতো, তিনি তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তার থেকে দূরে থাকতেন না। আর যখন তাঁর সাহাবীদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাথে মিলিত হতো এবং তাঁর হাত মুবারক নিজের হাতে নিতো, তখন তিনি তাঁর হাত মুবারক ঐ ব্যক্তির হাতে প্রদান করতেন এবং সেই সময় পর্যন্ত ছাড়িয়ে নিতেন না যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিজেই তার হাত ছাড়িয়ে না নিতো। আর যখন কোনো সাহাবী তাঁর সাথে মিলিত হয়ে তাঁর কানে কোনো কথা বলতে চাইতো, তিনি তাঁর কান তার দিকে পেতে দিতেন এবং সেই অবধি তা সরিয়ে নিতেন না যে পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি নিজেই তা সরিয়ে না নিতো।

٥٨. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِىَّ ﷺ عَشَرَسِنِيْنَ لَمْ يَضْرِبْنِى قَطُّ، وَلَمْ يَنْتَهِرْنِى يَوْمًا قَطُّ، وَلَمْ يَعْبَسْ وَجْهَهُ عَلَىَّ يَوْمًا قَطُّ–

৫৮. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত নবী ﷺ-এর সেবা করেছি। (কিন্তু এই সুদীর্ঘ সময়ে) তিনি আমাকে কখনো মারেননি। কোনো দিন আমাকে ধমকাননি। কোনো দিন আমার প্রতি ভ্রুকুটি করেননি।

٥٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَكَرَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ كَانَ أَكْرَمَ النَّاسِ –

৫৯. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) একবার নবী ﷺ -এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র ও দয়ালু।

٦٠. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَدْرَكَهُ أَعْرَابِىٌّ فَأَخَذَ بِرِدَائِهِ فَجَبَذَهُ جَبْذَةً شَدِيْدَةً فَنَظَرْتُ إِلَى عُنُقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ أَثَّرَتْ فِيْهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ يَامُحَمَّدُ! مُرْ لِىْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَضَحِكَ وَأَمَرَلَهُ بِعَطَاءٍ –

৬০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার এক বেদুঈন নবী ﷺ-এর চাদর ধরে জোরে হেঁচকা টান মারলো। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তাতে জোরে চাদর টানার কারণে দাগ পড়ে গিয়েছে। তারপর বেদুঈন বললো, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্‌র যে সম্পদ তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দান করার নির্দেশ দাও। তিনি তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু সম্পদ দানের নির্দেশ দিলেন।

شِدَّةُ حَيَائِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর পরম লজ্জাবোধ

٦١. عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِىْ خِدْرِهَا، وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِىْ وَجْهِهِ –

৬১. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ পর্দানশীল কুমারী অপেক্ষাও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোনো কিছু অপছন্দ করতেন আমরা তা তাঁর চেহারা মুবারক দেখেই বুঝে ফেলতাম।

৬৫. হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হয়ে বললো, আমার পড়শীদেরকে কোন্ অপরাধে বন্দী করা হয়েছে ? নবী ﷺ তার এই ঔদ্ধত্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ফলে সে তাঁকে হুমকি দিয়ে বললো, আমি যদি একথা সবার সামনে বলে দেই, তবে তারা ভাববে যে, তুমি তো লোকদেরকে অন্যায় ও জুলুম করা থেকে বারণ করো কিন্তু নিজে তা মেনে চলো না। এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তার ভাই উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তার দুর্ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে (আমি তার দায়িত্ব নিলাম) তখন তিনি বললেন, শোনো! তোমরা যদি একথা বলেও থাকো এবং আমি যদি এ কাজ করেও থাকি, তবে মনে রেখো! আমিই তার প্রতিফল ভোগ করবো, তোমরা নয়। তারপর তিনি সাহাবাগণকে বললেন, ঐ ব্যক্তির পড়শীদেরকে মুক্ত করে দাও।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর মুসনাদে এর চেয়ে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমার গোত্রের কতিপয় লোককে কোনো এক অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দী করেছিলেন। সেই ব্যাপারে আমার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হলো, তিনি তখন খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। সে (রাগান্বিত অবস্থায়ই অত্যন্ত অভদ্রভাবে) বললো, আমার পড়শীদেরকে কেন বন্দী করা হয়েছে ? নবী ﷺ চুপ রইলেন। কোনো জবাব দিলেন না। তারপর সে তাঁকে ধমক দিয়ে বললো (আমি যদি আপনার এই অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুলে ধরি, তবে লোকেরা বলবে, আপনি অন্য লোকদেরকে তো জুলুম অত্যাচার ও নির্যাতন-উৎপীড়ন থেকে বারণ করেন, কিন্তু অহেতুক নিজে তা থেকে বিরত থাকেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কথা সম্পূর্ণ শুনতে পাননি, তাই) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি কি বলছে ? মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা (রা) বলেন, (আমি একথা শুনে সামনে অগ্রসর হলাম এবং) উভয়ের কথাবার্তার মাঝখানে অন্তরায় সাজলাম। আমার আশংকা ছিল, নবী ﷺ যদি আমার গোত্রকে বদ-দু'আ করেন, তবে তাদের কখনো কল্যাণ হবে না। কিন্তু একটু পরেই তিনি ঐ ব্যক্তির কথা বুঝতে পারলেন এবং বললেন, লোকেরা তো একথা বলেছে (এবং অপবাদ দিয়েছে) এবং ভবিষ্যতেও এরূপ বলবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এরূপ করি, তবে তার প্রতিফল আমি ভোগ করবো তারা নয়! এরপর তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন যে, ঐ ব্যক্তির পড়শীদেরকে মুক্তিদান করো।

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত বড় ভদ্র ও মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। লোকদের অহেতুক অভদ্র ও অশালীন আচরণ সত্ত্বেও তিনি তাদের সাথে সর্বদা ক্ষমা ও দয়াই প্রদর্শন করতেন। কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। মুখ দিয়ে খারাপ কথা সর্বদা উচ্চারণ করতেন না, শাস্তিও দিতেন না। এমনকি তাদেরকে বদ-দু'আও করতেন না। বরং সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিতেন। তাঁর গোটা জীবন-চরিত ও সমগ্র ঘটনাই এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

৬৫. হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে হাযির হয়ে বললো, আমার পড়শীদেরকে কোন্ অপরাধে বন্দী করা হয়েছে ? নবী ﷺ তার এই ঔদ্ধত্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ফলে সে তাঁকে হুমকি দিয়ে বললো, আমি যদি একথা সবার সামনে বলে দেই, তবে তারা ভাববে যে, তুমি তো লোকদেরকে অন্যায় ও জুলুম করা থেকে বারণ করো কিন্তু নিজে তা মেনে চলো না। এ কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তার ভাই উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে তার দুর্ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে (আমি তার দায়িত্ব নিলাম) তখন তিনি বললেন, শোনো! তোমরা যদি একথা বলেও থাকো এবং আমি যদি এ কাজ করেও থাকি, তবে মনে রেখো! আমিই তার প্রতিফল ভোগ করবো, তোমরা নয়। তারপর তিনি সাহাবাগণকে বললেন, ঐ ব্যক্তির পড়শীদেরকে মুক্ত করে দাও।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ (র)-এর মুসনাদে এর চেয়ে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা (রা) বলেন, নবী ﷺ আমার গোত্রের কতিপয় লোককে কোনো এক অভিযোগের ভিত্তিতে বন্দী করেছিলেন। সেই ব্যাপারে আমার গোত্রের জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট উপস্থিত হলো, তিনি তখন খুত্‌বা দিচ্ছিলেন। সে (রাগান্বিত অবস্থায়ই অত্যন্ত অভদ্রভাবে) বললো, আমার পড়শীদেরকে কেন বন্দী করা হয়েছে ? নবী ﷺ চুপ রইলেন। কোনো জবাব দিলেন না। তারপর সে তাঁকে ধমক দিয়ে বললো (আমি যদি আপনার এই অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ জনসমক্ষে তুলে ধরি, তবে লোকেরা বলবে, আপনি অন্য লোকদেরকে তো জুলুম অত্যাচার ও নির্যাতন-উৎপীড়ন থেকে বারণ করেন, কিন্তু অহেতুক নিজে তা থেকে বিরত থাকেন না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার কথা সম্পূর্ণ শুনতে পাননি, তাই) লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এই লোকটি কি বলছে ? মুআবিয়া ইব্‌ন হায়দা (রা) বলেন, (আমি একথা শুনে সামনে অগ্রসর হলাম এবং) উভয়ের কথাবার্তার মাঝখানে অন্তরায় সাজলাম। আমার আশংকা ছিল, নবী ﷺ যদি আমার গোত্রকে বদ-দু'আ করেন, তবে তাদের কখনো কল্যাণ হবে না। কিন্তু একটু পরেই তিনি ঐ ব্যক্তির কথা বুঝতে পারলেন এবং বললেন, লোকেরা তো একথা বলেছে (এবং অপবাদ দিয়েছে) এবং ভবিষ্যতেও এরূপ বলবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি এরূপ করি, তবে তার প্রতিফল আমি ভোগ করবো তারা নয়! এরপর তিনি সাহাবাগণকে নির্দেশ দিলেন যে, ঐ ব্যক্তির পড়শীদেরকে মুক্তিদান করো।

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত বড় ভদ্র ও মহান চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। লোকদের অহেতুক অভদ্র ও অশালীন আচরণ সত্ত্বেও তিনি তাদের সাথে সর্বদা ক্ষমা ও দয়াই প্রদর্শন করতেন। কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। মুখ দিয়ে খারাপ কথা সর্বদা উচ্চারণ করতেন না, শাস্তিও দিতেন না। এমনকি তাদেরকে বদ-দু'আও করতেন না। বরং সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দিতেন। তাঁর গোটা জীবন-চরিত ও সমগ্র ঘটনাই এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কারো থেকে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

সহীহ্ বুখারীতে শিষ্টাচার অধ্যায়ে (২য় খণ্ড, ৯০৪ পৃষ্ঠা) হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো তাঁর নিজের ব্যাপারে কারো থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহ্র দীন ও তাঁর বিধি-বিধানের অবমাননা করা হলে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।

٦٦. حَدَّثَ عَبْدُ اللّٰه بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الاَنْصَارِ خَاصَمُوْا الزُّبَيْرَ فِىْ شِرْجٍ مِنْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِىْ يَسْقُوْنَ بِهَا الْمَاءَ ، فَغَضِبَ الاَنْصَارِىُّ وَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰه اِنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ النَّبِىِّ ﷺ وَقَالَ اِسْقِ يَازُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتّٰى يَبْلُغَ الْجُدُرَ ثُمَّ اَرْسِلِ الْمَاءَ اِلٰى جَارِكَ -

৬৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, (একবার আমার পিতা) হযরত যুবায়র (রা)-এর সাথে মদীনার প্রস্তরময় অঞ্চলের এমন এক পানির নালার ব্যাপারে এক আনসারীর বিবাদ হলো যা থেকে (আশপাশের) লোকটি (তাদের ক্ষেত ও বাগানসমূহের) পানি সেচ দিতো। শেষে এই বিবাদ নবী ﷺ-এর দরবারে পেশ হলো। তিনি সে বিবাদ মীমাংসা করলেন। ঐ আনসারী তার বোকামি ও বক্রবুদ্ধির দরুন এ মীমাংসাকে যুবায়রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বলে গণ্য করলো এবং ক্রুদ্ধ হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই। (এজন্য আপনি তার পক্ষপাতিত্ব করেছেন। যেহেতু এটি ছিল তাঁর সততা ও ন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আক্রমণ) তাই তাঁর মুখমণ্ডল মুবারক রাগে লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু তিনি ঐ অভদ্র আনসারীকে কিছুই বললেন না এবং যুবায়র (রা)-কে বললেন ঃ যুবায়র! তুমি তোমার ক্ষেতে পানি সেচ করো এবং ক্ষেতের আল পর্যন্ত পানি জমিয়ে রেখে তারপর তোমার পড়শীর ক্ষেতে পানি ছেড়ে দাও।

ফায়দা ঃ গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ক্ষমা গুণের বর্ণনা দেয়া, তাই তিনি ক্ষমার সাথে সম্পর্কিত এই হাদীসের শেষ অংশটুকু শুধু বর্ণনা করেন। মিশকাত শরীফে (পৃষ্ঠা ২৫৯) পুরো হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তাতে আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বর্ণনা করেন যে, (প্রথম অর্থাৎ আনসারী কর্তৃক রাগান্বিত করার পূর্বে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত যুবায়র (রা)-কে বলেন, যুবায়র! তুমি (তোমার ক্ষেতে প্রয়োজন পরিমাণ) পানি সেচ করো। তারপর তোমার পড়শীর (ক্ষেতের) দিকে পানি ছেড়ে দাও। নবী ﷺ কর্তৃক হযরত যুবায়র (রা)-কে এই পরামর্শ দান ছিল পড়শীর অধিকার ও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করার ভিত্তিতে। কিন্তু নির্বোধ আনসারী তাকে যুবায়রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মনে

করে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো (এবং) বললো, যুবায়র আপনার ফুফাত ভাই বলে আপনি তার পক্ষপাতিত্ব ও আমার অধিকার হরণ করছেন। তখন নবী ﷺ নিদের্শ দিলেন ঃ হে যুবায়র! তুমি তোমার ক্ষেতে পানি সেচ করো এবং তোমার ক্ষেতের আল পর্যন্ত পানি বেঁধে রাখো। তারপর তোমার পড়শীর ক্ষেতের দিকে পানি ছেড়ে দিবে। বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, আনসারী যখন পক্ষপাতিত্বের অপবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাগান্বিত করে দিলো, তখন তিনি বিচার নীতির স্পষ্ট বিধি অনুযায়ী যুবায়রের অধিকার[১] তাকে পুরোপুরি দিয়ে দেন। এর পূর্বে তিনি (উভয়ের সুবিধা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে) মীমাংসা করার ভিত্তিতে এমন এক পরামর্শ দিয়েছিলেন যাতে উভয়ের জন্য সুবিধা ছিল।

হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উদার মানসিকতা সম্পর্কে অনুমান করুন। আনসারী নবী ﷺ-এর সততা ও আমানতদারীর উপর আক্রমণ করছে, অধিকার হরণ ও পক্ষপাতিত্বের অপবাদ দিচ্ছে, প্রচণ্ড ক্রোধে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করছে। কিন্তু তাঁর পবিত্র মুখ থেকে একটি বাক্যও উচ্চারিত হচ্ছে না। কেননা, তিনি জানেন যে, ঐ ব্যক্তি যদিও মুসলমান তবে নির্বোধ ও ক্রোধে অভিভূত। তার কথায় উত্তেজিত হওয়া ঠিক নয়। কিন্তু তার হুঁশিয়ারি ও শিক্ষার জন্য হযরত যুবায়র (রা)-কে তার পূর্ণ অধিকার বুঝে নিতে বললেন। আর এটাই হচ্ছে ক্রোধ সংবরণ করা ও অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করার উত্তম আদর্শের উচ্চতম মাপকাঠি, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎকর্মপরায়ণদেরকে ভালবাসেন। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার নিষ্পাপ নবীর উপর এই পক্ষপাতিত্বের অপবাদ সহ্য করেননি! এবং তৎক্ষণাৎ আয়াত নাযিল করে উম্মতকে জানিয়ে দিলেন যে, নবী ﷺ -এর ফয়সালাকে তা নিজের মনঃপূত হোক কিংবা না হোক মনেপ্রাণে গ্রহণ ও মান্য করা ছাড়া আল্লাহ্র নিকট তোমাদের ঈমানও সঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

---

১. প্রকাশ থাকে যে, الاقرب فالاقرب (যে সবচেয়ে নিকটবর্তী সে সবচেয়ে প্রথম হক্দার) এই নীতি অনুযায়ী হযরত যুবায়র (রা)-এর পানি সেচ অধিকার ছিল আনসারীর পূর্বে। তাছাড়া ফসলের ক্ষেত বা বাগানের আল পর্যন্ত পানি বেঁধে রাখা প্রত্যেক ক্ষেত বা বাগান মালিকের অধিকার। তাই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর প্রথম উক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসার ভিত্তিতে ছিল এবং দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল আইনের বিচার।

৬৯. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাহারিবে খাসফা নামক স্থানে (বানূ গাতফানের সাথে) যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অবস্থান করছিলেন। (যুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি কিন্তু) কাফিররা মুসলমানদের অসতর্কতার সুযোগ খুঁজছিল। জনৈক কাফির চুপিসারে এসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর শিয়রে দাঁড়ালো (তিনি তখন একটি গাছের নিচে আরাম করছিলেন) এবং বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে ? তিনি বললেন, আল্লাহ্! তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তলোয়ারটি তুলে নিলেন এবং বললেন, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে ? সে বললো, আপনি ক্ষমতা পেয়ে উত্তম গ্রেফতারকারী হন। সুতরাং আপনি আমার জীবন রক্ষা করে উত্তম অনুগ্রহকারী হওয়ার প্রমাণ দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছো যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই আর আমি হচ্ছি আল্লাহ্র রাসূল ? সে বললো, না অবশ্য আমি (অঙ্গীকার করছি যে) আপনার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করবো না। (কোনো যুদ্ধে) আপনার সাথেও যোগদান করবো না এবং আপনার প্রতিপক্ষের সাথেও যোগদান করবো না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন। সে তার সঙ্গীদের কাছে এলো। এবং বললো, আমি সর্বোত্তম ব্যক্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে তোমাদের কাছে এসেছি।

ফায়দা ঃ মাহারিবে খাসফা যুদ্ধের প্রসিদ্ধ নাম 'যাতুর্ রিকা'। এ যুদ্ধকে 'যাতুর্ রিকা' বলার কারণ, প্রস্তর কংকরময় ভূমিতে সফর করার দরুন মুসলমানদের পা যখম হয়ে গিয়েছিল এবং তাঁরা পায়ে পট্টি বেঁধে রেখেছিলেন। কোনো কোনো চরিতকার বলেন, 'যাতুর রিকা' হচ্ছে একটি লাল ও সাদা-কালো প্রস্তরময় পাহাড়ের নাম এবং এই যুদ্ধের নামকরণও পাহাড় করা হয়েছে। বানূ গাতফানের বিপুল সংখ্যক লোক মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়েছিল। কিন্তু তাদের হামলা করার সাহস হয়নি, তাই যুদ্ধ হয়নি। এ ঘটনা ঘটেছিল চতুর্থ হিজরীর মুহররম কিংবা জমাদিউল আউয়াল মাসে।

এ ঘটনাও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণ ক্ষমা ও দয়ার অনুপম দৃষ্টান্ত। জাগতিক কর্মকৌশল ও ফন্দি-ফিকিরের দিকে দৃষ্টিপাতকারীদের মতে এ হামলা ও শত্রুকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দৃষ্টি ছিল সমস্ত কারণের আদি কারণ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি। এজন্য তিনি ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর এই ক্ষমা ও দয়ার কি ফল হয়েছিল ? স্বগোত্রীয়দের কাছে গিয়ে তাঁর সম্পর্কে সে যে সাক্ষ্য দিয়েছিল তাতেই তা প্রতিভাত হয়।

٧٠. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِسَعْدٍ اَلَمْ تَسْمَعْ مَاقَالَ اَبُوْ الْحُبَابُ؟ يُرِيْدُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ اُبَىٍّ، قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ اُعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَعَفَا عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ يَعْفُوْنَ عَنْهُ اَهْلَ الْكِتَابَيْنِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

৭৩. **হযরত উসামা ইব্ন** যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, একবার **রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাধার উপর** সাওয়ার ছিলেন। [হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর শুশ্রূষার **জন্য তিনি গমন করছিলেন**।] তিনি সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে (তাঁর গৃহে পৌঁছে) বললেন, **তুমি** কি শোননি আবূ হুবাব অর্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই (মুনাফিক নেতা) কি বলেছে ? **তিনি** তার কথার পুনরুক্তি করে বললেন, সে আমাকে এরূপ এরূপ বলেছে। তখন সা'দ ইব্ন **উবাদা** (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন এবং উপেক্ষা করুন। **তিনি তাকে** ক্ষমা করে দিলেন। (বর্ণনাকারী বলেন) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবা কিরাম **সাধারণত** আহলি কিতাব ও মুশরিকদের এরূপ কটুবাক্য ও ক্লেশদানকেও অনুরূপ ক্ষমা করে **দিতেন**। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ (প্রশংসারূপে) এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ -

তোমরা ক্ষমা করো ও অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আল্লাহ্ (যুদ্ধ ও প্রতিশোধের) কোনো নির্দেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।

ফায়দা ঃ এখানেও যেহেতু গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ক্ষমা ও দয়া গুণের বর্ণনা করা, সেহেতু পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেননি। বরং ঐ সংক্রান্ত অংশটুকু বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। পূরো হাদীসটি সহীহ্ বুখারীতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হযরত সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-এর শুশ্রূষার জন্য গাধার উপর আরোহণ করে রওয়ানা করেন। তাঁর পিছনে তিনি উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বসিয়ে নেন। তিনি একটি জনসমাবেশের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে মুনাফিক-নেতা আবদুল্লাহ্ ইবন উবাই ইবন সালূলও উপস্থিত ছিল। সমাবেশে উপস্থিতদের মধ্যে মুসলমান, ইয়াহূদী, মুশরিক সবাই ছিলো। নবী ﷺ-এর বাহনের চলার কারণে যখন ধুলাবালি উড়ে গিয়ে সমাবেশে পড়লো, তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই তার নাকে চাদর গুঁজে দিলো এবং নবী ﷺ-কে বললো, দেখো, আমাদের উপর ধুলি উড়িয়ো না। তোমার গাধার ধুলোবালি আমার দেমাগ খারাপ করে দিয়েছে। নবী ﷺ তার কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং সমাবেশে উপস্থিত জনতাকে সালাম করে বাহন থেকে নেমে অমুসলিমদের ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেন। কিন্তু সে (আবদুল্লাহ্) তাঁকে সম্বোধন করে বললো, দেখো, এটা ঠিক না, আমাদের সভায় এসে আমাদের বিব্রত করবে না। তুমি তোমার বাহনের উপর উঠো এবং যে তোমার কাছে যাবে তাকে তোমার দীনের দাওয়াত দাও। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) যিনি ঐ সভায় উপবিষ্ট ছিলেন—নবী ﷺ -কে বললেন, আপনি অবশ্যই আমাদের সভা-সমাবেশে

াগমন করবেন। আমরা আপনার আহ্বান ও বক্তব্য পছন্দ করি। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি তই বেড়ে গেলো যে, মুসলিম, ইয়াহূদী ও মুশরিকদের পরস্পরের মধ্যে বচসা, গালিগালাজ ও হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। এমনকি যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। কিন্তু নবী ﷺ তিকষ্টে তাদেরকে থামিয়ে দেন এবং ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে যায়। এরপর তিনি তাঁর াহনের উপর আরোহণ করে সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর বাড়িতে গমন করেন এবং তাঁর াথে সাক্ষাৎকালে তাঁকে বলেন ঃ হে সা'দ্! তুমি কি শোননি যে, একটু আগে আবূ হুবাব র্থাৎ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল কি বলেছে ? সাদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! াপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার কথার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

এটি ইসলামের প্রথম দিকের ঘটনা। তখনো জিহাদ ও যুদ্ধের হুকুম নাযিল হয়নি। তখন সলিমদের প্রতি নির্দেশ ছিল ঐসব কাফির ও ইয়াহূদীদের নিকট থেকে কোনোরূপ তিশোধ না নেয়ার এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও যুদ্ধ করার নির্দেশ নাযিল না হওয়া পর্যন্ত মা ও উপেক্ষা করে চলার। কিন্তু নবী ﷺ এত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, জহাদ ও যুদ্ধের হুকুম নাযিল হওয়ার পরও তিনি মদীনার ঐ সব মুনাফিককে তাদের নাফিকী ও ইসলামের বিরোধিতার জন্য শাস্তি দেননি এবং তাদের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ রেননি। এই ক্ষমা ও দয়ার ফলেই ক্রমে ক্রমে সমস্ত মুনাফিক অবশেষে একনিষ্ঠ মুসলমান য়ে যায়। কেবল কয়েকজন ছাড়া, যারা তাদের মুনাফিক থাকা অবস্থায়ই বিভীষিকাময় ত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে।

٧١. عَنِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِيْ عُمَارَةَ بْنُ خُزَيْمَةَ اَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ (وَهُوَ مِنْ اَصْحَا
النَّبِيِّ ﷺ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِبْتَاعَ فَرَسًا مِنْ اَعْرَابِيٍّ فَاسْتَتْبَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ
لِيُعْطِيَهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَاَسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَشْيَ وَاَبْطَاَ الاَعْرَابِيُّ فَطَفِقَ رِجَ
يُعَرِضُوْنَ لِلاَعْرَابِيِّ يُسَاوِمُوْنَهُ بِالْفَرَسِ لاَيَشْعُرُوْنَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِبْتَاعَهُ حَتَّى
بَعْضُهُمْ لِلاَعْرَابِيِّ فِى السَّوْمِ عَلَى الثَّمَنِ الَّذِى اِبْتَاعَهُ النَّبِى ﷺ فَنَادَى الأَعْرَا
فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ مُمْتَاعًا هٰذَا الْفَرَسَ فَابْتَعْهُ وَاِلاَّ بِعْتُهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ حِيْنَ سَ
نِدَاءَ الأَعْرَابِيِّ اَوَلَيْسَ قَدْ ابْتَعْتُهُ فَقَالَ لاَ وَاللّٰهِ مَا بِعْتَكَ فَقَالَ بَلَى قَد ابْتَعْ
مِنْكَ ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوْذُوْنَ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَالاَعْرَابِىُّ يَقُوْلُ هَلُمَّ شَهِيْدًا فَلْيَشْ
اَنِّى قَدْ بَايَعْتُكَ ، فَمَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ لِلاَعْرَابِيِّ وَيْلَكَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
يَقُوْلُ الاَّحَقًّا -

৭১. যুহরী (র) বলেন, আমার নিকট উমারা ইবন খুযায়মা (র) বর্ণনা করেন যে, আমার নিকট আমার চাচা (যিনি নবী ﷺ -এর একজন সাহাবী ছিলেন) বর্ণনা করেন। নবী ﷺ একবার কোনো এক বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন এবং মূল্য পরিশোধ করার জন্য তাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। নবী ﷺ জোর কদমে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আর ঐ বেদুঈন চলছিলো ঢিমে-তেতালা গতিতে। (ফলে ঐ বেদুঈন নবী ﷺ এর অনেক পেছনে পড়ে গেলো) এবং লোকেরা তাকে রাস্তায় থামিয়ে ঘোড়াটি ক্রয় করার কথাবার্তা শুরু করলো। তারা জানতো না যে, এ ঘোড়াটি নবী ﷺ খরিদ করেছেন। সুতরাং কেউ কেউ ঐ ঘোড়াটির মূল্য নবী ﷺ-এর স্থিরীকৃত মূল্যের চেয়েও অধিক হাঁকালো। এই অবস্থা দেখে বেদুঈনের মনে গোলমাল দেখা দিলো। সে নবী ﷺ-কে ডেকে বললো, আপনি যদি এ ঘোড়াটি ক্রয় করতে চান, তবে ক্রয় করুন নতুবা আমি অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দেবো। নবী ﷺ বেদুঈনের কথা শুনে বললেন, আরে আমি কি তোমার কাছ থেকে ঘোড়াটি ক্রয় করিনি ? সে বললো, না। আল্লাহ্র কসম! আমি ঘোড়াটি আপনার কাছে বিক্রি করিনি। নবী ﷺ বললেন, তুমি এ কি বলছো! আমি তো তোমার নিকট থেকে ঘোড়াটি ক্রয় করেছি। নবী ﷺ ও বেদুঈনের আশপাশে লোকজন জড়ো হতে শুরু করলো। তখন বেদুঈন বলতে লাগলো, (আচ্ছা) আপনি যদি সত্যবাদী হন, তবে আমি যে আপনার কাছে ঘোড়াটি বিক্রি করেছি এ ব্যাপারে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করুন। কিন্তু সেখানে যে মুসলিমই আসতো, সেই ঐ বেদুঈনকে বলতো যে, আরে হতভাগা! নবী ﷺ তো সত্য ছাড়া কিছু বলতেই পারেন না।

ফায়দা ঃ দেখুন, এ ঘটনায় হতভাগা বেদুঈন তার গোয়ার্তুমির দরুন নবী ﷺ-এর সততা ও সাধুতার উপর কত বড় আক্রমণ করলো। একজন নিরীহ সাধারণ মানুষও এরূপ ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারে না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কৃপা ও করুণার মূর্ত প্রতীকরূপে বেদুঈনের কথা শ্রবণ করেন। তাকে কিছুই বললেন না। আল্লাহ্ সত্যই বলেছেন "بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ" (মু'মিনদের প্রতি তিনি বড়ই দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। (সূরা তাওবা ঃ ২৮)

٧٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتِ ابْتَاعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَزُوْرًا مِنْ اَعْرَابِىٍّ بِوَسَقٍ مِّنْ تَمَرِ الذَّخِيْرَةِ ـ فَجَاءَ بِهِ اِلَى مَنْزِلِهِ فَالْتَمَسَ التَّمَرُ فَلَمْ يَجِدْهُ فِى الْبَيْتِ قَالَ فَخَرَجَ اِلَى الاَعْرَابِىِّ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللّٰهِ اَنَّا ابْتَعْنَا مِنْكَ جَزُوْرَكَ هٰذَا بِوَسَقٍ مِنْ تَمَرِ الذَّخِيْرَةِ نَحْنُ نَرَى اَنَّهُ عِنْدَنَا فَلَمْ نَجِدْهُ، فَقَالَ الاَعْرَابِىُّ وَاغْدَرَاهُ وَاغْدَرَاهُ فَوَكَزَهُ النَّاسُ وَقَالُوْا لِرَسُوْلِ ﷺ تَقُوْلُ هٰذَا ؟ فَقَالَ دَعُوْهُ ـ

৭২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক বেদুঈন থেকে এক 'ওয়াসাক' মওজুদ কৃত খেজুরের বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করলেন (তাঁর ধারণা ছিল গৃহে খেজুর মওজুদ আছে) তাই তিনি তাকে গৃহে নিয়ে এলেন এবং খেজুর তালাশ করলেন, কিন্তু খেজুর পাওয়া গেলো না। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বেদুঈনের কাছে গেলেন এবং তাকে বললেন, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমি তোমার নিকট থেকে এক 'ওয়াসাক' খেজুরের বিনিময়ে তোমার এই উটটি ক্রয় করেছিলাম। আমার ধারণা ছিল, খেজুর আমার কাছে মওজুদ আছে, কিন্তু এখন দেখলাম নেই। এ কথা শুনে বেদুঈন বললো, হায় ধোঁকাবাজি! হায় ধোঁকাবাজি!! তখন লোকেরা তাকে ঘুষি মারা শুরু করলো এবং বললো, হতভাগা! রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ কথা বলছো! তখন তিনি বললেন, তোমরা তাকে ছেড়ে দাও।

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোনো নিয়ম বিরোধী কথা বলেননি। প্রায়ই এরূপ ঘটনা ঘটে থাকে। এটাকে প্রতারণা ও অসাধুতা বলা যায় না। কেননা, তখনো বিক্রীত দ্রব্য বিক্রেতার নিকটই ছিল। কিন্তু ঐ বেদুঈন ব্যক্তি তার গোয়ার্তুমি ও মূর্খতার দরুন নবী ﷺ -কে অসাধু ও প্রতারক বলে তাঁকে চরমভাবে অপমানিত করেছে। লক্ষণীয় যে, অজ্ঞতার দরুন নবী ﷺ-কে গালমন্দ করা ধর্মত্যাগ ও হত্যাযোগ্য অপরাধ না হলেও কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু এ বিষয়টি ছিল স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ ﷺএর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পর্কিত, তাই তিনি তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী ঐ বেয়াদব ও দুষ্ট লোকটিকে শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে দেন।

٧٣. عَنْ مَهْدِيِّ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ اَبَا الطُّفَيْلِ جِيْئَ بِهِ فِيْ كَسَاءٍ وَأُلْقِيَ فِيْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقِيْلَ هٰذَا قَدْ رَاى النَّبِيَّ ﷺ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاتَّبَعْتُهُ حَتّٰى اَتٰى دَارًا فَدَفَعَ بَابَهَا فَدَخَلَ فَاِذَا لَيْسَ فِيْ الدَّارِ اِلاَّ قَطِيْفَةٌ فَنَفَضَهَا فَاِذَا رَجُلٌ اَعْوَرُ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هٰذَا ـ

৭৩. মাহ্দী ইব্ন ইমরান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখলাম, হযরত আবূ তোফায়ল (রা)-কে মসজিদে হারামে নিয়ে এসে শায়িত করা হয়েছে। তিনি তখন চাদরে আবৃত ছিলেন। কেউ বলেন, ইনি নবী ﷺ -কে দর্শন করেছেন। অর্থাৎ আবূ তোফায়ল (রা) নবী ﷺ-এর সাহাবী ছিলেন। মাহ্দী ইব্ন ইমরান (রা) বলেন, আমি হযরত আবূ তোফায়ল (রা)-এর কাছ থেকে হাদীস শোনার জন্য তাঁর নিকট গেলাম। তিনি বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে কোথাও যেতে দেখলাম। আমিও তাঁর পেছনে পেছনে রওয়ানা হলাম। তিনি একটি গৃহে উপস্থিত হলেন এবং দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। গৃহে একটি

কম্বল পড়ে ছিলো। কম্বলটি ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। তিনি ঐ কম্বলটি ধরে হেঁচকা টান মারলেন। তার মধ্য থেকে একটি কানা (একচক্ষু বিশিষ্ট) লোক বেরিয়ে এলো। সে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল ? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, হে লোক সকল! তোমরা তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র পানাহ চাও।

ফায়দা ঃ এই ব্যক্তি ছিল ইব্ন সায়্যাদ। সহীহ্ বুখারী ও হাদীসের অন্যান্য কিতাবে তার কাহিনী সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। ইব্ন সায়্যাদের ডাকনাম 'সাফ' এবং এক বর্ণনা মতে আবদুল্লাহ্। এ ছিল মদীনার এক ইয়াহূদী। এর সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ তাকে দাজ্জালও বলেন। বর্ণনাসমূহ থেকে জানা যায়, সে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল না হলেও ফিত্না সৃষ্টিতে কমও ছিল না। বাল্যকাল থেকেই গণক ও জাদুকরের মতো কথা বলতো। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলিমদের পরীক্ষার জন্য তাকে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথমে সে নিজকে নবী বলে দাবি করতো। কিন্তু শেষে ইসলাম গ্রহণ করে। মুসলমানদের সাথে হজ্জ ও জিহাদ প্রভৃতিতেও শরীক হয়। কিন্তু তারপরও সে এই ধরনের উচ্ছৃংখল কথাবার্তা বলতো। গ্রন্থকারের এই হাদীসটিও এ স্থলে বর্ণনা করার কারণ হচ্ছে, এ ধরনের উচ্ছৃংখলতা ও ধৃষ্টতা ছাড়াও সে নবী ﷺ -এর সামনে নিজেকে নবী বলে দাবি করে এবং স্বয়ং নবী ﷺ-কেই তার উপর ঈমান আনার জন্য আহ্বান করে। নবী ﷺ তাকে হত্যা করেননি এবং কোনো শাস্তিও দেননি। কারণ সে ছিল তখন বালক। তাছাড়া মদীনার ইয়াহূদীর সাথে তখন নবী ﷺ সন্ধিবদ্ধও ছিলেন। অবশ্য তিনি লোকদেরকে তার অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সাবধান করে দেন।

٧٤. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ يَهُوْدِيَّةً اَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ بِشَاةٍ مُسْمُوْمَةٍ لِيَاكُلَ مِنْهَا فَجِيَئَ بِهَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَتْ اَرَدْتُ قَتْلَكَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَالُوْا اَفَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ لَا ـ

৭৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ইয়াহূদী নারী নবী ﷺ -এর নিকট একটি ভুনা বক্রীর বাচ্চা আহারের জন্য নিয়ে আসে। তাতে সে বিষ মিশ্রিত করেছিল। (এরপর নবী ﷺ যখন ঐ গোশ্ত বিষ মিশ্রিত হওয়ার সংবাদ মহান আল্লাহ্র তরফ থেকে জানতে পারলেন, তখন এ স্ত্রীলোকটিকে ডাকালেন) লোকেরা নবী ﷺ -এর নিকট তাকে উপস্থিত করলো। তিনি ঐ বিষ মিশ্রিত গোশ্ত সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ কাণ্ড কেন করেছো ? ঐ (উদ্ধত) নারী বললো, আমি আপনাকে হত্যা করতে চেয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ মহান আল্লাহ্ তোমাকে এ কাজে সফল হতে দেবেন না (অর্থাৎ তুমি নবীকে হত্যা করতে পারবে না)। কিংবা বলেছেন, কোনো মুসলিমের বিরুদ্ধে আল্লাহ

তা'আলা তোমাকে এ ব্যাপারে সফল করবেন না। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি তাকে হত্যা করবো না ? তিনি বললেন, না।

ফায়দা ঃ এখানেও হাদীসের শুধু সেই অংশই বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে নবী ﷺ-এর ক্ষমা ও দয়া গুণের আলোচনা রয়েছে। অন্যান্য রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, খায়বারের অধিবাসী এক ইয়াহূদী নারী বিষ মিশ্রিত করে একটি ভুনা বক্‌রী নবী ﷺ-এর নিকট পেশ করলো। তিনি ঐ বক্‌রীর গোশ্‌তের মধ্য থেকে হাতার একটি অংশ ভক্ষণ করলেন। তাঁর সাথে আরো কিছু সাহাবীও খাচ্ছিলেন। তাঁরাও এই বিষ মিশ্রিত বক্‌রীর গোশ্‌ত খাওয়া শুরু করলেন। কিন্তু লোক্‌মা মুখে দিতেই নবী ﷺ সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা খাওয়া বন্ধ করো (গোশ্‌তে বিষ মিশ্রিত করা হয়েছে) এবং তখনই তিনি ঐ ইয়াহূদী নারীকে ডেকে পাঠালেন। (আসার পর) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই বক্‌রীর গোশ্‌তে বিষ মিশিয়েছো ? সে বললো, আপনাকে কে বলেছে ? তিনি বললেন, এই টুকরোটি আমাকে বলে দিয়েছে যা আমার হাতে রয়েছে। তখন ঐ ইয়াহূদী নারী স্বীকার করলো এবং বললো, আমি আপনাকে পরীক্ষা করার জন্য বিষ মিশিয়েছি। আপনি যদি সত্য নবী হন তবে এই বিষে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা, আপনি তা অবগত হতে পারবেন। আর আপনি যদি সত্য নবী না হন, তবে ধ্বংস হয়ে যাবেন এবং আমরা আপনার থেকে মুক্তি পাবো। নবী ﷺ ঐ নারীকে তার প্রাণনাশের চেষ্টা সত্ত্বেও কোনো শাস্তি দেননি। বরং ক্ষমা করে দেন। নবী ﷺ-এর সাথে যে সাহাবী ঐ মাংস ভক্ষণ করেছিলেন, তিনি ঐ বিষের প্রতিক্রিয়ায় ইন্‌তিকাল করেন।

অন্যান্য রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ তাঁর নিজের পক্ষ থেকে ঐ নারীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। অবশ্য যখন ঐ বিষে হযরত বিশ্‌র ইব্‌ন বারাআ (রা) ইন্‌তিকাল করেন, তখন তাঁর কিসাসস্বরূপ তিনি ঐ নারীকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ হাদীস থেকে অনুমিত হয়, তিনি তাঁর প্রাণের শত্রুদের সাথে কি পরিমাণ সদয় আচরণ করতেন। তিনি ইচ্ছাকৃত হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া ছাড়াও তাদের কল্যাণ কামনাও করতেন। যেমন বিভিন্ন ঘটনা ও রিওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, তায়েফে শত্রুরা কি পরিমাণ তাঁকে নির্যাতন করে। দুষ্ট ও দুরন্ত বালকদেরকে লেলিয়ে দিয়ে প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে তাঁকে রক্তাক্ত করা হয়েছে। নবীজীর মাথা গোঁজার কোথাও আশ্রয় ছিল না। তায়েফের নেতারা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিলো। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে ঐ সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আ) পাহাড়ের অধিকর্তা ফিরিশ্‌তাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন এবং বলেন যে, আপনি হুকুম দিলে এখনই এই দুই পাহাড়ের মাঝে ফেলে তাদেরকে পিষে মারা হবে। কিন্তু তাঁর পবিত্র মুখ থেকে এই দু'আই নিঃসৃত হলো اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَايَعْلَمُوْنَ (হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে হিদায়াত করুন। কেননা, এরা জানে না (যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল)"।

٧٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ قَالَ فَاشْتَكٰى لِذٰلِكَ اَيَّامًا، قَالَ فَاَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُوْدِ سَحَرَكَ فَعَقَدَلَكَ عُقَدًا فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا، فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً وَجَدَ لِذٰلِكَ خِفَّةً، فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلْيَهُوْدِىِّ وَلَارَاهُ فِىْ وَجْهِهِ قَطُّ۔

৭৫. হযরত যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার এক ইয়াহূদী নবী ﷺ-কে জাদু করলেন। ফলে তিনি কিছুদিন অসুস্থ বোধ করছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর একদিন তাঁর নিকট হযরত জিব্‌রাঈল (আ) আগমন করে তাঁকে অবগত করলেন যে, জনৈক ইয়াহূদী আপনাকে জাদু করেছে এবং (কালো) সূতার মধ্যে গিরা লাগিয়েছে। নবী ﷺ তখন হযরত আলী (রা)-কে সেখানে পাঠালেন। হযরত আলী (রা) সেই তাগা সেখান থেকে তুলে আনেন। নবী ﷺ ঐ গিরাগুলো খুলতে শুরু করেন। এক একটি গিরা খোলার সাথে সাথে তাঁর কষ্টের উপশম অনুভূত হতো। সবগুলো গিরা খোলার সাথে সাথে তিনি এমনভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন, যেমন কোনো বাঁধা ব্যক্তি রশি থেকে মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনো ঐ জাদুর আলোচনা ঐ ইয়াহূদীর সাথে করেননি এবং কখনো তিনি প্রতিশোধের দৃষ্টিতে তার প্রতি তাকাননি।

ফায়দা ঃ রিওয়ায়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ ইয়াহূদীর নাম ছিল লাবীদ ইব্‌ন আসাম। সে ছিলো বানূ যুরায়ক গোত্রের লোক। সে নবী ﷺ-কে মেরে ফেলার জন্য (নাউযুবিল্লাহ্‌) তাঁর উপর প্রচণ্ড রকমের জাদু করেছিলো। মুশরিক ও ইয়াহূদীরা ছিলো তাঁর প্রাণের শত্রু। তাঁকে যে কোনোভাবে এই পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য ছিলো তারা সদা তৎপর। গোপন স্থানে লুকিয়ে থেকে আঁধার রাতে তাঁর উপর হামলা করেছে, বিষ প্রয়োগ করেছে এবং যখন তাতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাঁকে জাদু দ্বারা মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর নবীর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, মানুষের হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করবেন। "وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" (আল্লাহ্‌ আপনাকে লোকের হাত থেকে বাঁচাবেন)। তাই আল্লাহ্‌ তাঁর নবীকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। কোথাও মুশরিকদের উপর প্রভাব ফেলে তাদের থেকে রক্ষা করেছেন, কোথাও ওহীর মাধ্যমে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেছেন এবং কোথাও ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে তাঁকে সাহায্য করেছেন। নবী ﷺ-এর নিকট সব উপায় বিদ্যমান ছিলো। যেভাবে ইচ্ছা ঐ ইয়াহূদী ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা কখনো করেননি। প্রতিবার কাফিরদের কষ্ট দানকে ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের প্রতি দয়া করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, তারা হিদায়াত কবুল না করলেও তাদের সন্তান-সন্ততি অবশ্যই সুপথে আসবে। তিনি প্রতিনিয়ত তাঁর জাতির হিদায়াতের জন্য দু'আ করতেন। বিশেষ করে স্বীয় ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ নিতেন না। তাই ইয়াহূদী যখন তাঁর

উপর জাদু করলো তিনি তার প্রতি একটু অসন্তোষও প্রকাশ করেননি, তাকে শাস্তি দেননি। এমনকি তার সাথে এ ব্যাপারে আলোচনাও করেননি। অপর এক রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, এ ব্যাপারে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বলেছিলেন যে, আপনি ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রচারণা কেন চালাচ্ছেন না। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ্ আমাকে আরোগ্য দান করেছেন। তাই আমি তার দুর্নাম রটানো পছন্দ করলাম না। এটাই ছিলো তাঁর উঁচুমন ও মহান আল্লাহ্‌র বাণী "اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ" (নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত)-এর বাস্তব নমুনা।

٧٣. عَنِ ابْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ اَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى صَفْوَانَ بْنِ اُمَيَّةَ بْنَ خَلْفٍ وَاَبِىْ سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ وَاِلَى الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ ابْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ قَدْ اَمْكَنَنِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ بِمَا صَنَعُوْا حَتَّى قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَا قَالَ يُوْسُفُ لِاِخْوَتِهِ (لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ) فَانْفَضَحْتُ حَيَاءً مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৭৬. হযরত (উমর) ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাওয়ান ইব্‌ন উমায়্যা ইবন খাল্‌ফ, আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব ও হারিস ইব্‌ন হিশামকে ডেকে পাঠালেন। হযরত উমর (রা) বলেন, আমি আপন মনে বললাম, আজ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তিদান ও প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দান করবেন। কেননা, স্পষ্টতই এরা যুদ্ধবন্দী। নবী ﷺ তাদেরকে হত্যা করাবেন এবং আমার দ্বারাই এ কাজ করাবেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সে সময় বললেন, এখন আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ হযরত ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের মতো। এজন্য আমি তাই বলবো, যা হযরত ইউসুফ (আ) বলেছিলেন ঃ "لَاتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ"- কাজেই তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ক্ষমা করুন। হযরত উমর (রা) বলেন, (তাঁর এই উদারতা দেখে) আমি লজ্জায় নতমুখ হয়ে গেলাম। (আমি যেখানে প্রতিশোধ নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, আনন্দ উল্লাস করছি, তিনি সেখানে আজীবনের দুশমনদেরকে ক্ষমার সুসংবাদ শোনাচ্ছেন।)

٧٧. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ كَاتِبِ عَلِىٍّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرُ وَالْمِقْدَادِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْطَلِقُوْا حَتَّى تَاْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ، فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً مَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا حَتَّى اَتَيْنَا رَوْضَةَ خَاخٍ فَقُلْنَا اَخْرِجِى الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَامَعِىَ مِنْ

كِتَابٍ،قُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَنُقَلِّبَنَّ الثِّيَابَ فَاَخْرَجُوْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَاَتَيْنَا بِهِ النَّبِىَّ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِىْ بَلْتَعَةَ اِلَى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يُخْبِرُهُمْ اَمْرًا مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَاحَاطِبُ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَاتَعْجَلْ عَلَىَّ اِنِّىْ كُنْتُ امْرًا مُلْصِقًا فِىْ قَوْمِىْ، وَكَانَ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتُ بِمَكَّةَ يَحْمُوْنَ اَهْلِيْهِمْ فَاَحْبَبْتُ اِذَا فَاتَنِىْ ذٰلِكَ مِنْهُمْ مِنَ النَّسَبِ اَنْ اَتَّخِذَ فِيْهِمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَاقَرَابَتِى، وَلَمْ اَفْعَلْ ذٰلِكَ كُفْرًا وَلَاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الاِسْلَامِ وَلَاَ ارْتِدَادًا عَنْ دِيْنِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ اَضْرِبُ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَطَّلَعَ اِلَى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ -

৭৭. হযরত আলী (রা)-এর কাতিব (লিপিকার) উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন রাফি হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যুবায়র, মিকদাদ (রা) ও আমাকে (এক মহিলা গুপ্তচরকে গ্রেফতার করার জন্য) প্রেরণ করেন এবং বলেন ঃ তোমরা চলে যাও। যখন 'রাওযা খাখ' নামক স্থানে পৌছবে, সেখানে একটি স্ত্রীলোকের সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবে। তার নিকট একটি চিঠি আছে। চিঠিটা তার নিকট থেকে নিয়ে আসবে। আলী (রা) বলেন, আমরা তখনই রওয়ানা দিলাম। যখন আমরা 'রাওযা খাখ' পৌছলাম। সেখানেই ঐ স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, 'চিঠি বের করো'। সে বললো, 'আমার কাছে কোন চিঠি নেই।' আমরা তাকে (ধমক দিয়ে) বললাম, চিঠি বের করো নতুবা আমরা তোমার দেহ তল্লাশি করবো। [হযরত আলী (রা) বলেন], তখন সে চিঠি তার চুলের খোঁপার মধ্য থেকে বের করলো। আমরা সে চিঠি নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলাম। (তিনি ঐ চিঠি খুলে দেখলেন), তাতে লেখা আছে ঃ "হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আর পক্ষ থেকে (মক্কার) মুশরিকদের প্রতি" চিঠিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোনো যুদ্ধের গোপন খবর দেয়া হয়েছিলো। তিনি হাতিবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে হাতিব! এ কী ব্যাপার ? হাতিব (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে মেহেরবানী করে তাড়াহুড়ো করবেন না। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আমি বংশগতভাবে কুরায়শী নই। বরং আমার গোত্র কুরায়শের মিত্র। আর এই সুবাদেই কুরায়শের সাথে আমার সামান্যতম সম্পর্ক বিদ্যমান। তাদের সাথে আমার কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক আদৌ নেই। অথচ আপনার সাথে যেসব মুহাজির আছেন, মক্কায় তাদের সবার আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। (তাদের আত্মীয়-স্বজন) তাদের ধন-সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ করছেন। তাই আমি যখন দেখলাম, মক্কায় আমার এমন কোনো আত্মীয়-স্বজন নেই, যারা আমার

সম্পদ সন্তান রক্ষণাবেক্ষণ করবে, তখন আমি মক্কার মুশরিকদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ করা শ্রেয় মনে করলাম, যাতে তারা আমার সম্পদ-সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং তাদের কোনো ক্ষতি না করে। এটা আমি কুফর বা ইসলাম গ্রহণের পর কুফরীর প্রতি সন্তোষ প্রকাশ এবং আপন দীন ত্যাগ করার ভিত্তিতে আদৌ করিনি। (আমি এখনো ঠিক পূর্বের মতো একনিষ্ঠ মুসলিম রয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সকল সাহাবাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হাতিব তোমাদের কাছে সত্য কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। (সে অজ্ঞতাবশত এই ভুল করেছে) তখন হযরত উমর (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি তার শিরশ্ছেদ করবো না ? তিনি বললেন, না, এরূপ করবে না। এ ব্যক্তি তো বদরের যুদ্ধে শরীক ছিল। মহান আল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কত মেহেরবান তা কি তুমি জানো ? আল্লাহ্ বলেছেন ঃ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ। তোমরা যা ইচ্ছা করো। আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

ফায়দা ঃ এটি একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা, হাতিব ইব্‌ন আবূ বালতা'আ (রা) সেই সকল মুহাজিরের অন্যতম; যাঁরা ইসলাম গ্রহণের দরুন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন। নিজেদের সকল সহায়-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ইসলামের জন্য মক্কায় ছেড়ে এসেছেন। হাতিব (রা) বদরের সেই সব সৌভাগ্যবান মুহাজির সাহাবীগণের অন্যতম, যারা মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কেই মহান আল্লাহ্ এই আয়াতসমূহ নাযিল করেন ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلَ، اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَاءً وَّيَبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْءِ وَوَدُّوْا لَوْتَكْفُرُوْنَ، لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছো ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে। রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্কে বিশ্বাস করো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাকো, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপন বন্ধুত্ব করছো ? তোমরা যা গোপন করো এবং তোমরা যা প্রকাশ করো, তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এটা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে। তোমাদেরকে কাবু

করতে পারলে তারা হবে তোমাদের শত্রু এবং হাত ও জিহ্বা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, তোমরাও কুফরী করো। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। তোমরা যা কর, তিনি তা দেখেন। (সূরা মুমতাহিনা ঃ ১–৩)

হযরত হাতিব (রা) ইয়ামনের অধিবাসী ছিলেন। পূর্ণ নাম হাতিব ইব্ন আবূ বালতা'আ ইব্ন আম্র ইব্ন উমাইর ইব্ন সালামা ইব্ন সা'ব ইব্ন সাহ্ল লাখামী। তিনি কুরায়শের বনূ আসাদ ইব্ন আবদুল উয্যার মিত্র ছিলেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত যুবার (রা) এর মিত্র ছিলেন। তিনি যে বদরী সাহাবী ছিলেন সে ব্যাপারে সবাই একমত। বদরের যুদ্ধ ছাড়াও তিনি হুদায়বিয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে ৩০ হিজরীতে ৬৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

তিনি ইয়ামন থেকে মক্কায় এসে বসবাস করছিলেন। মক্কাবাসীদের সাথে তার কোনো আত্মীয়তা ছিল না। নবী ﷺ-এর হিজরতের পর তিনি তাঁর পুত্রগণ ও ভাইদের ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন। সুতরাং মক্কার মুশরিকদের তরফ থেকে তাঁর সম্পদ-সন্তানের ক্ষতির আশংকা সততই ছিল। সেই আশংকায় তিনি (অজ্ঞতাবশত) এই কৌশল অবলম্বন করলেন যে, মক্কার মুশরিকদের প্রতি কিছু অনুগ্রহ দেখাবেন, যার দরুন তারা তাঁর সম্পদ–সন্তানের কোনো ক্ষতি করবে না। তাই তিনি মক্কার মুশরিকদের কাছে এই মর্মে এক চিঠি লিখলেন যে, "রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অমুক দিন তোমাদের উপর আক্রমণ করবেন।" মক্কার মুশরিকদের কাছে গোপনে এই চিঠিটা পৌছাবার জন্য তিনি একটি স্ত্রীলোককে প্রেরণ করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর নবীকে এই রহস্য জানিয়ে দিলেন এবং তিনি ঐ চিঠি উদ্ধার করলেন। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তাঁর সত্যতা স্বীকার করলেন এবং নবী ﷺ-এর কাছে সব কথা খুলে বললেন। তিনি বললেন, আমি এ সব এই বিশ্বাস রেখেই করেছি যে, আল্লাহ্ আপনাকে এই যুদ্ধে অবশ্যই জয়লাভ করাবেন। আমার চিঠিতে ইসলামের এতটুকু ক্ষতি হবে না। কিন্তু আমার পরিবার-পরিজন ও মাল-আসবাব এই সামান্য উপকার দ্বারা রক্ষা পাবে। নবী ﷺ ও শুধু তাঁর সত্যবাদিতার দরুন তাঁর ওযর কবুল করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবাগণকেও জানিয়ে দিলেন যে, আমি তাঁকে এজন্য ক্ষমা করে দিয়েছি।

এই ঘটনা থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কি পরিমাণ ক্ষমা ও দয়া করতেন। যুদ্ধের তথ্য বিশেষ করে হামলার দিন-তারিখ দুশমনকে জানিয়ে দেওয়া হত্যাযোগ্য অপরাধ। আর এ কারণেই হযরত উমর (রা) তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু নবী ﷺ এতবড় অপরাধকেও নিছক তাঁর সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতার দরুন ক্ষমা করে দিলেন এবং কোনো শাস্তি বিধান করলেন না।

٧٨. عَنْ اَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَضْرِبُوْهُ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا الضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا

الضَّارِبُ بِثَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاتَقُوْلُوْا هَكَذَا وَلَا تُعِيْنُوْا الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ وَلَكِنْ قُوْلُوْا رَحِمَكَ اللّٰهُ -

৭৮. হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট এক মদ্যপ ব্যক্তিকে আনা হলো। তিনি লোকদেরকে বললেন ঃ ওকে পিটাও। (বর্ণনাকারী বলেন, এ আদেশ পাওয়া মাত্রই) আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাকে হাত দিয়ে মারা শুরু করলো, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউ কাপড় দিয়ে। এরপর সে যখন মারপিট খেয়ে চলে গেলো, তখন এক ব্যক্তি তাকে বদ্ দু'আ দিলো এবং বললো, আল্লাহ্ তোকে হেয় ও অপদস্থ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এভাবে বলো না এবং এ কথা বলে তার উপর শয়তানকে প্রবল করো না। বরং বলো, আল্লাহ্ তোমার উপর রহম (দয়া) করুন।

ফায়দা ঃ নবী ﷺ সবার সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। কখনো কাউকে নিজেও বদ্ দু'আ করতেন না এবং অন্যকেও বদ্ দু'আ করতে নিষেধ করতেন। একজন মদ্যপায়ীকেও বদ্ দু'আ দেয়া তিনি পছন্দ করলেন না। আর যখন কেউ বদ্ দু'আ দিলো, তখন তাকেও তা থেকে বিরত রাখলেন, বললেন ঃ বদ্ দু'আ করো না, বরং তার কল্যাণ কামনা করো। তবে তিনি ঐ মদ্যপায়ীকে মারপিট করার যে আদেশ করেছিলেন, তা ছিল মদপানের শাস্তিস্বরূপ। উল্লেখ্য যে, তখনো মদ্যপানের দণ্ড নির্ধারিত হয়নি, তাই মারপিট করে ছেড়ে দেন।

٧٩. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قِسْمًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الاَنْصَارِ اِنَّ هٰذِهِ الْقِسْمَةَ مَا اُرِيْدُ بِهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَذُكِرَتْ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَاَحْمَرُّ وَجْهُهُ وَقَالَ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَى مُوْسٰى قَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ -

৭৯. হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মালে গনীমত বণ্টন করছিলেন। জনৈক আনসারী (কটাক্ষ করে) বললো, এ বন্টনে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা নবী ﷺ -এর কর্ণগোচর হলো। এ কথা শোনামাত্রই তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, মূসা (আ)-এর উপর আল্লাহ্র রহমত হোক! তাঁকে এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।

ফায়দা ঃ আরব গোত্রসমূহের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা ও দুশমনী সব সময় লেগেই থাকতো। নবী ﷺ যখন এ দুনিয়ায় আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁদেরকে এক দীন ও এক পথে এনে দাঁড় করিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার এমন আত্মা ফুঁকে দেন, যাতে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রেম-ভালবাসা, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হওয়া শুরু করলো। পুরানো শত্রুতা দূর হতে লাগলো। তা সত্ত্বেও এমন কিছু লোক অবশিষ্ট ছিল যাদের মধ্যে পূর্ণরূপে প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টি হয়নি। বিশেষত আনসারগণ তাদের চাষাবাদে ব্যস্ত

থাকার দরুন নবী ﷺ-এর সাহচর্য থেকে যথোচিত উপকৃত হতে পারতো না। যেমন ঃ একদিন যখন তিনি গনীমতের কিছু মাল সাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন, তখন তাঁর বণ্টন খুব সুষ্ঠু হওয়া সত্ত্বেও ঐ ধরনের এক আনসারীর মনে অন্য গোত্রের লোককে সম্পদ লাভ করতে দেখে তার পুরানো শত্রুতা জাগ্রত হলো। সে (অজ্ঞানবশত) নবী ﷺ-এর বণ্টনকে অবিচার বলে আখ্যায়িত করলো এবং তাঁর ব্যাপারে এই অশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করলো। কিন্তু নবী ﷺ ঐ আনসার ব্যক্তির কথা শুনে ধৈর্য ধারণ করলেন এবং তার বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। তিনি উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বললেন, হযরত মূসা (আ)-কে আমার চেয়েও অধিক কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তিনিও ধৈর্য ধারণ করেছিলেন। আমিও ধৈর্য ধারণ করছি। তোমরাও এরূপ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করবে। এটাই নবীদের তরীকা বা পথ। নবী ﷺ ইচ্ছা করলে ঐ আনসারকে তার ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি ক্ষমা করে দেন এবং তাকে কিছুই বললেন না। এই হচ্ছে তাঁর উদারনৈতিক শিক্ষা। এই নৈতিক উদারতা শক্তি দ্বারাই ইসলাম সারা বিশ্বে বিস্তার লাভ করছে।

٨٠. عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَايُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ مِّنْكُمْ عَنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِىْ شَيْئًا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ ـ

৮০. হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ আমার কোনো সাহাবী সম্পর্কে আমার কাছে কোনো অভিযোগ করবে না। কেননা, আমি তোমাদের সামনে যখন আসবো তখন তোমাদের ব্যাপারে আমার হৃদয় প্রশান্ত থাকুক— এটাই আমি চাই।

ফায়দা ঃ আরব গোত্রসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক রাখার জন্য নবী ﷺ ঘোষণা করেছিলেন যে, কোনো ব্যক্তি আমার কাছে কারো বিরুদ্ধে এমন কোনো অভিযোগ করবে না, যাতে তার প্রতি আমার মনে কোনো অসন্তোষ বা বিষণ্ণ ভাব জাগতে পারে। এ হাদীস নবী ﷺ -এর ক্ষমা ও দয়ার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ। কেননা, কারো থেকে প্রতিশোধ নেয়ার ন্যূনতম মাধ্যম হচ্ছে তার সম্পর্কে কোনো কুৎসা শোনা বা প্রচার করা, যাতে তার অপমান হয় ও বদনাম রটে যায়। কিন্তু নবী ﷺ তার শিকড়ই উপড়ে ফেলেন। সকল সাহাবাকে এই মর্মে নিষেধ করে দেন যে, তোমাদের কেউ কারো বিরুদ্ধে আমার কাছে কোনো অভিযোগ বা বদনাম করবে না, যাতে তোমাদের প্রতি আমার মন সর্বদা পরিষ্কার থাকে এবং আমি তোমাদের প্রত্যেকের সাথে ইনসাফ ও সুবিচারমূলক আচরণ করি। আর এই উত্তম আদর্শই (اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) আমার সমস্ত উম্মত নিজেদের বৈশিষ্ট্য (شِعَارٌ) বানাবে। এখানে স্মর্তব্য যে, কারো বদনাম শোনা ও শোনানোর মধ্যেই পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতির বীজ উপ্ত থাকে। নবী ﷺ তাঁর উপরোক্ত ঘোষণার মাধ্যমে তার মূলোৎপাটন করতে চেয়েছেন।

مَا ذُكِرَ مِنْ جُوْدِهِ وَسَخَائِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর বদান্যতা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

٨١. عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى غَفْرَةَ حَدَّثَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا نَعَتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ النَّاسِ كَفًّا وَ اَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً مَنْ خَالَطَهُ فَعَرَفَهُ اَحَبَّهُ -

৮১. গাফারার আযাদকৃত গোলাম হযরত উমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, হযরত আলী (রা)-এর বংশধর ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন হানাফিয়্যা (র) আমাকে বলেছেনঃ হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) যখনই রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর গুণাবলি বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সবচেয়ে দানশীল ও উদারহস্ত ছিলেন এবং তিনি ছিলেন সবচেয়ে অধিক সুসম্পর্ক রক্ষাকারী। তাই যে কেউ তাঁর সাথে মেলামেশা করতো এবং তাঁর চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হতো, সেই তাঁকে অত্যধিক ভালবাসতো।

ফায়দা ঃ নবী ﷺ সমস্ত মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদার ছিলেন। বদান্যতা ছিল তাঁর স্বভাবগত আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণ। তিনি কখনো কোনো প্রার্থনার জবাবে 'না' বলেননি। কোনো প্রার্থনাকারীকে শূন্যহাতে ফিরিয়ে দেননি। দানও করতেন এমন পরিমাণ যে, স্বয়ং প্রার্থনাকারীও তাজ্জব মনে করতো। কখনো কোনো প্রার্থনাকারীকে দেওয়ার জন্য যদি তাঁর কাছে কিছু না থাকতো, তবে তিনি পরে তাকে দেওয়ার ওয়াদা করতেন এবং সে ওয়াদা তিনি পূর্ণ করতেন। কখনো কখনো অন্যের নিকট থেকে ঋণ নিয়ে দান করতেন। মেলামেশা ও সামাজিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁর পবিত্র জীবন ছিল সর্বাধিক সমুন্নত। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। ছোট-বড়োর শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং সকল প্রতিবেশী ও সাক্ষাৎ প্রার্থীর সাথে তিনি বিনম্র ব্যবহার করতেন। তাঁর এই মহান অনুপম চরিত্র দেখেই লোকেরা তাঁর ভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁকে সকলে অপরিসীম ভালবাসতো। তিনি প্রত্যেকের সাথে যথাযোগ্য সুব্যবহার করতেন। কাউকে কোনো প্রকার কষ্ট দিতেন না। সর্বদা সদ্ব্যবহার, সুবিচার, বিনয়-নম্রতা, সত্য কথা, প্রতিশ্রুতি পালন, শিশু ও ছোটদের প্রতি মমতা প্রদর্শন ছিল তাঁর উন্নত চরিত্রের নিদর্শন। সুতরাং যে ব্যক্তিই তাঁর সাহচর্য কয়েক মুহূর্তও লাভ করতো, সে-ই তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতে শুরু করতো। এক হাদীসে আছে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্রও নিকটবর্তী, জান্নাতেরও নিকটবর্তী, লোকজনেরও নিকটবর্তী (আর জাহান্নামের) আগুন থেকে দূরবর্তী। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত থেকেও দূরবর্তী, জান্নাত থেকেও দূরবর্তী, লোকজন থেকেও দূরবর্তী (এবং জাহান্নামের) আগুনের নিকটবর্তী। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর নিকট

একজন মূর্খ দানশীল ব্যক্তি একজন কৃপণ শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা অনেক উত্তম (তিরমিযী শরীফ)। সুবহানাল্লাহ্! দানশীলতা আল্লাহ্‌রও খুব প্রিয়। কেননা, তিনি নিজেই খুব দয়ালু ও দানশীল। তাই তাঁর সুন্দর নামসমূহের মধ্যে 'দয়ালু' (كَرِيْم) ও দানশীল (جَوَّادٌ)-ও উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ যেমন অপরিসীম দানশীল ও পরম দয়ালু তেমনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ বদান্যতা ও দানশীলতার ক্ষেত্রে সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চতম স্থানের অধিকারী। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কিত হাদীসগুলো সামনে বিবৃত হবে। এই হাদীসগুলো দ্বারাই তাঁর বদান্যতা ও দানশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

٨٢. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَجْوَدَ وَلَا اَنْجَدَ وَلَا اَشْجَعَ وَلَا اَرْضَى مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

৮২. হযরত ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা অধিক দানশীল ও দাতা, অধিক সাহসী, বড় বীর, অধিক ধৈর্যশীল ও পরিতুষ্ট কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, যেখানে নবী ﷺ সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক দানশীল ও দাতা ছিলেন, সেখানে তিনি সবচেয়ে অধিক সাহসী বীর, ধৈর্যশীল ও অল্পে তুষ্টও ছিলেন। তাঁর যুদ্ধ বিগ্রহ থেকেই তা প্রমাণিত হতে পারে কত বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, যাতে তাঁকে হাজারো বিপদ-আপদ, নানাবিধ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, পবিত্র মুখমণ্ডল যখমী হয়েছে, দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো হতোদ্যম ও সাহসহীনতার প্রমাণ দেননি। বরং সর্বদা দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে তার মুকাবিলা করেছেন। তাঁর দৃঢ়সংকল্প ও ধৈর্যের মধ্যে কোন তারতম্য ঘটেনি। তাঁর পবিত্র জীবনের সূচনাই হয়েছে দৃঢ় সংকল্প ও ধৈর্য-সহ্যের মধ্য দিয়ে। আরবের মূর্খ ও বিদ্বেষপরায়ণ মুশরিকদের মধ্যে যারা কখনো তাদের পিতৃপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিল না, যারা শত শত বছর থেকে মূর্তি পূজা করে আসছিল, তিনি একাকী দাঁড়িয়ে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দেন। তখন তাঁর কোনো সঙ্গী ও সাহায্যকারী ছিলো না। তিনি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতার সাথে মুশরিক ও কাফিরদেরকে দীন ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। আরবের শিশুরা পর্যন্ত তাঁর বিরোধিতা করতো। মক্কার কাফিররা তাঁকে দুঃখ-কষ্ট দিতো। দুষ্ট বালকেরা তাঁকে পাথর মারতো। তিনি রক্তে রঞ্জিত হতেন। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি সাহস হারাতেন না। বরং অনমনীয়তার সাথে তাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। শেষে এমন একদিন এলো, যখন আরবের প্রতিটি গৃহে তাওহীদের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো এবং তাদের শিশুরা পর্যন্ত তাঁর ভক্ত ও প্রেমিক হয়ে পড়লো। তিনি সমগ্র আরব ও অনারবের বন্ধু হয়ে গেলেন।

٨٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَجْوَدَ مَايَكُوْنُ فِيْ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

৮৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। বিশেষত রমযানের মাসে তাঁর দানশীলতার মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যেতো, যখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করতেন।

ফায়দা ঃ এখানে গ্রন্থকার পুরো হাদীসটি উদ্ধৃত করেননি। বরং নবী ﷺ-এর দানশীলতার সাথে সম্পর্কিত অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন। এ হাদীস সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমে সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, নবী ﷺ লোকদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ও দাতা ছিলেন। আর রমযান মাসে যখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আগমন করতেন, তখন তাঁর দানশীলতা অন্যান্য সময় অপেক্ষা অনেক গুণ বেড়ে যেতো। তখন তিনি অত্যধিক মাত্রায় দান-খয়রাত করতেন। জিব্‌রাঈল (আ) রমযান মাসে প্রতিদিন তাঁর নিকট আগমন করতেন এবং কুরআন শরীফের শুনানি করতেন। ঐ সময় তিনি ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন বায়ুর চেয়েও অধিক দান-খয়রাত করতেন। অর্থাৎ নবী ﷺ রমযান মাসে দান-খয়রাতের পরিমাণ এতই বৃদ্ধি করতেন যে, বর্ণনাকারী তাঁর দান-খয়রাতের আধিক্যকে ঝড়ো হওয়ার গতিবেগের সাথে তুলনা করেছেন। রমযান মাসে নবী ﷺ-এর অধিক দান-খয়রাত করার কারণ হচ্ছে, ঐ পবিত্র মাসে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের উপর অপরিসীম দয়া ও কৃপা করে থাকেন। তাঁর রিযিক তাদের উপর অবারিত করে দেন। রোযাদারদের সকল কর্মকাণ্ডের বিনিময় এই পবিত্র মাসের কারণে দশগুণ থেকে সত্তর গুণ পর্যন্ত বেশি প্রদান করেন। এ মাসে একবার কুরআন খতম করলে সত্তরবার কুরআন খতম করার সওয়াব পাওয়া যায়। এক রাকআত নফল সালাত পড়ার সওয়াব সত্তর রাকআত পড়ার সমান হয়। এক পয়সা ব্যয় করার সওয়াব সত্তর পয়সা ব্যয় করার সমান হয়। এ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কৃপায় রোযাদার বান্দাদের পেছনের সমস্ত গুনাহ্ও মাফ করে দেন। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রমযান মাসের শেষ রাতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রোযাদার বান্দাদের ক্ষমা ঘোষণা করেন। তাই আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ ও আল্লাহ্‌র এই দানশীলতার গুণটি রপ্ত করতেন এবং অন্যদেরকেও রপ্ত করার নির্দেশ দিতেন। বর্ণিত আছে (تَخَلَّقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ) (তোমরা আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও)। তাই আল্লাহ্‌র গুণাবলি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনার প্রমাণ। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর প্রদর্শিত পথে সঠিকভাবে চলার তাওফীক দান করুন।

٨٤. عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ فَاَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَاَتَى الرَّجُلُ قَوْمَهُ، فَقَالَ أَسْلِمُوْا فَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يُعْطِيْ عَطَاءَ رَجُلٍ مَايَخَافُ فَاقَةً -

৮৪. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে (আর্থিক সাহায্য) প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে দুই পাহাড়ের মধ্যকার সব বক্রী দান করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি তার গোত্রের মধ্যে এসে বললো, হে লোক সকল! তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা, মুহাম্মদ ﷺ সেই ব্যক্তির ন্যায় দান করে থাকেন, যার দারিদ্রের কোনো আশংকা নাই।

ফায়দা ঃ এই রিওয়ায়াতটিই মিশকাত শরীফে হযরত আনাস (রা) থেকে এই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট দুই পাহাড় সমান ছাগ প্রার্থনা করলো। তিনি তা তাকে দান করলেন। তখন ঐ ব্যক্তি তার গোত্রে এসে বললো, হে আমার গোত্র! তোমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ ﷺ এতই দান করেন যে, নিজে দরিদ্র হয়ে যাওয়ারও ভয় করেন না।

শামায়েলে তিরমিযীতে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো কোনো বস্তু (ভবিষ্যতের জন্য) সঞ্চয় করে রাখতেন না। (বরং তৎক্ষণাৎ সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন)।

এই হাদীসগুলো থেকেই নবী ﷺ-এর বদান্যতা ও দানশীলতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। কেননা যে যত চাইত তিনি তাকে তা দান করতেন। কখনো প্রার্থনাকারীকে তাঁর নামে ঋণ নিয়ে প্রয়োজন মিটানোর অনুমতি দিতেন। যেমন সামনের হাদীসসমূহে বিধৃত হয়েছে। নবী ﷺ-এর এই বদান্যতার পরাকাষ্ঠা ও আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসায় বিস্মিত হয়ে ঐ প্রার্থনাকারী তার গোত্রকেও ঈমান ও ইসলামের দাওয়াত দেয় এবং নিজেও ঈমান আনে।

এক হাদীসে হযরত ইব্ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেন ঃ ঈর্ষা কেবল দুই ব্যক্তির উপর হতে পারে। এক. সেই ব্যক্তি—যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদও দিয়েছেন এবং তাকে ঐ সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করারও তাওফীক দিয়েছেন। দুই. সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দান করেছেন এবং সে তা দ্বারা নিজেও পরিচালিত হয় এবং অপরকেও তা শিক্ষা দেয়। (রিয়াদুস্-সালিহীন)

অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যহ সকাল বেলা যখন আল্লাহ্র বান্দা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়, তখন তার সাথে দু'জন ফিরিশ্তাও আসমান থেকে অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ্! ব্যয়কারী, দানশীল ও দাতা ব্যক্তিকে তার বিনিময় দান করো। দ্বিতীয় ফিরিশ্তা বলেন, হে আল্লাহ্! বখীল ও কৃপণ ব্যক্তির সম্পদে তুমি ধস নামাও। (বুখারী ও মুসলিম)

অপর এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ হে আদাম সন্তান! তুমি আল্লাহ্র সৃষ্টির জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করো, তোমার জন্যও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ব্যয় করা হবে। (রিয়াদুস্-সালিহীন)।

٨٥. عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلَى غَفْرَةَ حَدَّثَنِىْ اِبْرَاهِيْمَ ابْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَانَ اَجْوَدَ النَّاسِ كَفًّا وَأَجْرَأَ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقَ النَّاسِ لَهْجَةً وَأَوفَاهُمْ بِذِمَّةٍ، وَأَلْيَنَهُمْ عَرِيْكَةً وَاَكْرَمَهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَاٰهُ بَدِيْهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ فَعَرَفَهُ أَحَبَّهُ لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَابَعْدَهُ مِثْلَهُ -

৮৫. হযরত গাফারা (রা) এর মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) উমর ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার কাছে ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ [যিনি হযরত আলী (রা)-এর বংশধর] হাদীস বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) যখন নবী ﷺ -এর (সুন্দরতম) গুণাবলি বর্ণনা করতেন, তখন বলতেন যে, তিনি সবচেয়ে উদার হস্ত, সবচেয়ে সাহসী-হৃদয়, সবচেয়ে সত্যভাষী, সবচেয়ে ওয়াদা পালনকারী, সবচেয়ে নম্র-স্বভাব এবং সবচেয়ে ভদ্র জীবন যাপনকারী ছিলেন। যে ব্যক্তি হঠাৎ তাঁকে দেখত তার মনে ভীতির সঞ্চার হতো এবং যে ব্যক্তি তাঁর সাহচর্য লাভ করতো ও তাঁর অতুলনীয় স্বভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতো, সে তাঁকে ভালবাসতে শুরু করতো। আমি তাঁর পূর্বে কখনো তাঁর মতো (সর্বগুণে গুণান্বিত) মানুষ দেখিনি এবং তার পরেও দেখিনি।

ফায়দা ঃ হযরত আলী (রা)-এর এ হাদীস পূর্বের একটি হাদীসের আওতায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে হাদীসের কিছু কথা পূর্বোক্ত হাদীস অপেক্ষা বেশি বর্ণিত হয়েছে, যা নবী ﷺ -এর মহৎ গুণাবলি ও উন্নত চরিত্রাবলি ব্যাখ্যা করছে। এসব অনুপম গুণ ও চরিত্রাবলি আয়ত্ত করা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। নবী ﷺ-এর পূর্ণ আনুগত্যের মূল কথাই হচ্ছে তাঁর সুমহান গুণাবলি ও সমুন্নত চরিত্রাবলিকে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করা, তাঁর পবিত্র জীবন ও প্রশংসিত চরিত্র অনুসরণ করা। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে পূর্ণভাবে তাঁর পদাংক অনুসরণ করার এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ অনুগত ও অনুসারী হওয়ার এবং তাঁর গুণাবলি ও সুন্দরতম চরিত্রাবলি নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার তাওফীক দান করুন।

٨٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يُسْئَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ عَلَى الْاِسْلَامِ إِلاَّ أَعْطَاهُ وَإِنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ أَسْلِمُوْا فَاِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ يُعْطِيْ عَطَاءً مَا يَخْشٰى فِيْهِ الْفَاقَةَ -

৮৬. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট ইসলামের নামে যখনই কোনো বস্তু চাওয়া হয়েছে, তিনি তা অবশ্যই প্রদান করেছেন। একবার এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট প্রার্থনা করলো। তিনি তাকে ছাগলের একটি পূর্ণ পালই

প্রদান করলেন, যা দুই পাহাড়ের মাঝখানে ছড়িয়ে ছিল। তারপর ঐ ব্যক্তি তাঁর গোত্রের মধ্যে ফিরে গিয়ে বললো, (হে আমার গোত্র) তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা মুহাম্মদ ﷺ এমনভাবে দান করেন যে, তারপর দারিদ্র্যের কোনো আশংকাই থাকে না।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটিও সামান্য পরিবর্তনসহ ইতিপূর্বে একটি হাদীসের আওতায় বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস থেকে নবী ﷺ-এর পরম দানশীলতা অনুমান করুন। তিনি কতবড় দানশীল ও দাতা ছিলেন তা এর দ্বারাই পরিমাপ করা যায়। নবী ﷺ-এর দান ও বখ্শিশের এই অবস্থা ছিল সর্বব্যাপী। যে কেউ তাঁর দরবারে ইসলামের নামে আঁচল পেতে দিতো, যে তার প্রার্থিত বস্তু দ্বারা আঁচল পূর্ণ করে ফিরে যেতো এবং সাথে সাথে তাঁর ঔদার্য ও আল্লাহ্র উপর পূর্ণ ভরসা দেখে তার ঈমান আরো মযবুত হয়ে যেতো। সে তার কাওম ও গোত্রকে এরূপ মূর্তিমান দানশীল ও উদার নবীর দীন কবূল করার উপদেশ দিতো। সত্য বলতে কি, দুনিয়ায় চারিত্রিক শক্তি এমন কিছু করে দেখতে পারে যা সামরিক শক্তি কখনো দেখতে পারে না। চরিত্রই হচ্ছে সেই হাতিয়ার যা দ্বারা চরম ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহী অন্তর বশ করা যায়। একথা মোটেই সত্য নয় যে, তলোয়ার দ্বারা ইসলাম দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। বরং ইসলাম সত্য নবীর (আমার মাতা-পিতা তাঁর জন্য উৎসর্গিত হোক) সুমহান চরিত্র ও সমুন্নত গুণাবলির আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা বিশ্ব-ধর্মে পরিণত হয়েছে, যার বহু জীবন্ত উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে বিধৃত আছে।

٨٧. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَيُسْئَلُ شَيْئًا إِلاَّ اَعْطَاهُ -

৮৭. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট যে বস্তুই প্রার্থনা করা হতো, তিনি তা দান করতেন।

٨٨ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ قَالَ لاَ -

৮৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে কিছু চাওয়া হয়েছে এবং তিনি তা দেননি—এরূপ কখনো হয়নি।

٨٩ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَيَقُوْلُ لِشَيْءٍ يُسْأَلُ لاَ -

৮৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট কোনো কিছু চাওয়া হলে তিনি 'না' বলতেন না।

٩٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا قَطُّ فَمَنَعَهُ -

৯০. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট কোনো বস্তু প্রার্থনা করা হয়েছে এবং তিনি তা নিষেধ করেছেন এরূপ কখনো হয়নি।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত চারটি হাদীসের বিষয়বস্তু একই। এগুলো থেকে বোঝা যায় যে, প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা ও অভাবগ্রস্তের অভাব পূরণ করা ছিল নবী ﷺ-এর প্রকৃতি ও স্বভাবের অন্তর্গত। তিনি কাউকে শূন্য হাতে ও নিরাশ করে ফিরিয়ে দেননি। কখনো মুখে 'না' শব্দ উচ্চারণ করেননি। তাঁর এই গুণের কথাই এক আরব কবি এভাবে উল্লেখ করেছেন–

مَا قَالَ لاَ قَطُّ اِلاَّ فِىْ تَشَهُّدِهِ + لَوْلاَ التَّشَهُّدُ كَانَتْ لاَؤُهُ نَعَمْ -

"কালিমা শাহাদত ছাড়া তিনি কখনো 'লা' (না) বলেননি। কালিমা শাহাদত যদি না হতো তবে তাঁর 'লা' (না)-ও নাআম (হ্যাঁ) হয়ে যেত।"

এই মর্মই ফারসী কবি নিম্নোক্ত চরণে ব্যক্ত করেছেন ঃ

نزفت لابزبان مبارکش هرکز + مکربه اشهد ان لا اله الا الله

"তাঁর যবান মুবারকে কখনো 'না' শব্দ উচ্চারিত হয়নি। যদি হয়ে থাকে, তবে তা হয়েছে কালিমা শাহাদত "اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ" -এর মধ্যে।"

নবী ﷺ-এর বদান্যতার ক্ষেত্রে পরিমাণের কোনো প্রশ্ন ছিল না। তিনি ছোট-বড় সব চাওয়া পূরণ করতেন। যেমন পূর্বোক্ত এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, জনৈক ব্যক্তি যখন দুই পাহাড়ের উপত্যকাপূর্ণ বক্‌রীর পাল প্রার্থনা করলো, তখন তিনি তাও দান করে দেন। তাঁর কাছে যদি এর চেয়েও বেশি চাওয়া হতো, তবে তিনি তাও দিয়ে দিতেন। নবী ﷺ-এর এই বদান্যতা তো ছিল কেউ কিছু প্রার্থনা করার সময়। কিন্তু তাঁর নিকট যখন কোথাও থেকে কোনো সম্পদ আসতো, তখন তিনি প্রার্থনা ছাড়াই পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে ডেকে ডেকে প্রদান করতেন। তিনি কখনো সম্পদ সঞ্চয় করে রাখতেন না। বরং সত্বর তা বণ্টন করে দিতেন। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার নবী ﷺ-এর নিকট বাহরাইন থেকে বেশ কিছু মালপত্র এলো। তিনি বললেন, ওগুলো মসজিদের আঙ্গিনায় বিছিয়ে দাও। এর পূর্বে এত সম্পদ তাঁর নিকট কখনো আসেনি। (বুখারী)

তিনি এই সমুদয় সম্পদ সাহাবাদের মধ্যে বিতরণ করলেন। বিতরণের পর তাঁর নিকট একটি দিরহামও অবশিষ্ট ছিল না। দানশীলতা ছিল নবী ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু এবং কৃপণতা ছিল সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যাপার। এক হাদীসে হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, বদান্যতা আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। (তারগীব ও তারহীব)।

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জান্নাতে এমন একটি ঘর আছে, যার নাম 'বায়তুস্ সাখা' দান-নিকেতন (তারগীব)। কৃপণতার অপনিন্দায় নবী ﷺ

-এর বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এক হাদীসে হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জুলুম থেকে আত্মরক্ষা করো, কেননা জুলুম কিয়ামতের দিন ঘনঘোর অন্ধকাররূপে আত্মপ্রকাশ করবে। আর কৃপণতা থেকে দূরে থাকো, কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছে। তাদেরকে রক্তারক্তি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারামকে হালাল করতে তাদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছে (রিয়াদুস্-সালিহীন)। বস্তুত কৃপণতা এমন এক কুঅভ্যাস ও ধ্বংসাত্মক হীন কাজ, যা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রকে কলুষিত করে। কৃপণের কারণেই সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। পরস্পরে অনৈক্য ও মনোমালিন্য দেখা দেয়। গোটা সমাজ বিপর্যস্ত হয়। কৃপণতার কারণেই গরীব, মিস্কীন, ভিক্ষুক, অভাবগ্রস্ত, অসহায় ও বেকার লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর এভাবে গোটা জাতির অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হতে থাকে। তাছাড়া সাহায্য-সহায়তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দরুন এই লোকগুলোই সমাজে অপরাধ ও বিপর্যয় সৃষ্টির কারণ হয়। ব্যক্তি হিসাবে কৃপণের কার্পণ্য ও ঐশ্বর্য প্রীতির দরুন বন্ধু-বান্ধবের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য হয়। সামান্য সম্পদের জন্য সে লড়াই করতে ও জীবন দিতে প্রস্তুত হয়। ফলে পরস্পরের মধ্যে দুশমনী ও শত্রুতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। রক্তারক্তি পর্যন্ত পরিস্থিতি গড়ায়। কৃপণতার এই নিন্দনীয় ও অনিষ্টকর স্বভাব থেকে আল্লাহ্ সকল মুসলিমকে রক্ষা করুন। আমাদের নবী ﷺ ও এই কুস্বভাব থেকে মহান আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ হরমামেশা এই দু'আ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ -

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুঃসহ চিন্তা ও সন্তাপ থেকে। আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অসামর্থ্য ও আলস্য থেকে। তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে।

٩١. عَنْ هَارُوْنَ بْنِ رِيَابٍ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ سَبْعُوْنَ اَلْفَ دِرْهَمٍ وَهُوَ اَكْثَرُ مَالٍ اُتِىَ بِهٖ قَطُّ، فَوَضَعَ عَلٰى حَصِيْرٍ ثُمَّ قَامَ اِلَيْهَا يَقْسِمُهَا فَمَا رَدَّ سَائِلاً حَتّٰى فَرَغَ مِنْهُ -

৯১. হযরত হারুন ইব্ন রিয়াব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ-এর নিকট সত্তর হাজার দিরহাম এলো। ইতিপূর্বে এত বেশি অর্থ আর কখনো তাঁর কাছে আসেনি। তিনি তা চাটাইয়ের উপর রেখে বণ্টন করা শুরু করলেন। কোনো প্রার্থনাকারীকেই তিনি (শূন্য হাতে) ফিরিয়ে দেননি। (এমনিভাবে) সম্পূর্ণ অর্থই তিনি বণ্টন করে দেন।

ফায়দা ঃ নবী ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, যখনই কোথাও থেকে তাঁর নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ আসতো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সে খবর প্রচার করে দিতেন। দরিদ্র ও অভাবীদের ডেকে তিনি তা তৎক্ষণাৎ বণ্টন করে দিতেন। নিজের কাছে কখনো জমা করে রাখতেন না। অনেক সময় এমনও হতো যে, প্রচার করে বিতরণ করা সত্ত্বেও কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যেতো। তার হক্‌দার ও গ্রহণকারী কেউ থাকতো না। তখন তিনি খুব কষ্ট ও অস্বস্তি বোধ করতেন; অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। সম্পূর্ণ সম্পদ বণ্টন না করা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি লাভ করতেন না। এক হাদীসে হযরত উম্মু সালামা (রা) বলেন, একবার নবী ﷺ বিমর্ষ অবস্থায় গৃহে আগমন করেন। উম্মু সালামা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ﷺ আপনি চিন্তিত কেন ? তিনি বললেন, গতকাল যে সাতটি দীনার এসেছিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত তা আমার বিছানায় পড়ে আছে। কোনো গ্রহণকারী পাওয়া যায়নি (মুসনাদে আহ্‌মাদ)।

٩٢. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيُسْئَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعُهُ۔

৯২. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর নিকট যখনই কোনো কিছু চাওয়া হতো, তিনি তা প্রদান করতেন, নিষেধ করতেন না।

٩٣ . عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ بَعْضِ بَنِىْ سَاعِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا اُسَيْدٍ مَالِكِ ابْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيَمْنَعُ شَيْئًا يُسْئَلُ۔

৯৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বাকর (রা) বানূ সাঈদার জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি আবূ উসাইদ মালিক ইব্‌ন রাবীআ (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী ﷺ -এর নিকট যে জিনিসই চাওয়া হতো, তিনি তা দিতে অস্বীকার করতেন না (বরং দিয়ে দিতেন)।

٩٤. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ لاَيَنْظُرُوْنَ إِلَى أَبِىْ سُفْيَانَ وَلاَ يُقَاعِدُوْنَهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ثَلاَثٌ أَعْطِيْهِنَّ، قَالَ نَعَمْ قَالَ عِنْدِىْ اَحْسَنُ الْعَرَبِ وَاَجْمَلُهُ اُمُّ حَبِيْبَةَ اُزَوِّجُكَهَا قَالَ نَعَمْ، قَالَ وَمُعَاوِيَةَ تَجْعَلُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ قَالَ نَعَمْ، وَتُؤَمِّرُنِىْ حَتّٰى اُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا قَاتَلْتُ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ نَعَمْ، قَالَ اَبُوْ زُمَيْلٍ وَلَوْلاَ اَنَّهُ طَلَبَ ذٰلِكَ مِنَ النَّبِىِّ ﷺ مَا اَعطَاهُ لِاَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْئَلُ شَيْئًا قَطُّ اِلاَّ قَالَ نَعَمْ۔

৯৪. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুসলিম জনতা হযরত আবূ সুফিয়ান (রা)-কে (তাঁর কাফির থাকাকালে মুসলমানদের সাথে চরম শত্রুতা করার কারণে) সুনযরে দেখতেন না। তাঁর সাথে উঠাবসাও করতেন না। একবার আবূ সুফিয়ান (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে তিনটি বিশেষ (মর্যাদা) দান করুন। তিনি বললেন, বেশ ভালো (বলো, তা কি ?) আবূ সূফিয়ান (রা) বলেন, আমার কন্যা উম্মু হাবীবা (রা) আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ও রূপসী রমণী। আমি তাকে আপনার নিকট বিবাহ দিলাম। (আপনি কবুল করুন) তিনি বললেন, বেশ ভালো। তারপর তিনি [আবূ সুফিয়ান (রা)] বললেন, মুআবিয়াকে আপনি আপনার পেশকার বানিয়ে নিন। তিনি বললেন, বেশ তাই করা হলো। এরপর তিনি [আবূ সুফিয়ান (রা)] বললেন, আপনি আমাকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সেনাপতি (আমীরুল হার্‌ব) বানিয়ে দিন। যাতে আমি পূর্বে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেরূপ যুদ্ধ করেছিলাম, এখন কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি। নবী ﷺ বললেন, বহুত আচ্ছা। তিনি তাঁকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত বাহিনীর অধিনায়ক বানিয়ে দিলেন। আবূ যামীল (র) বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা) যদি নবী ﷺ-এর নিকট ঐগুলো প্রার্থনা না করতেন, তবে তিনি তা তাঁকে আদৌ দান করতেন না। কিন্তু কথা হচ্ছে, নবী ﷺ-এর নিকট কেউ কোনো জিনিস প্রার্থনা করলে তিনি তা তাকে দান করতেন। অস্বীকার করতেন না।

ফায়দা ঃ এ হাদীস সামান্য পরিবর্তনসহ মুসলিম শরীফে আবূ সুফিয়ানের মর্যাদা ও গুণাবলি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু এ হাদীসের প্রথম অংশ সম্পর্কে হাদীস-বিশেষজ্ঞগণের চরম আপত্তি রয়েছে। আর তা হচ্ছে সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) ৮ হিজরীতে মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। আর নবী ﷺ-এর সাথে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মু হাবীবা (রা)-এর বিবাহ হয়েছিল তার বহু আগে ৬ হিজরী (মতান্তরে ৭ হিজরীতে)। তখন আবূ সুফিয়ান মুসলমানও হননি। সুতরাং এ সময় হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) কর্তৃক তাঁর কন্যা উম্মু হাবীবাকে বিবাহের জন্য নবী ﷺ-এর নিকট পেশ করা কোনোক্রমেই সঠিক হতে পারে না। কোনো কোনো আলিম লিখেছেন, মূলত হযরত আবূ সুফিয়ান (রা) নবী ﷺ-এর কাছে এই প্রস্তাব করেছিলেন ইসলাম গ্রহণের পরে স্বীয় সন্তোষ প্রকাশের মানসে। যেনো এ সময়ে তিনি স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপনার্থে নতুনভাবে নবী ﷺ-এর কাছে প্রস্তাব করছেন। যা হোক, হাদীসটির সনদ দুর্বল। এ হাদীস বর্ণনা করা দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী ﷺ -এর বদান্যতা ও দানশীলতা বর্ণনা করা। নবী ﷺ আবূ সুফিয়ানের মতো ইসলামের শত্রুকেও ইসলাম গ্রহণের পর গৌরব ও মর্যাদা দান করতে কার্পণ্য করেননি। এ কারণেই এ হাদীসটি গ্রন্থকার তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেনো নবী ﷺ-এর দরবার থেকে ধনসম্পদের মতো মান- মর্যাদাও অকাতরে দান করা হতো।

٩٥. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ مَاعِنْدِيْ شَيْءٌ وَلَكِنِ ابْتَعْ عَلَيَّ فَاِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَاهُ ـ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ

اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاكَلَّفَكَ اللّٰهُ مَالاَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ فَكَرَهَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ رَجُلٌ اَنْفِقْ وَلاَ تَخَفْ مِنْ ذِىْ الْعَرْشِ اِقْلاَلاً، فَتَبَسَّمَ النَّبِىُّ ﷺ وَعُرِفَ السُّرُوْرُ فِىْ وَجْهِهِ -

৯৫. হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, একবার কোনো এক (অভাবী) লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে (আর্থিক সাহায্য) প্রার্থনা করলো। তিনি বললেন, আমার নিকট এ মুহূর্তে কিছু নেই। তুমি আমার নামে কিনে নাও। আমার কাছে যখন কিছু আসবে তখন তা আমি পরিশোধ করে দেবো। হযরত উমর (রা) বলেন, (এ কথা শুনে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ আপনাকে সাধ্যের অতীত কোনো কাজ করার নির্দেশ দেননি। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ হযরত উমরের এ কথা পছন্দ করলেন না। তখন অন্য এক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দেদার খরচ করুন এবং আরশের মালিকের পক্ষ থেকে স্বল্পতার আশংকা একেবারেই করবেন না। নবী ﷺ (এই সাহাবীর কথা খুব পছন্দ করলেন এবং) মুচকি হাসলেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে তখন আনন্দের চিহ্ন ফুটে উঠলো।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকেও নবী ﷺ-এর বদান্যতা ও দানশীলতার পরাকাষ্ঠা অনুমিত হয়। তাঁর কাছে কিছুই নেই; তা সত্ত্বেও তিনি প্রার্থনাকারীকে দান করতে অস্বীকার করলেন না, তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিলেন না। বরং অন্যের নিকট থেকে ধার করে তার প্রয়োজন পূরণ করতে বললেন এবং সে ধার নিজে পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কোনো প্রার্থনাকারীকেই শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেয়া তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর দান ও বদান্যতা হযরত উমর (রা)-এর মতো সুবিখ্যাত সাহাবীর পরামর্শ ও অভিমতের উপর প্রাধান্য পেল। দানের ব্যাপারে নবী ﷺ হযরত উমর (রা)-এর পরামর্শও মেনে নেননি বরং একজন সাধারণ সাহাবীর কথা পছন্দ করেন। দানের সপক্ষে মত প্রকাশ করায় একজন সাধারণ সাহাবীর কথায় তিনি উৎফুল্ল হন।

٩٦. عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ عَلَقَتِ الاَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهُ حَتَّى اضْطَرُّوْهُ اِلَى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَقَالَ أَعْطُوْنِىْ رِدَائِىْ، لَوْكَانَ لِىْ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُوْنِىْ بَخِيْلاً وَّ لاَكَذَّابًا وَّلاَجَبَانًا -

৯৬. হযরত জুবায়র ইব্‌ন মুত্‌ইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের সাথে হুনাইনের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তখন কিছু গ্রামীণ লোক তাঁকে জড়িয়ে ধরলো এবং (আর্থিক) সাহায্য প্রার্থনা করলো। এমনকি তারা তাঁকে ঠেলে একটি কণ্টকময় বৃক্ষের কাছে নিয়ে গেলো এবং তাতে তাঁর চাদরখানা আট্‌কে গেলো। তখন

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেমে গেলেন এবং বললেন, আমার চাদরটি আমাকে দিয়ে দাও। যদি আমার কাছে এখন এই কাঁটাযুক্ত বৃক্ষের কাঁটা সংখ্যক জন্তু (চতুষ্পদ প্রাণী) থাকতো, তবে আমি তাও তোমাদের মধ্যে বিতরণ করে দিতাম। এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে কৃপণ দেখতে পেতে না এবং (ওয়াদা করার ক্ষেত্রে) মিথ্যুক ও (ব্যয় করার ব্যাপারে ভীত ও) কাপুরুষও দেখতে না।

ফায়দা ঃ এ হাদীস হুনাইন যুদ্ধ সম্পর্কিত। নবী ﷺ হুনাইন যুদ্ধে যে সম্পদ লাভ করেছিলেন, তা সাহাবাদের মধ্যে বণ্টন করে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তখন তাঁর নিকট অবশিষ্ট কিছুই ছিল না। পথিমধ্য গ্রামীণ লোকেরা অজ্ঞতাবশত এসে তাঁকে ঘিরে ধরলো এবং আর্থিক সাহায্য প্রার্থনা করলো। নবী ﷺ অপারগ ছিলেন। তিনি তাদেরকে জানালেন যে, যদি আমার কাছে এখন কোনো সম্পদ থাকতো, তবে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করতাম। সামান্যতম কার্পণ্য করতাম না।

٩٧. عَنْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ سَمِعْتُ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اَتَيْتُ اَنَا وَفَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَالْعَبَّاسُ وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! كَبِرَ سِنِّىْ وَرَقَّ عَظْمِىْ رَأَيْتَ اَنْ تَأْمُرَ لِىْ بِكَذَا وَسَقًا مِنَ الطَّعَامِ فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَفْعَلُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنْ رَأَيْتَ اَنْ تَأْمُرْ لِىْ كَمَا اَمَرْتَ لِعَمِّكَ فَافْعَلْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَفْعَلُ، فَقَالَ زَيْدُ ابْنُ حَارِثَةَ اَرْضًا كَانَتْ مَعِيْشَتِىْ مِنْهَا ثُمَّ قَبَضْتَهَا فَاِنْ رَأْيْتَ اَنْ تَرُدَّهَا عَلَىَّ فَافْعَلُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَافْعَلُ فَقُلْتُ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ رَأَيْتَ اَنْ تُوَلِّيَنِىْ هٰذَا الْحَقُّ الَّذِىْ جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا فِىْ كِتَابِهِ مِنْ هٰذَا الْخُمُسُ فَاَقْسِمْهُ فِىْ حَيَاتِكَ حَتّٰى لاَيُنَازِ عَنِيْهِ اَحَد بَعْدَكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَأَفْعَلُ ذٰلِكَ فَوَلاَّنِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৯৭. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ লায়লা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি, ফাতিমা, আব্বাস ও যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা) একবার নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম। তখন আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার বয়স অনেক হয়েছে এবং আমার শক্তি খর্ব হয়ে গেলো। সুতরাং আপনি সঙ্গত মনে করলে আমার জন্য বায়তুল মাল থেকে এতো এতো ওয়াসাক[১] খাদ্যশস্য দেয়ার নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং বললেন, আমি

১. 'ওয়াসাক' একটি মাপের নাম, যা ষাট সা-এর সমান। সা হলো সাড়ে তিন সের। কারো কারো মতে 'ওয়াসাক' এক উট সমান বোঝাকেও বলা হয়।

অবশ্যই তা করবো। এরপর ফাতিমা (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার চাচার জন্য যে নির্দেশ দিয়েছেন, সঙ্গত মনে করলে আমার জন্যও অনুরূপ সাহায্যের নির্দেশ দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আবেদনও মঞ্জুর করলেন এবং বললেন, আমি তোমার জন্যও তাই করবো। এরপর (তাঁর আযাদকৃত দাস পালক পুত্র) যায়দ ইবন হারিসা (রা) বলেন, আমার নিকট একখণ্ড জমি ছিল। তা দিয়ে আমার জীবিকা নির্বাহ হতো। আপনি আইনের বলে তা বাজেয়াফ্ত করেছেন। এখন আপনি যদি সঙ্গত মনে করেন, তবে সেই জমিটুকু আমাকে ফেরত দিন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আবেদনও মঞ্জুর করলেন এবং বললেন, আমি অবশ্যই তা করবো। হযরত আলী (রা) বলেন, তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি সঙ্গত মনে করেন, তবে আমাকে বায়তুল মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ মালে গনীমতের অধিকার, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন—বণ্টন করার মুতাওয়াল্লী বানিয়ে দিন। তাহলে আমি তা আপনার জীবদ্দশায়ই বণ্টন করতে থাকবো এবং আপনার পরে এ ব্যাপারে আমার সাথে কেউ বিবাদে লিপ্ত হতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর আবেদনও মঞ্জুর করলেন এবং বললেন, আমি তা অবশ্যই করবো। হযরত আলী (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ঐ এক-পঞ্চমাংশ বণ্টন করার নির্দেশ দান করেন।

ফায়দা ঃ এ পূর্ববর্তী হাদীসসমূহে নবী ﷺ-এর বদান্যতা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা এসেছে। এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, নবী ﷺ যেরূপ অন্যদেরকে তাঁর বিপুল বদান্যতা ও দানশীলতা দ্বারা বিভূষিত করতেন, অনুরূপ তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথেও দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করতেন—এটাই হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ। আর এ কারণেই তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতেন এবং তাদেরকে ধন-সম্পদ দান করা ছিল তাঁর মহান চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। এ হাদীসে উল্লিখিত নবী ﷺ-এর নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্য আগত ব্যক্তিগণ ছিলেন তাঁর আত্মীয়-স্বজন। হযরত আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচা। হযরত ফাতিমা (রা) তাঁর কলিজার টুক্‌রা স্নেহের কন্যা। হযরত আলী (রা) তাঁর চাচাত ভাই ও স্নেহের জামাতা এবং হযরত যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) নবী ﷺ-এর প্রিয় সাহাবী ও আযাদকৃত গোলাম ও পালক পুত্র। এই ব্যক্তিগণ নবী ﷺ-এর নিকট এসে নিজ নিজ প্রয়োজন তুলে ধরেন এবং তিনি তাঁর পরম ঔদার্য ও সহানুভূতিবশত তাঁদের সবার আবেদন মঞ্জুর করেন। কাউকেই শূন্য হাতে ফিরিয়ে দেননি।

٩٨. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ اَنْشَدَ اَبُوْ بَكْرٍ قَوْلَ لَبِيْدٍ : اَخٌ لِىْ اَمَّا كُلُّ شَىْءٍ سَاَلْتُهُ فَيُعْطِىْ وَاَمَّا كُلُّ ذَنْبٍ فَيَغْفِرُ : فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -

৯৮. হযরত আসমা বিন্ত আবূ বক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার (হযরত) আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) কবি লবীদ (রা)-এর এই পংক্তি দু'টি আবৃত্তি করলেন ঃ

اَخٌ لِىْ اَمَّا كُلُّ شَىْءٍ سَاَلْتُهُ + فَيُعْطِىْ وَاَمَّا كُلُّ ذَنْبٍ فَيَغْفِرُ -

"আমার এক ভাই আছে, আমি যদি তাঁর কাছে কিছু চাই, তিনি তা তৎক্ষণাৎ আমাকে দিয়ে দেন এবং সব দোষক্রটি ক্ষমা কর দেন।" এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ গুণেই গুণান্বিত ছিলেন।

ফায়দা ঃ হযরত লবীদ (রা) জাহিলিয়াত যুগের বিখ্যাত কবিদের অন্যতম। তাঁর নাম **লবীদ** ইব্ন রাবীআ ইব্ন মালিক। বানূ কিলাব প্রতিনিধি দলের সাথে তিনি নবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কাব্যচর্চা ত্যাগ করেন। (মাআরিফে ইব্ন কুতায়বা, পৃষ্ঠা-৩৩২)। অপর এক হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ লবীদের সবচেয়ে সত্য কবিতা হচ্ছে এটি ঃ

اَلاَ كُلُّ شَىْءٍ مَاخَلاَ اللّٰهِ بَاطِل + وَكُلُّ نَعِيْمٍ لاَمَحَالَةَ زَائِلُ -

জেনে রাখো, আল্লাহ্ ছাড়া সব জিনিসই বাতিল ও মিথ্যা আর দুনিয়ার সব নিয়ামতই নিশ্চিত বিলীয়মান। (বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১০৮)

নবী ﷺ হযরত লবীদ (রা)-এর কবিতা খুব পছন্দ করতেন। কেননা, তাঁর কবিতায় প্রায়শ আল্লাহ্র তাওহীদ, রিসালাত, কিয়ামত, পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি উল্লেখিত হতো।

গ্রন্থকার এ হাদীসটি নবী ﷺ -এর দানশীলতা ও বদান্যতা অনুচ্ছেদে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, হযরত লবীদ (রা) তাঁর এই কবিতায় তাঁর মামদূহ্ বা প্রশংসিতের দানশীলতা ও বদান্যতার আলোচনা করেছেন। তাই হযরত আবূ বক্র (রা) এই কবিতাটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর উদ্দেশ্যে আবৃত্তি করেন। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ দানশীলতা ও বদান্যতা গুণের এই মানদণ্ডে পুরোপুরি উত্তীর্ণ ছিলেন।

مَاذُكِرَ مِنْ شُجَاعَتِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর সাহসিকতা ও বীরত্ব

٩٩ . عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ يَوْمَ بَدْرٍ وَنَحْنُ نَلُوْذُ بِالنَّبِيِّ ﷺ هُوَ اَقْرَبُنَا اِلَى الْعَدُوِّ وَكَانَ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ بَأْسًا -

৯৯. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, আমরা নবী ﷺ -এর আশেপাশে আশ্রয় খুঁজছিলাম। আর তিনি আমাদের সকলের তুলনায় শক্রদের বেশি কাছাকাছি পৌছে মুকাবিলা করে যাচ্ছেন। বদরের সেদিন তাঁরই বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল সর্বাধিক।

ফায়দা ঃ চরিত্র বিশারদদের সকলে এ মর্মে একমত যে, মানব চরিত্রের সবচেয়ে বড় উপাদান হলো বীরত্ব। মানুষের যাবতীয় সদ্‌গুণ বীরত্বের এই ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠে। বীরত্বের কারণে মানুষ নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, দরদ ও অনুকম্পা, হিম্মত, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সত্য প্রকাশে নির্ভীকতা ইত্যাকার মহৎ ও উন্নত চরিত্র মাধুরী অর্জনে সক্ষম হয়। কাপুরুষ ও মনোবলহীন লোকেরা কোন কৃতিত্বের কাজ সম্পাদনে যেমন অনুপযুক্ত তেমনি নৈতিকতার মানদণ্ডেও সে হীনবল বিবেচিত হয়ে থাকে। সে মানবীয় সদ্‌গুণাবলি ও উন্নত চরিত্র থেকে হয় বঞ্চিত। পক্ষান্তরে যাঁরা সাহসী ও বীর পুরুষ তাঁরা সর্বদা আত্মপ্রত্যয়ী, নীতিবান, সত্যভাষী, দৃঢ় চরিত্র, ধৈর্যশীল, গম্ভীর ও ক্ষমাপরায়ণ থাকেন। এভাবে দানশীলতা, বদান্যতা, মেহমানদারী, পরোপকার ইত্যাদি সাহসী মানুষদেরই বিশেষণরূপে পরিচিত।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ সাহসিকতা ও বীরত্বের ক্ষেত্রেও ছিলেন মানুষের মধ্যে সকলের উর্ধ্বে। তিনি অবিচলতা ও অফুরন্ত দৃঢ়তার অধিকারী ছিলেন। জিহাদ ও রণক্ষেত্রে প্রদর্শিত তাঁর বীরত্বের বহু ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কখনো কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখে তিনি হিম্মত হারাতেন না। চরিত্রের দৃঢ়তা ও অসীম সাহসিকতা বুকে নিয়ে যাবতীয় পরিস্থিতির মুকাবিলা করে যেতেন। হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের লোকেরা মুসলিম বাহিনীর উপর বৃষ্টির ন্যায় তীরবর্ষণ শুরু করে। তীরন্দাজদের প্রবল আক্রমণে সাহাবীদের বহু সংখ্যক তখন মনোবল হারিয়ে ফেলেন এবং রণক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে পড়েন। অথচ প্রিয় নবী ﷺ তখন রণক্ষেত্রে অটল দণ্ডায়মান। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ছিলেন কেবল কয়েকজন জানবাজ সাহাবী। তাঁরা সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় তাঁকে ঘিরে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন। এ কঠিনতম মুহূর্তে তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হননি বরং সীমাহীন সাহসিকতা ও বীরত্ব নিয়ে সঙ্গীদের মনোবল ও হিম্মত বৃদ্ধি করতে থাকেন। সামান্যতম পিছে না হটে যথারীতি কাফিরদের সঙ্গে মুকাবিলা চালিয়ে যান।

অনুরূপ একবার তিনি একটি বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন অতর্কিতভাবে জনৈক কাফির যোদ্ধা সম্মুখে এসে তরবারি তাক করে দাঁড়ায়। লোকটি প্রিয় নবী ﷺ-এর ঠিক মাথা মুবারকের বরাবর দাঁড়িয়ে বলল, হে মুহাম্মদ! এবার আমার হাত থেকে তোমাকে কে বাঁচাবে ? প্রিয় নবী ﷺ ভয়ভীতি বিহীন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঃ আল্লাহ্। তাঁর এই নির্ভীকতা দেখে ও বীরত্বপূর্ণ উত্তর শুনে লোকটির হৃদকম্পন শুরু হলো এবং তার হাত থেকে তাক করা তরবারি মাটিতে পড়ে গেল। (সহীহ্ বুখারী, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৫৯২)। প্রিয় নবী ﷺ-এর জীবনে এ ধরনের আরো বহু ঘটনা ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে বিদ্যমান। এ সকল ঘটনার আলোকে তিনি যে কতখানি সাহসিকতা ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন তা সুস্পষ্ট বোঝা যায়।

١٠٠. عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمَا يَكُوْنُ اَحَدٌ اَقْرَبَ اِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ ﷺ

১০০. হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রণক্ষেত্রে যুদ্ধ যখন ঘোরতর আকার ধারণ করত এবং একদল অন্যদলের মুখোমুখি হয়ে লড়াই শুরু করত, তখন আমরা নবী ﷺ-এর চতুষ্পার্শ্বে আশ্রয় খুঁজতাম। আমাদের মধ্যে কেউ শত্রুপক্ষের মুকাবিলায় নবী ﷺ-এর চেয়ে অগ্রবর্তী থাকত না (অর্থাৎ তিনি মুকাবিলায় সকলের অগ্রবর্তী থাকতেন)।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসটিও প্রিয় নবী ﷺ -এর অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের কথা প্রকাশ করছে। কেননা কাফিরদের সঙ্গে যখন মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হতো এবং একদল অন্যদলের মুখোমুখি হয়ে লড়াই শুরু করত, তখন শত্রুপক্ষের সংখ্যাধিক্য এবং নিজেদের যুদ্ধ উপকরণের অপ্রতুলতা দেখে এই গুটিকতক নিরস্ত্র মুসলমান সৈন্যদের মনে ভীতির উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বিশেষত যে সকল যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর হাতে যুদ্ধ সরঞ্জাম বলতে কিছুই ছিল না। তখন যে কোন তেজস্বী, বাহাদুর ব্যক্তিরও শংকিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। অথচ প্রিয় নবী ﷺ-এর মনোবল এমন মুহূর্তগুলিতেও কেবল দৃঢ় থাকতো তাই নয় বরং নিজে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সঙ্গে তরবারি নিয়ে কাফিরদের সারির ভিতর ঢুকে পড়তেন। তখন মুসলিম সৈনিকদের অন্যরাও প্রিয় নবী ﷺ -এর কাছাকাছি আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করতেন। কতিপয় হাদীসের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় ঘোররত লড়াইয়ের তোড়ে লোকজন দূরে হটে যেত। এ মুহূর্তে যাঁরা প্রিয় নবী ﷺ -এর সঙ্গে ও কাছাকাছি থাকতেন সাহাবীদের মধ্যে তাঁদেরকে বীর সেনানী বলে বিবেচনা করা হতো।

١٠١. عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ الثُّمَالِيْ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَلِيْلَ الْكَلَامِ قَلِيْلَ الْحَدِيْثِ فَلَمَّا اُمِرَ بِالْقِتَالِ تَشَمَّرَ وَكَانَ مِنْ اَشَدِّ النَّاسِ بَأْسًا -

১০১. হযরত সাদ ইব্ন ইয়ায সামালী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্বভাবত ছিলেন বাকসংযমী ও মিতভাষী। কিন্তু যখন তিনি যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হতেন তখন এমনভাবে প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন যে তাঁকে সর্বাধিক বলিষ্ঠ যোদ্ধা ও সাহসী বলে দেখা যেত।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ -এর দু'টি গুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এক. মিতভাষী হওয়া, দুই. সাহসী ও বাহাদুর হওয়া। মিতভাষী হওয়া মানব জীবনে অন্যতম সদ্‌গুণ। অথচ অতিশয় সহজলভ্য একটি আমল। একখানা হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমি কি তোমাদের অত্যন্ত হালকা ও সহজলভ্য একটি আমলের কথা জানাবো ? সে আমলটি হলো নীরব থাকা এবং চরিত্রবান হওয়া। (তারগীব ওয়া তারহীব, খ. ৪, পৃষ্ঠা ৩২১)

বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে প্রিয় নবী ﷺ-এর স্বল্পভাষী হওয়া সম্পর্কীয় আরো বহু রিওয়ায়াত বিদ্যমান। এ সব রিওয়ায়াতের আলোকে বোঝা যায় যে, মিতভাষী হওয়াও মানব চরিত্রের অন্যতম সদ্‌গুণ। চরিত্র বিশারদ ও দার্শনিকদের কেউই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন না।

গ্রন্থকার এখানে প্রিয় নবী ﷺ -এর সাহসিকতা ও বীরত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কেননা হাদীসখানার শেষ বাক্যটি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, প্রিয় নবী ﷺ -কে যখনই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে কোন জিহাদ বা যুদ্ধের জন্য আদেশ করা হতো তখনই তিনি কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতিরেকে অতিশয় বীরত্ব ও সাহসিকতাসহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। আবার রণক্ষেত্রেও তিনি সবচেয়ে অধিক সাহসী ও বীর ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণিত হতেন।

١٠٢. عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا وَاللّٰهِ اِذَا احْمَرَّ الْبَاْسُ نَتَّقِيْ بِهٖ يَعْنِيْ النَّبِيَّ ﷺ وَاِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا الَّذِيْ يُحَاذِيْ بِهٖ -

১০২. হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! যখন আমাদের যুদ্ধ ভয়ানক আকার ধারণ করত, তখন আমরা প্রিয় নবী ﷺ -এর কাছে এসে আশ্রয় নিতাম। আর আমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিকেই সবচেয়ে বড় সাহসী ও বীর বলে গণ্য করা হতো যিনি যুদ্ধকালে প্রিয় নবী ﷺ-এর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন।

ফায়দা ঃ প্রিয় নবী ﷺ -এর চরিত্রে যেভাবে অন্যান্য অতুলনীয় যোগ্যতা ও গুণাবলি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল তেমনি সাহসিকতা ও বীরত্বও ছিল অতুলনীয় ও অসীম। বড় বড় যুদ্ধগুলিতে এবং যুদ্ধ জীবনের চরম আতংকের মুহূর্তগুলোর মধ্যেও তিনি এতখানি দুঃসাহসিকতার প্রমাণ দিয়েছিলেন যে, যখন বীর বাহাদুর সাহাবীগণ পর্যন্ত হিম্মতহারা হয়ে যাচ্ছিলেন এবং নিজেরা কোন আশ্রয়ের তালাশ শুরু করেছিলেন। সে মুহূর্তে সকলে তাঁর আশ্রয় পেয়ে পুনর্বার যুদ্ধ চালানোর হিম্মত লাভ করতেন। তা ছাড়া সাহাবীদের মধ্যে তখন তাঁকেই সবচেয়ে শক্তিশালী বীর বলে জ্ঞান করা হতো, যিনি নবী ﷺ -এর আশ্রয়ে থেকে যুদ্ধ চালনায় দৃঢ় থাকতে সক্ষম হতেন।

١٠٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرَسًا لِاَبِيْ طَلْحَةَ فَقَالَ مَا رَاَيْنَا مِنْ شَيْءٍ وَاِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا -

১০৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদীনা শরীফের (এর উপর শত্রুরা অতর্কিত হামলা চালিয়েছে বলে গুজব রটেছিল। ফলে) সর্বত্র ভয় ও আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় নবী ﷺ হযরত আবূ তালহা (রা)-এর ঘোড়ার উপর সওয়ার হন (এবং শত্রুদের গতিবিধি জানার জন্য সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় তিনি বেরিয়ে পড়েন। এভাবে পরিস্থিতি সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল হওয়ার পর তিনি যখন ফিরে আসেন

তখন) বলেন ঃ আমি তো এখানে ভয়ের কিছুই দেখিনি। আমি আবূ তালহার ঘোড়াটিকে সমুদ্রের মত দ্রতগতিসম্পন্ন পেলাম।

ফায়দা ঃ এই হাদীসসহ সম্মুখে আরো দু'টি হাদীস আসছে, সবগুলোর মূল বক্তব্য অভিন্ন। ঘটনাটি ছিল এমন যে, একবার মদীনা শরীফের সর্বত্র সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল যে, শত্রুরা মদীনার উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এ সংবাদ খুব দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষকে দারুণ আতংকের মধ্যে ফেলে দেয়। ভয়ের আতিশয্যে কেউ এগিয়ে পরিস্থিতির সঠিক পর্যবেক্ষণের হিম্মতটুকুও পাচ্ছিল না। কিন্তু প্রিয় নবী ﷺ এ আতংকের কোন পরোয়া করেননি। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরত আবূ তালহা (রা)-এর ঘোড়াটি নিয়ে পরিস্থিতির সঠিক পর্যবেক্ষণের জন্য সম্মুখের দিকে সম্পূর্ণ একাকী ছুটে চললেন। নবী ﷺ দ্রুতগামী এ ঘোড়াটি নিয়ে মদীনা শরীফের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে যান। কিন্তু কোথাও শত্রুদের আক্রমণের কোন চিহ্ন দেখতে পাননি। তিনি বুঝলেন এটি সম্পূর্ণ গুজব। কাজেই তিনি ফিরে আসলেন এবং লোকজনকে সান্ত্বনা ও অভয় দিয়ে বললেন ঃ তোমরা ভয় পেয়ো না। এখানে আমি আতংকের কিছুই দেখিনি। অতঃপর নবী ﷺ আবূ তালহার ঘোড়ার প্রশংসা করে বললেন ঃ এই ঘোড়াটি সমুদ্রের মত অত্যন্ত বেগবান ও দ্রুতগতি সম্পন্ন।

١٠٤. عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَسًا كَاَنَّهُ مُقْرَفٌ فَرَكَضَهُ فِىْ اٰثَارِهِمْ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا

১০৪. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদীনা শরীফের অধিবাসীরা (শত্রুদের আক্রমণ শুরু হয়ে গেছে এই গুজবে) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। নবী ﷺ তৎক্ষণাৎ জীর্ণশীর্ণ দুর্বল একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেন। তিনি এটিকে দ্রুত আক্রমণকারীদের দিকে ছুটিয়ে নিলেন। অবশেষে ফিরে এসে বললেন, আমি এটিকে সমুদ্রের মত বেগবান পেলাম (অথচ তোমরা একে দুর্বল ও ধীরগতি সম্পন্ন বলছ)।

١٠٥. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ مَا لَقِىَ النَّبِىُّ ﷺ اِلاَّ كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَضْرِبُ

১০৫. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন শত্রুবাহিনীর সঙ্গে নবী ﷺ -এর যখন মুকাবিলা হতো তখন যুদ্ধে তিনিই থাকতেন প্রথম আক্রমণকারী।

ফায়দা ঃ কাফির, মুশরিক ও আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলনের কাজেও প্রিয় নবী ﷺ থাকতেন সবার অগ্রে। প্রিয় নবী ﷺ-এর এই ভূমিকা গ্রহণ তাঁর অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় বহন করে। তা ছাড়া তিনি মানসিকভাবে কতখানি দৃঢ়চেতা ও প্রবল শক্তিমান ছিলেন বর্ণিত হাদীস থেকে এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

١٠٦. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَشْجَعِ النَّاسِ وَأَسْمَحِ النَّاسِ -

১০৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন অসীম সাহসী ও সর্বোচ্চ দানশীল ব্যক্তি।

ফায়দা ঃ উল্লিখিত হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ-এর বিশেষ মানের দু'টি সদ্‌গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হলো, তাঁর সীমাহীন বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা। আর অপরটি হলো পরম দানশীলতা ও বদান্যতা। দার্শনিক ও চরিত বিশারদদের সকলে এ মর্মে একমত যে, এই বীরত্ব ও দানশীলতা একটি অপরটির অনিবার্য ফলশ্রুতি।

١٠٧. عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَسْمَحَ النَّاسِ -

১০৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সুপুরুষ, সর্বাধিক সাহসী ও সবচেয়ে বেশি দয়া-দাক্ষিণ্যের অধিকারী।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ-এর তিনটি উল্লেখযোগ্য বিশেষণের কথা বলা হয়েছে। এক. তাঁর অতুলনীয় শারীরিক সুগঠন ও সৌন্দর্য, দুই. তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা, তিন. তাঁর দানশীলতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য। কোন সন্দেহ নেই যে, প্রিয় নবী ﷺ -এর পবিত্র সত্তা নবূওয়াতের ক্ষেত্রে যেমন সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত শিখরে অধিষ্ঠিত ছিল, তেমনি তাঁর এ সত্তা নীতিপরায়ণতা ও উন্নত চরিতাদর্শের ক্ষেত্রেও ছিল সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত। এ মাকাম তথা মর্যাদা শুধুমাত্র তাঁর জন্যই। কারোর পক্ষে এতখানি উচ্চে আরোহণ কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর উন্নত অনুপম চরিতাদর্শ অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন।

١٠٨. عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ صَيْحَةٌ بِالْمَدِيْنَةِ، فَرَكِبَ النَّبِىُّ ﷺ فَرَسًا لِاَبِىْ طَلْحَةَ، فَأَجْرَاهُ سَاعَةً ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ مَارَأَيْنَا مِنْ شَىْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا -

১০৮. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার মদীনা শরীফের উপর শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ল। প্রিয় নবী ﷺ

তৎক্ষণাৎ হযরত আবূ তালহা (রা)-এর একটি ঘোড়ায় আরোহণ করেন এবং এক ঘন্টা পর্যন্ত ঘোড়াটিকে এদিক-ওদিক ছুটিয়ে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করেন। অবশেষে (ঘটনার প্রকৃত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে) ফিরে এসে বললেন, আমি কিছুই দেখলাম না। (ভয়ের কিছুই নেই) তবে আমি এ ঘোড়াটিকে (গতিশীলতার দিক থেকে) সমুদ্রের ন্যায় পেলাম।

١٠٩. عَنْ اَبِىْ جَعْفَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَدِيْدَ الْبَطَشِ -

১০৯. হযরত আবূ জাফর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কঠোর পাকড়াওকারী ছিলেন।

ফায়দা ঃ আলোচ্য হাদীসের আলোকেও বোঝা যায় যে, প্রিয় নবী ﷺ যেমন সাহসিকতা ও বীরত্বের অধিকারী ছিলেন তেমনি শারীরিকভাবেও তিনি অতিশয় শক্তিশালী ও সবল ছিলেন। একখানা হাদীসে তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেন ঃ আমাকে চল্লিশ জন মানুষের সমান শক্তি প্রদান করা হয়েছে। আর এ কারণেই কঠিন থেকে কঠিন কিংবা শক্ত থেকে শক্ততর কোন কাজ যা সাহাবীদের কারোর পক্ষে সম্ভব হতো না সেটি তিনি অনায়াসেই করে দিতে পারতেন। পরবর্তী ১১১ নং হাদীস থেকেও প্রিয় নবী ﷺ-এর এহেন অতুলনীয় শক্তিমত্তা ও দৈহিক ক্ষমতার প্রমাণ মেলে।

١١٠. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتّٰى وَارَى الْغُبَارُ شَعْرَ صَدْرِهِ وَرَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَرْتَجِزُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُمْ يَحْفِرُوْنَهُ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتّٰى وَارٰى جِلْدَةَ بَطْنِهِ -

১১০. হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজে মাটি বহন করেছেন আর ধুলায় তাঁর বুকের পশমগুলি ঢেকে গিয়েছিল। তিনি বলেন, আমি আরো দেখেছি যে, খন্দকের সে দিন প্রিয় নবী ﷺ উদ্দীপনাবর্ধক কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। আর সাহাবীগণ পরিখা খনন করে যাচ্ছেন। এ সময় তিনিও অন্যদের সঙ্গে মাটি বহন করেছেন। এমনকি বালির কারণে তাঁর পেটের চামড়া আবৃত হয়ে গিয়েছিল।

ফায়দা ঃ এ ঘটনাটি হলো খন্দক যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের। আলোচ্য হাদীসের উল্লেখের দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো প্রিয় নবী ﷺ-এর সীমাহীন মনোবলের কথা প্রমাণ করা এবং আল্লাহ্র পথে কঠিন থেকে কঠিনতর ও তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর কোন কাজ সম্পাদন করতে তিনি কতখানি দৃঢ়চেতা ও সাহসী ছিলেন তা তুলে ধরা।

١١١. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَكَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ ثَلَاثًا مَا ذَاقُوْا طَعَامًا فَقَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ هٰذِهٖ كِدْيَةٌ - مِنَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُشُّوْهَا بِالْمَاءِ فَرَشُّوْهَا ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخَذَ الْمِعْوَلَ اَوِ الْمِسْحَاةَ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ ثُمَّ ضَرَبَ ثَلَاثًا فَصَارَ كَثِيْبًا يُهَالُ، قَالَ جَابِرٌ فَحَانَتْ مِنِّى الْتِفَاتَةٌ فَرَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَدْ شَدَّ بَطْنَهُ بِحَجَرٍ -

১১১. হযরত জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (খন্দকের যুদ্ধ চলাকালে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ তিন দিন পর্যন্ত অনাহারক্লিষ্ট অবস্থায় পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত থাকলেন। (তখন অতিশয় শক্ত ও বিশাল আয়তনের একটি পাথর খোদাই কাজের মুখে বেরিয়ে আসে) সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি পর্বতের একটি মস্তবড় পাথর। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন ঃ তোমরা পাথরটির উপর পানি ছিটিয়ে দাও। সেমতে তাঁরা পানি ছিটিয়ে দিলেন। তারপর প্রিয় নবী ﷺ তাশরীফ আনেন। তিনি কোদাল বা হাতুড়ি হাতে নিয়ে 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ করেন এবং পাথরের উপর তিনবার আঘাত হানেন। ফলে অতিশয় শক্ত পাথরটি এত নরম হয়ে গিয়েছিল যে, আঘাতের দরুন ফেটে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে বালির ন্যায় ঝরে পড়ে গেল। হযরত জাবির (রা) বলেন, এ সময় হঠাৎ আমার দৃষ্টি নবী ﷺ-এর পেট মুবারকের উপর গিয়ে পড়ল। আমি দেখলাম যে, তিনি (ক্ষুধার আতিশয্যে) পেটের উপর পাথর বেঁধে রেখেছেন।

ফায়দা ঃ আলোচ্য ঘটনাটিও খন্দকের যুদ্ধ প্রস্তুতিকালে ঘটেছিল। ইতিহাসে এ যুদ্ধকে আহ্যাবের যুদ্ধ নামেও অভিহিত করা হয়েছে। হিজরী ৫ বর্ষের যিল্কাদ মাসে এ যুদ্ধ শুরু হয়। প্রিয় নবী ﷺ তখন মদীনা শরীফেই অবস্থানরত ছিলেন। আরবের সকল গোত্রের মুশরিক ও ইয়াহূদীরা সকলে সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এবং পবিত্র মদীনা নগরী অবরোধ করে নেয়। শত্রু বাহিনীর সংখ্যা ছিল ছয় সহস্রাধিক। প্রিয় নবী ﷺ অবরোধের সংবাদ পেয়ে সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা) ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। তিনি নগর রক্ষার স্বার্থে তখন পরিখা খননের পরামর্শ দিয়ে বলেন, এমনি জটিল মুহূর্তে ইরানী যোদ্ধারা সাধারণত পরিখা খননের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। সে মতে মদীনা নগরীর অদূরে মুসলিম সৈন্যগণ এক জায়গায় জমায়েত হন। তাঁরা পরামর্শ মোতাবেক পরিখা খননের কাজ শুরু করেন। মুসলমানদের মধ্যে সে মুহূর্তে খুব অভাব-অনটন বিরাজিত ছিল। দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলমানগণ তিনদিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ অনাহারে কাটান, মুখে দেয়ার মত সামান্য রসদও তাদের হাতে ছিল না। কারণ শত্রু সৈন্যরা ইতিপূর্বেই মদীনা শরীফ অভিমুখে রসদ পৌঁছার সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। এদিকে পরিস্থিতি নাজুক বিধায় দ্রুত পরিখা খননের কাজ সমাপ্ত করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবে অবরোধ ও খণ্ডযুদ্ধ প্রায় এক মাস যাবত অব্যাহত থাকে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্ অদৃশ্য পথে মুসলমানদের সাহায্য করেন। হঠাৎ খুব শক্তিশালী একটি বায়ুর ঝড় নেমে আসে এবং অবরোধকারী আগ্রাসী বাহিনীর সমুদয় সাজ-সরঞ্জাম উড়িয়ে নিয়ে যায়। ফলত শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে যায় এবং তারা পলায়নের পথ অবলম্বন করে। আর মু'মিনগণ তাদের আক্রমণ থেকে রেহাই পেয়ে যান।

গ্রন্থকার আলোচ্য অংশে প্রিয় নবী ﷺ-এর শক্তিমত্তা ও দৈহিক ক্ষমতা এবং সাহসিকতা ও বীরত্বের আলোচনা করছেন এবং এতদুদ্দেশ্যেই উপরোক্ত হাদীসখানা অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করেন। কেননা হাদীসটির মধ্যে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, মস্তবড় যেই পাথরটি খোদাই পথে পড়েছিল, সেটিকে অন্যরা কোনক্রমেই ভাঙতে সক্ষম হয়নি। সেটি তিনি শক্তিবলে ভেঙে ফেলেন। তিনি কোদাল হাতে নিয়ে মাত্র তিনবার সজোরে আঘাত করেছিলেন। আর পাথরটি বালির ন্যায় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা থেকে তাঁর দৈহিক শক্তিমত্তা সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

একটি বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, প্রিয় নবী ﷺ স্বয়ং ইরশাদ করেছেন যে, আমাকে চল্লিশ জন বেহেশ্তী মানুষের সম-পরিমাণ শক্তি প্রদান করা হয়েছে। (তাবারানী, সূত্র-ইত্তেহাফুস সাদাহ্, খ. ৭, পৃষ্ঠা ১৪১)

١١٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَرَكِبَ فَرَسًا لِأَبِىْ طَلْحَةَ عَرِيًا فَخَرَجَ النَّاسُ فَاِذَاهُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْخَبَرَ وَهُوَ يَقُوْلُ لَنْ تَرَاعُوْا وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَلَقَدْ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ۔

১১২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপুরুষ, সর্বাধিক সাহসী ও সর্বোচ্চ দয়া-দাক্ষিণ্যের অধিকারী। (একবার একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ার দরুন) মদীনা শরীফের লোকজন আতংকিত হয়ে উঠেছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তৎক্ষণাৎ হযরত আবূ তালহা (রা)-এর ঘোড়ায় গদি ব্যতিরেকেই সওয়ার হন এবং দ্রুতগতিতে সম্মুখে অগ্রসর হন। অবস্থা দৃষ্টে লোকজনও রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তখন তারা দেখলো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের পূর্বেই গুজবটি যে দিক থেকে আসছিল সে দিক থেকে পর্যবেক্ষণ শেষ করে ফিরে আসছেন। প্রিয় নবী ﷺ লোকজনকে বললেন ঃ তোমরা ভয় পেয়ো না। তিনি আরো বললেন ঃ আমি ঘোড়াটিকে সমুদ্রের ন্যায় দ্রুতগামী পেলাম অথবা তিনি বলেছেন ঃ এটি সমুদ্রের মত (বেগবান)।

ফায়দা ঃ সহীহ্ বুখারীতে একাধিক স্থানে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসের শব্দমালায় কিছু ভিন্নতা বিদ্যমান।[১]

আলোচ্য হাদীসের আলোকেও প্রিয় নবী ﷺ-এর অসীম সাহসিকতা, বীরত্ব ও নির্ভীকতার প্রমাণ পাওয়া যায়। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া আতংকের এ মুহূর্তে যখন যে কোন সময়ে মদীনার উপর শত্রুদের আক্রমণ চালানোর আশংকা বিদ্যমান, তাছাড়া শত্রুপক্ষ কোন দিক থেকে কতটুকু প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণ শুরু করছে তাও অজানা এমন এক নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে প্রিয় নবী ﷺ-এর সম্পূর্ণ একাকী অবস্থায় অনুসন্ধানের জন্য সম্মুখে বেরিয়ে যাওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর অসীম সাহসিকতার প্রমাণ বহন করে।

এ হাদীসের মধ্যেও প্রিয় নবী ﷺ-এর উল্লেখযোগ্য তিনটি সদ্গুণের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ বিশেষণত্রয় হলো মানুষের যাবতীয় সদ্গুণের আধার। কেননা প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে তিনটি প্রকৃতিগত শক্তি বিদ্যমান থাকে। যথা ১. অনুকম্পা শক্তি, ২. ক্রোধশক্তি ও ৩. বিবেচনা শক্তি। ক্রোধ শক্তির পূর্ণতা দ্বারা ব্যক্তির মধ্যে সাহসিকতা ও বীরত্বের গুণ সৃষ্টি হয়। অনুকম্পা শক্তির পূর্ণতার কারণে ব্যক্তি দানশীলতা ও বদান্যতার গুণে গুণান্বিত হয়। আর বিবেচনা শক্তির পূর্ণতা অর্জনের ফলে ব্যক্তির মাঝে নৈপুণ্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ঘটে। প্রিয় নবী ﷺ-এর চরিত্রে উল্লিখিত সব কয়টি শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই শক্তিগুলি থেকে উদ্ভূত গুণগুলিও ছিল তাঁর চরিত্রে পরিপূর্ণ। দার্শনিকগণ লিখেছেন, যে ব্যক্তির প্রকৃতির মধ্যে উদ্ভূত শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান তিনি দৈহিক গঠন ও রূপ সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ মানের হবেন। কারণ বিবেচনা শক্তি ও দৈহিক সুগঠন একটি অপরটির জন্য অনিবার্য উপাদান।

١١٣. عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُوْنَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَمَارُئِيَ فِى النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ كَانَ أَشَدَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ۔

১১৩. হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুশরিকদের সৈন্য বাহিনী যখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল তখন তিনি নিজের বাহন থেকে অবতরণ করেন এবং বলতে লাগলেন, أَنَا النَّبِيُّ لاَكَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ কোন সন্দেহ নেই আমি সত্য নবী, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। বর্ণনাকারী বলেন, সে দিন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এমন একজনও ছিল না যাকে প্রিয় নবী ﷺ-এর তুলনায় অধিক সাহসিকতার অধিকারী বলা যায়।

---

১. হুসনুল খুলুক ওয়াস সাখা অধ্যায়, খ. ২, পৃষ্ঠা ৮৯১, আশ্ সাজায়াতু ফীল হারব ওয়াল জুবন অধ্যায়, খ. ১, পৃষ্ঠা ৩৯৫, ইযা ফাযিউ বিল লাইল অধ্যায়, খ. ১, পৃষ্ঠা ৪১৭।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসটি হুনাইনের যুদ্ধ সম্পর্কিত। এ যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ দল নিজেদের ব্যূহ থেকে অতর্কিতভাবে মুসলমানদের উপর তীরের বৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল। ফলে অধিকাংশ সাহাবী আহত ও শংকিত হয়ে পড়েন। তাঁদের কদম বিচলিত হয়ে যায় এবং তাঁরা রণক্ষেত্র থেকে পিছু হটে যান। কিন্তু সেই উন্মুক্ত রণক্ষেত্রে নবী ﷺ স্বস্থান থেকে বিন্দুমাত্র হটেননি। তিনি সওয়ারী থেকে দ্রুত অবতরণ করে নিকটস্থ জানবায সাহাবীদেরকে নিয়ে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তিশালী মুকাবিলা চালিয়ে যান। এ মুহূর্তে প্রিয় নবী ﷺ-এর কণ্ঠ থেকে নিম্নের তেজোদ্দীপক জোশপূর্ণ বাক্যটি বেরিয়ে এসেছিল ঃ

"أَنَا النَّبِيُّ لَاكَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ" "আমি বরহক ও সত্য নবী, আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান।" বলা বাহুল্য, এটি হলো বীরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নীতি। তাঁরা জটিল ও নাজুক কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে অন্যদের মনেও আবেগের সঞ্চার করার লক্ষ্যে এ ধরনের তেজোদ্দীপক বাক্য আবৃত্তি করে থাকেন। আর এ কারণেই ইসলামী শরীয়তে সমর সঙ্গীত আবৃত্তি করা ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের বংশগৌরব প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

مَاذُكِرَ مِنْ تَوَاضُعِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর নম্রতা ও বিনয়

١١٤. عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْمِى الْجَمْرَةَ عَلَى نَاقَةٍ شَهْبَاءَ لَاضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ ـ

১১৪. হযরত কুদামা ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে (হজ্জের মৌসুমে) খাকী বর্ণের একটি উটনীর উপর সাওয়ার হয়ে (আকাবায়) কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। (তিনি এভাবে কংকর নিক্ষেপের জন্য গিয়েছেন যে, লোকজনকে তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকার জন্য) না কোন মারপিট ছিল আর না কোন প্রকারের হাঁকডাক। অনুরূপ 'এদিকে যাও' 'ওদিকে সর' এ সব কথাও বলা হয়নি।

ফায়দা ঃ এ অনুচ্ছেদে প্রিয় নবী ﷺ-এর বিনয় ও নম্রতা বিষয়ক হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লিখিত প্রথম হাদীসের থেকে তাঁর পূত-পবিত্র চরিত্রে পরম বিনয় নীতির প্রকাশ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা প্রিয় নবী ﷺ তখন একই সঙ্গে গোটা বিশ্বের পথপ্রদর্শক ও সকল নবীর সর্দার হওয়ার পাশাপাশি সমকালীন প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্তা ব্যক্তিও ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁর চাল-চলনে সর্বোচ্চ কর্তাসুলভ আচরণে কোন ভিন্নতা দেখা যায়নি। হজ্জের মৌসুমে হাজীদের প্রচণ্ড ভিড় থাকে। উপরন্তু তাঁদের অধিকাংশই থাকেন এমন চরিত্রের যারা

নাগরিক রীতি-নীতি সম্পর্কে অসচেতন ও অনভ্যস্ত। এমন পরিস্থিতিতে একজনের শরীরে অন্যজনের শরীরের ধাক্কা লাগা, ভিড়ের চাপে কেউ নিচে পড়ে যাওয়া মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে প্রিয় নবী ﷺ নিজের মর্যাদা বা মান-সম্মান বজায় রাখার উদ্দেশ্যে পৃথক কোন ব্যবস্থাই নেননি। তিনি সাধারণ হাজীদের সঙ্গে মিশে হজ্জের কাজকর্ম সম্পাদন করে যান। তাঁর আগমন উপলক্ষে রাস্তায় পথচারীদের না আসা-যাওয়া বন্ধ করা হয়েছিল, আর না তাঁর সম্মান প্রদর্শনার্থে পথচারীদেরকে 'সর' কিংবা 'দূরে থাক' ইত্যাদি বলা হয়েছিল। মোটকথা প্রিয় নবী ﷺ নিজের প্রাধান্য প্রদর্শনের কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি।

এভাবে প্রিয় নবী ﷺ-এর নম্রতা ও বিনয় সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, তিনি মক্কা শরীফে যখন অসহায় ও শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় কালাতিপাত করছিলেন। ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন ব্যতিরেকে তাঁর অন্য কোন পথ ছিল না। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে ইখতিয়ার দিয়ে বলেছিলেন ঃ হে নবী! আপনার অভিমত কি ? আপনি কি বাদশাহী সংযুক্ত নবূওয়াত পেতে চান, আর না আবদিয়্যাত সংযুক্ত নবূওয়াত ? প্রিয় নবী ﷺ নিজের পরম বিনয় প্রকাশ করে বাদশাহীর পরিবর্তে আবদিয়্যাত সংযুক্ত নবূওয়াত লাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন এবং নিজের জন্য অভাব-অনটনের পথ বেছে নেন। অথচ নবূওয়াতের সঙ্গে বাদশাহীর সংযুক্ত প্রার্থনা করতে কোন বাধা ছিল না। তাঁর সম্মুখে হযরত সুলায়মান (আ) -এর উদাহরণও বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া এই বাদশাহী গ্রহণ নবূওয়াতের দায়িত্ব পালনের পথে কোন প্রতিবন্ধক বলেও বিবেচিত হতো না। কিন্তু 'রাহ্‌মাতুললিল্ আলামীন ﷺ নিজের স্বভাবজাত চাহিদার নিরিখে বাদশাহীর উপর আবদিয়্যাতকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ কারণেই একাধিক হাদীসে পাওয়া যায় যে, এর পর প্রিয় নবী ﷺ কখনো হাতের উপর বা পিঠের উপর ভর করে বসে পানাহার করেননি। স্বয়ং ইরশাদও করেছেন ঃ আমি একজন নগণ্য বান্দা হিসাবে বসি, একজন ক্রীতদাস যেভাবে আহার করে আমিও সেভাবে আহার করি।

নম্রতা ও বিনয়ের এ নীতির কারণে প্রিয় নবী ﷺ কখনো কোন খাদেম বা কাজের লোককে কোন ভুলের কারণে প্রহার করতেন না। আর কখনো বকাঝকাও দিতেন না। একটি হাদীসে এতটুকুও বলা হয়েছে যে, হযরত উমর (রা) বলেন, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, আমার প্রশংসা করতে গিয়ে তোমরা খৃস্টানদের মত বাড়াবাড়ি করো না। খৃস্টানরা তাদের নবী ঈসা (আ)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে সীমা অতিক্রম করে এবং শেষ পর্যন্ত তার ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে অভিহিত করে। (নাউযুবিল্লাহ্) আমি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা মাত্র। কাজেই তোমরা আমাকে কেবল عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ "আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রাসূল" এতটুকু প্রশংসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে।

নম্রতা ও বিনয়ের অভ্যাস আল্লাহ্ পাকের কাছেও খুবই পছন্দনীয়। পক্ষান্তরে অহংকার ও বড়ত্বের মনোভাবকে তিনি খুবই অপছন্দ করেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের চরিত্র আলোচনা করে ইরশাদ করেন ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا

سَلَامًا-দয়াময় আল্লাহ্‌র খাস বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। আর অজ্ঞ লোকেরা যখন সম্বোধন করে তখন তারা তর্কে অবতীর্ণ হয় না বরং শান্তি কামনা করে। (সূরা ফুরকান ঃ ৬৩)

সারকথা মু'মিন মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য হলো যে, তারা আচার-আচরণের ক্ষেত্রে নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করে চলে। কখনো কোন অজ্ঞ কিংবা অভদ্র লোক তাদেরকে কোন কটুকথা বললে তারা ক্ষমার চোখে দেখে এবং ভদ্রনীতির প্রদর্শন করে। গর্ব করা, অহংকার করা কিংবা আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করা মু'মিনের কাজ নয়।

এ কারণেই একবার হযরত লোকমান (আ) নিজ পুত্রকে বেশ কিছু উপদেশ দেন। সে সব উপদেশের মধ্যে তিনি নম্রতা ও বিনয়ের নীতি অবলম্বনের কথাটি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। পবিত্র কুরআনে সে উপদেশটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত আছে ঃ

হে وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

বৎস! অহংকারবশে তুমি কখনো মানুষকে অবজ্ঞা করো না। আর পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করো না। কারণ আল্লাহ্ কোন উদ্ধত ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (সূরা লুকমান ঃ ১৮)

আলিমগণ লিখেছেন, আল্লাহ্ পাকের নিকট যেভাবে অহংকার করা পছন্দনীয় নয় তেমনি অহংকারীদের চাল-চলন, রীতি-নীতি ইত্যাদি অনুসরণ করাও পছন্দনীয় নয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এমন হতে পারে যে, সে আন্তরিকভাবে অহংকারী নয় তবে অহংকারী লোকেরা যেভাবে চলে সে ব্যক্তি ঐভাবে চলাফেরা করে থাকে। আল্লাহ্ পাক তার এই চলাফেরাকে পছন্দ করেন না। ইসলামী শরীয়তের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো যে, এখানে আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে মানবীয় রীতি-নীতি ও শিষ্টাচারিতার বহু ক্ষুদ্র জিনিসকে বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে।

একখানা হাদীসে হযরত ইয়ায ইব্‌ন হাম্মাদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, মহান আল্লাহ্ আমার নিকট এ মর্মে ওহী প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন কর। কেউ কারুর উপর কোন অবিচার কিংবা বাড়াবাড়ি করো না। অনুরূপ কেউ কারুর উপর অহংকার কিংবা গর্ব প্রকাশ করো না (আবূ দাউদ, খ. ২, পৃষ্ঠা ৬৭১)।

অপর একখানা হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, গরীবকে দান-খয়রাত করার কারণে সম্পদ হ্রাস পায় না। নম্রতা, বিনয় ও ক্ষমাপরায়ণতা ব্যক্তির সম্মান বৃদ্ধি করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ্ পাক তার মান-সম্মান অনেক গুণে বৃদ্ধি করেন। (তিরমিযী শরীফ, খ. ২, পৃষ্ঠা ২৪)

বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনের ফলে মানব চরিত্রে অন্যান্য আরো বহু সদ্‌গুণের সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিভিন্ন হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ এগুলিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন ঃ এক. বিনয় অবলম্বন নিজেই একটি ইবাদত। পূর্ববর্তী হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ পাক মানুষকে বিনয় অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই বিনয় অবলম্বনের ফলে ব্যক্তির জীবনে আল্লাহ্ পাকের একটি হুকুম প্রতিফলিত হয়। দুই. বিনয়ী ব্যক্তি একদিকে যেমন মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রিয় তেমনি মানুষের দৃষ্টিতেও সে পছন্দনীয় ও প্রিয় ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত। লোকজন মন থেকে তাকে ভালবাসে; তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ও মেলামেশা করতে আনন্দ পান। বিনয়ী ব্যক্তির পক্ষে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা সহজ হয়। কারণ লোকজন এ চরিত্রের মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কাজকর্মে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার ও নেতৃত্ব প্রদান করতে ভালবাসে। বলা বাহুল্য, নম্রতা ও বিনয় এভাবেই মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের উচ্চমর্যাদা দান করে। তিন. বিনয়ী ও অমায়িক ব্যক্তির দুশমনের সংখ্যা খুবই কম হয়ে থাকে। কারণ মানুষ সাধারণত তার বিনয়ী চরিত্র অবলোকন করে তার শত্রুতা কিংবা বিরোধিতা করা এবং তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকে। চার. বিনয় অবলম্বনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুফল হলো যে, বিনয়ের ফলে ব্যক্তি অতি সহজে চারিত্রিক গুণাবলির দ্বারা নিজেকে গুণান্বিত করতে সক্ষম হয়। তাই চরিত্রবান লোকদেরকে সাধারণভাবে বিনয়ী দেখা যায়। পক্ষান্তরে দাম্ভিক ও অহংকারী মানুষ আল্লাহ্ পাকের দরবারে যেমন অপছন্দনীয় তেমনি মানুষের কাছেও চরম ঘৃণিত। সে দুনিয়াবাসীর অন্তরে কখনো স্থান পায় না। তদ্রূপ আখিরাতেও তার জন্য রয়েছে চরম লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা। লোকজন তার ধনৈশ্বর্যের ভয়ে কিংবা ক্ষমতার কারণে হয়ত তার বিরুদ্ধে মুখে কিছু বলে না তবে মনে মনে তাকে অপছন্দ করে থাকে। এ সত্যতা যাচাইয়ের জন্য খুব দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা এর জ্বলন্ত সাক্ষী।

١١٥. عَنْ أَبِى الْمَلِيْحِ حَدَّثَنِىْ نَصَرُ بْنُ وَهَبِ الْخُزَاعِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ حِمَاراً مَرْسُوْنَا بِغَيْرِ سَرْجٍ مُوَكَّفٌ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ جَزْرِيَّة ثُمَّ دَعَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَأَرْدَفَهُ ـ

১১৫. হযরত নাসর ইব্ন ওয়াহ্হাব খোযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এমন একটি গাধার পিঠে আরোহণ করেন যেখানে বসার কোন গদি ছিল না। তবে রশির লাগাম পরা ছিল এবং এর উপর একখণ্ড পুরাতন চামড়া রাখা ছিল। তারপর তিনি হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা)-কে ডেকে নেন এবং নিজের পেছনে আরোহণ করান।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকেও প্রিয় ﷺ-এর পরম বিনয়-নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রিয় নবী ﷺ নিজের শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের মুহূর্তে একটি সাধারণ গাধার পিঠে আরোহণ করতে দ্বিধা করেননি। অথচ তিনি যদি সামান্য ইঙ্গিতটুকুও করতেন তা হলে জান কুরবান হযরত উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর মত দানবীর সাহাবীগণ তাঁকে উন্নত থেকে উন্নততর সাওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করতেন না।

একখানা হাদীসে হযরত আবূ সালামা (রা) বলেন, আমি প্রিয় নবী ﷺ-এর যবান মুবারক থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির মনে শস্যদানা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। (তারগীব ওয়া তারহীব, খ. ৪, পৃষ্ঠা ৪৫)

١١٦. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَتَّبِعُ الْجَنَازَةَ وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَعْلُوْكَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وكَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَيَوْمَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ عَلٰى حِمَارٍ مَخْطُوْمٍ بِحَبْلٍ مِنْ لِيْفٍ تَحْتَهُ اِكَافٌ مِنْ لِيْفٍ۔

১১৬. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিয়ম ছিল যে, তিনি অসুস্থদের শুশ্রূষা করতেন, জানাযার সঙ্গে হেঁটে যেতেন, গোলাম ও শ্রমিকদের আমন্ত্রণ কবুল করতেন এবং গাধার পিঠে আরোহণ করতেন। (রাবী বলেন) প্রিয় নবী ﷺ খাইবার যুদ্ধের দিন একটি গাধার পিঠে আরোহী ছিলেন। এ গাধাটির লাগাম ছিল খেজুরের ছাল দিয়ে পাকানো একটি রশি এবং গাধার গদিটি ছিল খেজুরের কতগুলি ছাল ও ডালের দ্বারা বানানো। (ইব্ন মাজা, পৃষ্ঠা-৫৪৫)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ-এর এমন চারটি উন্নত অনুপম সদ্গুণের উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি সাধারণত কোন নীতিপরায়ণ চরিত্র মাধুরী সম্পন্ন বিনয়ী ব্যক্তির পক্ষেই অবলম্বন করা সম্ভব হয়ে থাকে।

১. অসুস্থের সেবা শুশ্রূষা ঃ হাদীসে পাওয়া যায় যে, প্রিয় নবী ﷺ আশরাফ-আত্রাফ, ধনী-নির্ধন, আযাদ-গোলাম নির্বিশেষে সকলের খোঁজ-খবর নিতেন। কারোর অসুস্থতার সংবাদ পেলে নিঃসংকোচে তার শুশ্রূষার জন্য যেতেন। এমন কি একবার তাঁর জনৈক

ইয়াহূদী খাদেম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তিনি সেই ইয়াহূদীর শুশ্রূষা করেন। প্রিয় নবী ﷺ -এর চাচা আবূ তালিব ইসলাম গ্রহণ করেননি। অথচ তার অসুস্থতাকালে তিনি শুশ্রূষার জন্য গিয়েছিলেন।

২. লাশের সঙ্গে যাওয়া ঃ প্রিয় নবী ﷺ মৃতের জানাযায় শরীক হতেন। নিজেই জানাযার সালাত পড়াতেন। জানাযার পর লাশের সঙ্গে গোরস্তান পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে দাফন কাজে শরীক হতেন। একদা মসজিদে নবুবীর ঝাড়ু দানকারিণী এক মহিলা রাত্রিকালে ইন্তিকাল করেন। সাহাবীগণ রাতে প্রিয় নবী ﷺ -এর কষ্ট হতে পারে এ আশংকায় তাঁকে সংবাদ দেননি। নিজেরাই মহিলার কাফন-দাফনের কাজ সম্পন্ন করে নেন। পরে এ সংবাদ প্রিয় নবী ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং মহিলার কবরে গিয়ে জানাযা পড়ে আসেন। অনুরূপভাবে মদীনার অধিবাসী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই ইব্‌ন সালূল ছিল মুনাফিকদের নেতা এবং মুসলমানদের চরম শত্রু ও ইসলাম বিদ্বেষী। এ লোকটি মারা গেলে তখনও প্রিয় নবী ﷺ তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন।

৩. দরিদ্রদের আমন্ত্রণ কবুল করা ঃ দরিদ্রদের আমন্ত্রণ কবুল করা এবং তাদের কথা শোনা মানুষের অন্যতম সদ্‌গুণ। প্রিয় নবী ﷺ প্রতিটি মানুষের বক্তব্য শুনতে চেষ্টা করতেন। একটি গোলামও যদি তাঁকে নিজ প্রয়োজন সমাধা করে দেয়ার জন্য নিয়ে যেতে চাইত তখন তিনি নিঃসংকোচে গোলামের সঙ্গে চলে যেতেন। এমন কি কোন ক্রীতদাসী পর্যন্ত তুচ্ছ কোন কাজের জন্য যখন তাঁর কাছে সাহায্য চাইত তখনও তিনি তা সমাধা করে দিতে নিজের মর্যাদার জন্য হানিকর বলে মনে করতেন না।

৪. গাধার পিঠে আরোহণ করা ঃ প্রিয় নবী ﷺ -এর জন্য উট, ঘোড়া ইত্যাদি জাতীয় উন্নত বাহন গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। অথচ তিনি বিনয় প্রকাশার্থে গাধা ও খচ্চরের পিঠেও সাওয়ার হতেন। বাহন হিসাবে গাধা ব্যবহার করাকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করতেন না। এভাবে প্রয়োজনের মুহূর্তে নিজের পেছনে অন্যকে বসিয়ে নিতেন। খায়বার যুদ্ধ ও বনূ কুরায়যা ও নাযীর যুদ্ধে তিনি যখন একজন সেনাপতি ও মুসলমানদের প্রধান হিসাবে রণক্ষেত্রের পার্শ্ব অতিক্রম করছিলেন তখন তাঁর বাহনটি ছিল সামান্য একটি গাধা। অথচ এমন অবস্থায় অতিশয় বিনয়ী প্রকৃতির নেতাগণও প্রতিপক্ষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে নিজের শৌর্যবীর্য ও জাঁকজমকের প্রকাশ আবশ্যক বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু প্রিয় নবী ﷺ-এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি স্বভাবজাত নম্রতা ও বিনয় ত্যাগ করে কৃত্রিমতা অবলম্বন করাকে পছন্দ করেননি। এটিই ছিল রাহমাতুল লিল্ আলামীন ﷺ -এর যথাযোগ্য উত্তম অনুপম আদর্শ।

١١٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ مَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ كَمَا يَصْنَعُ أَحَدُكُمْ فِيْ بَيْتِهِ ـ يَخْصِفُ النَّعْلَ وَيُرَقِّعُ الثَّوْبَ ـ

১১৭. (উম্মুল মু'মিনীন) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ঘরে প্রবেশ করে কি কি কাজ করতেন ? উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি সেই সব কাজই করতেন যেগুলো সাধারণত তোমরা নিজেদের ঘরে করে থাক। তিনি নিজ হাতে জুতা সেলাই করতেন এবং কাপড়ে তালি লাগাতেন।

١١٨. عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مَاكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِيْ بَيْتِهِ ؟ قَالَتْ كَانَ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـ

১১৮. হযরত আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা সিদ্দীকা (রা) -কে জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী ﷺ বাড়ির ভেতরে কি কাজ করতেন ? তিনি বললেন, নবী ﷺ ঘরের কাজকর্মে অন্যদের সাহায্য করতেন।

١١٩. عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ يَصْنَعُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِهِ قَالَتْ يَخْصِفُ النَّعْلَ وَيُرَقِّعُ الثَّوْبَ ـ

১১৯. মুজাহিদ (র) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে, প্রিয় নবী ﷺ ঘরের ভিতর থাকাকালে কি কি কাজ করতেন ? তিনি বললেন, নবী ﷺ নিজ হাতে নিজের চপ্পল সেলাই করতেন এবং নিজের পোশাকে তালি লাগাতেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত তিনটি হাদীসের মর্ম প্রায় অভিন্ন। এখানে গৃহের অভ্যন্তরে থাকাকালে প্রিয় নবী ﷺ যে সব কাজকর্ম করতেন বলে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বর্ণনা করেছেন। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ঘরের ভিতরে তিনি অতিশয় সাদাসিধা ও সরল জীবন যাপন করতেন। একজন সাধারণ মানুষের মতই ছিল তাঁর পারিবারিক জীবন। রাজকীয় রীতি-নীতি কিংবা কোন জাঁকজমক তাঁর পরিবারে ছিল না। এখানে গভীরভাবে লক্ষণীয় যে, প্রিয় নবী ﷺ নবুওয়াতের মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া এবং বিশ্ব নেতৃত্বের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঘরে প্রবেশ করে নিজের কাজ নিজ হাতেই সম্পাদন করতেন। পারিবারিক ছোট ছোট কাজগুলি সম্পাদন করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করতেন না। অনুরূপভাবে তাঁর গৃহে কাজ করার মত লোকের অভাব ছিল এমনও নয়। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) উভয়ে প্রিয় নবী ﷺ

-এর একান্ত খাদেম ছিলেন। প্রিয় নবী ﷺ-এর কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার কাজে তাঁরা এতটুকু ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন যে, লোকেরা তাঁদেরকে প্রিয় নবী ﷺ -এর পরিবারের সদস্য বলে মনে করতো। অনুরূপ উম্মুল মু'মিনীনদের জন্যও সেবিকা ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও প্রিয় নবী ﷺ নিজ ঘরে প্রবেশের পর নিজের কাজকর্ম নিজেই সম্পাদন করতেন।

নম্রতা ও বিনয় আল্লাহ্ পাকের কাছেও প্রিয় এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছেও ছিল প্রিয়। একখানা হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়তে এক ধাপ বিনয় অবলম্বন করবে আল্লাহ্ পাক বেহেশ্‌তে তার জন্য এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন। আর যে ব্যক্তি এক ধাপ অহংকার অবলম্বন করবে আল্লাহ্ পাক তার জন্য এক ধাপ মর্যাদা অবনতি করে দিবেন। এভাবে অহংকার অবলম্বনের কারণে আল্লাহ্ পাক ব্যক্তির মর্যাদা ক্রমে ক্রমে অবনতি করে অবশেষে দোযখের সর্বনিম্নে নিক্ষেপ করবেন। (ইব্‌ন মাজা, পৃষ্ঠা ৫৪৪, মিসর)।

١٢٠. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ يَوْمًا حِمَاراً بِاكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ فَرَكِبَهُ فَرَدِفَهُ أُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ يَعُوْدُ سَعْدَبْنَ عُبَادَةَ فِىْ بَنِى الْحَارِثِ ابْنِ خَزْرَجٍ وَذٰلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ-

১২০. হযরত উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি গাধার উপর আরোহণ করেন। গাধাটির পিঠে গদি হিসেবে একটি চাদর ছিল। তারপর তিনি নিজের পেছনে হযরত উসামা ইব্‌ন যায়িদ (রা)-কে বসালেন এবং হযরত সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর শুশ্রূষার জন্য বনূ হারিস ইব্‌ন খাযরাজ গোত্রের আবাসস্থলে গমন করেন। এ ঘটনাটি ছিল বদর যুদ্ধের পূর্বেকার।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস উল্লেখ করার পেছনে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো প্রিয় নবী ﷺ -এর নম্রতা ও বিনয় চরিত্রের বর্ণনা করা। অবশ্য এতদ্‌সংক্রান্ত একখানা হাদীস ইতিপূর্বে ১১৫ নং-এ আলোচিত হয়েছে। এ হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, প্রিয় নবী ﷺ নিরহংকার চরিত্রের কারণে বাহন হিসেবে সামান্য গাধাকেও ব্যবহার করেছেন। অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদের ন্যায় বাহন হিসাবে তুচ্ছ গাধার ব্যবহারকে তিনি নিজের মর্যাদা হানিকর বলে মনে করেননি। এভাবে নিজের সঙ্গে অন্য একজনকেও বসিয়ে নিতে তাঁর কোনই সংকোচবোধ হয়নি। অথচ সাধারণভাবে কোন রাষ্ট্রপতি কিংবা কোন সম্রাট এহেন আচরণ করতে লজ্জাবোধ করবেন। ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, সফরে ও মদীনা শরীফে অবস্থান কালে বিভিন্ন স্থানে প্রিয় নবী ﷺ চল্লিশ জনেরও অধিক সাহাবীকে নিজের সঙ্গে সাওয়ারীতে আরোহণের মর্যাদা দান করেন। কখনো কখনো তিনি নিজে পেছনে বসে সঙ্গীকে আগে বসতেও দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! এটি ছিল মহানবী ﷺ-এর চরিত্র মাধুরীর নমুনা। প্রিয় নবী ﷺ -এর আখ্‌লাক ও শামাইল সম্পর্কে যাঁরা অধ্যয়ন করেন তাঁদের কাছে তাঁর বিনয় ও

নম্রতার বহু ঘটনা সুস্পষ্ট। তিনি সর্বদা মোটা ও স্থূল পোশাক পরিধান করতেন। সাধারণ মানের আহার গ্রহণ করতেন। তালি লাগানো জুতা ব্যবহার করতেন, নিজেই ঘরের বকরীর দুধ দোহন করতেন, নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন, নিজের কাপড়-চোপড় নিজেই ধুয়ে নিতেন, গাধার পিঠে আরোহণ করে চলতে এবং নিজের সঙ্গে অন্যকে বসিয়ে নিতে কখনো লজ্জাবোধ করতেন না।

١٦١. عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانُوْا اِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوا إِلَيْهِ لِمَا يَعْرِفُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لَهُ ـ

১২১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবীদের মনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে অধিক ভালবাসা অন্য কারোর জন্য ছিল না। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনো আসতে দেখে তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, তিনি এভাবে দাঁড়ানোকে মোটেও পছন্দ করেন না।

ফায়দা ঃ এ হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, প্রিয় নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁর প্রতি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে নিষেধ করতেন। কেননা এটি অহংকারী লোকদের রীতি। অহংকারী কর্তা ব্যক্তিরা মানুষের কাছ থেকে এ ধরনের লৌকিক সম্মান পেতে চায়। আর তাদের প্রজা ও দরবারের সদস্যরাও এ পদ্ধতিতে সম্মান জানায়। কর্তা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের বড়ত্ব ও আধিপত্যের প্রকাশ ঘটানো এবং মানুষের কাছ থেকে জবরদস্তিমূলক সম্মান আদায় করা। আর এ কারণেই তাদের সম্মানার্থে যারা দাঁড়াবে না, তাদেরকে অপরাধী বলে গণ্য করে। অথচ কোন সন্দেহ নেই এটি নিজের অহংকার প্রকাশেরই একটি বিকল্প মাত্র, যা মিছামিছি প্রদর্শনীর অবতারণা বৈ কিছুই নয়। এ অভ্যাস খুবই মন্দ একটি অভ্যাস। এটি ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাকের কঠিন ক্রোধ ও গযবের মধ্যে নিপতিত করে। এ কারণেই প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ এ ধরনের প্রদর্শনী করা থেকে সাহাবীদেরকে নিষেধ করতেন।

একখানা হাদীসে হযরত আবূ উমামা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একটি লাঠির উপর ভর করে আমাদের দিকে আসছিলেন। আমরা তাঁর আগমন উপলক্ষে সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তোমরা অনারবদের ন্যায় আমার সম্মান প্রদর্শনের জন্য কখনো দাঁড়াবে না। অনারব লোকেরা একজন অন্যজনের সম্মানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। (আবূ দাউদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা-১২৯)

প্রিয় নবী ﷺ এ নির্দেশটি দিয়েছিলেন তাঁর একান্ত বিনয়ী মনোভাবের কারণে। যেন হঠাৎ কেউ দেখলে তাঁর প্রতি অহংকার বা দাম্ভিকতার সন্দেহটুকুও করতে না পারে। নতুবা তিনি খুব ভালভাবেই জানতেন যে, সাহাবীগণ তাঁকে যে সম্মান প্রদর্শন করেন তাতে বিন্দু পরিমাণ খাদ নেই, সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। মনের গভীর থেকেই তাঁরা তাঁকে সম্মান করে থাকেন এবং অকৃত্রিমভাবে তাঁকে ভালবাসেন। এ কারণে আলিমগণ লিখেছেন, কোন বিজ্ঞ আলিম

কিংবা বুযুর্গ কিংবা ন্যায়পরায়ণ কোন শাসকের সম্মান প্রদর্শনার্থে এভাবে দাঁড়ানোর মধ্যে কোন আপত্তি নেই। তবে কেউ যদি নিজের প্রভুত্ব, আধিপত্য ও অহংকার দেখানোর জন্য এভাবে সম্মানার্থে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেয় তাহলে দাঁড়ানো মাকরূহ।

হযরত আবূ মিজলায (রা) থেকে বর্ণিত যে, হযরত মুআবিয়া (রা) একবার হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র ও ইব্‌ন আমির (রা)-এর কাছে গেলেন। হযরত মুআবিয়া (রা)-কে দেখে হযরত ইব্‌ন আমির (রা) তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে গেলেন। এদিকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রা) স্বস্থানে উপবিষ্ট থাকেন। তখন হযরত মুআবিয়া (রা) হযরত ইব্‌ন আমির (রা)-কে বললেন, স্বস্থানে বসে থাকুন। কেননা আমি প্রিয় নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি অন্যরা তার সম্মানার্থে দাঁড়ানোকে পছন্দ করে সে ব্যক্তির ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (আবূ দাউদ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২১৯)

উপরোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা সে সময়ের জন্য, যখন আগমনকারীর দাম্ভিকতা ও অহংকার এ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। তাই দেখা যায় একটি হাদীসে এসেছে যে, আনসারদের অন্যতম বড় আলিম ও সরদার হযরত সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা) যখন আগমন করছিলেন তখন প্রিয় নবী ﷺ আনসারদের আদেশ দিয়ে বলেন, তোমাদের সর্দার আগমন করছেন। তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। অবশ্য এখানে নবী ﷺ-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল হযরত সাদ ইব্‌ন উবাদা (রা)-এর সম্মানকে বড় করে দেখানো। কেননা তাকে তখন বনূ কুরায়যার বন্দীদের ব্যাপারে সালিস নিযুক্ত করা হয়েছিল।

অনুরূপভাবে দূরদেশ থেকে আগত মুসাফিরের অভ্যর্থনা কিংবা অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দাঁড়ানোর মধ্যে কোন আপত্তি নেই। শর্ত হলো উভয় পক্ষের কোন দিকে প্রাণহীন প্রদর্শনী কিংবা অহংকার থাকবে না। যেন আগমনকারী মনে মনে এই সম্মান কামনা না করেন আর অভ্যর্থনাকারী কেবল লৌকিকতার জন্যই না দাঁড়ান।

١٢٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجِيْبُ الْعَبْدَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ

১২২. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাধারণ একজন গোলামের দাওয়াত কবুল করতেন, অসুস্থদের শুশ্রূষা করতেন এবং গাধার পিঠেও আরোহণ করতেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকেও প্রিয় নবী ﷺ-এর পরম বিনয় ও নম্রতার পরিচয় ফুটে উঠে। এভাবে আরো অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রিয়নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের মজলিসে নিজের জন্য কোন পার্থক্য বজায় না রেখেই বসতেন। তাঁর বসার জন্য পৃথক কোন আসন থাকত না। আর তিনি বসার মধ্যেও নিজেকে ব্যতিক্রম বানিয়ে বসতেন না। তিনি সীমাহীন সরলতা ও অনাড়ম্বরতাসহ মজলিসের যেখানেই সুযোগ পেতেন সেখানেই

বসে যেতেন। এ কারণে নতুন আগন্তুক লোকদের জন্য জিজ্ঞেস করে নিতে হতো যে, আপনাদের মধ্যে নবী ﷺ কোন্ জন? কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন নবী ﷺ-এর দরবারে দূর দেশের বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হলো এবং নবাগতদের নানা প্রশ্নোত্তরের কারণে মজলিসের কাজকর্ম ও আলোচনায় বিঘ্ন ঘটতে লাগল, তখন সাহাবীদের বহু পীড়াপীড়ির দরুন প্রিয় নবী ﷺ-এর জন্য একটি পৃথক জায়গা বানানোর আবেদন তিনি মঞ্জুর করেন। ফলে মজলিসের মধ্যে নবী ﷺ কোন্ জন তা নির্ণয় করতে নবাগতদের জন্য সহজ হয়। সাহাবীগণ প্রিয় নবী ﷺ-এর বসার জায়গাটির মধ্যে মাটি ফেলে সামান্য উঁচু করে খাটের মত বানিয়ে দেন। তারপরেও প্রিয় নবী ﷺ কখনো সেই উঁচু জায়গায় বসতেন আবার কখনো নিচে বসে উঁচু জায়গাটির উপর হেলান দিয়ে থাকতেন। এতখানি ছিল নবীদের সর্দার শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ-এর নম্রতা ও বিনয়।

একটি হাদীসে পাওয়া যায় যে, প্রিয় নবী ﷺ-কে কখনো কখনো যবের রুটি কিংবা গন্ধ হয়ে গেছে এমন চর্বি আহারের জন্যও যদি দাওয়াত দেয়া হতো তখনও তিনি কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে সে দাওয়াত কবুল করতেন। তিনি এমনটা চিন্তা করতেন না যে, এত নিম্নমানের আহারের আমন্ত্রণে আমি কেন যাব ?

অনুরূপভাবে তিনি নিজের সাথী-সঙ্গীদের শুশ্রূষার জন্যও যেতেন। অসুস্থ লোকটি আমীর কিংবা গরীব, আযাদ কিংবা গোলাম, ছোট কিংবা বড় —সেই বিবেচনা তাঁর কাছে ছিল না। তিনি অসুস্থের খুব কাছে গিয়ে বসতেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিতেন। তার সুস্থতার জন্য দু'আ করতেন। হাদীসগ্রন্থে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায়। ইতিপূর্বেও আলোচিত হয়েছে যে, তিনি সামান্য মানের বাহন গাধার পিঠে আরোহণ করতেও সংকোচ বোধ করতেন না। বলা বাহুল্য, প্রিয় নবী ﷺ সমকালের সম্রাট ও দু'জাহানের রাসূল ছিলেন। তাঁর নগণ্য একজন গোলাম ব্যক্তিও উচ্চমানের বাহনে আরোহণ করে থাকে। অথচ তিনি নিজে গাধার পিঠে নির্দ্বিধায় আরোহণ করেছেন। এ সব কিছু মূলত তিনি বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের জন্যই করেছিলেন। যেন উম্মতের লোকেরা তাঁর এ আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

١٢٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ عَلَى الْاَرْضِ وَيَاْكُلُ عَلَى الْاَرْضِ وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ، وَيُجِيْبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوْكِ. قَالَ اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ فَحَدَّثْتُ بِهِ الْاَعْمَشَ عَنْ مُسْلِمٍ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ كَانَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ -

১২৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিঃসংকোচে মাটির উপর বসতেন, মাটিতে বসে আহার করতেন, নিজ হাতে খুঁটির সাথে বক্‌রী বাঁধতেন ও গোলামের দাওয়াত কবুল করতেন। বর্ণনাকারী আবূ ইসমাঈল (র) বলেন, আমি এ হাদীসখানা মুসলিম (র)-এর বরাত দিয়ে হযরত আমাশ (র)-কে শোনালাম। তখন

আমাশ (র) বললেন, তবে মনে রেখ, প্রিয় নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল নিজ সাহাবীদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া।

ফায়দা ঃ আলোচ্য হাদীসের মধ্যে প্রিয় নবী ﷺ -এর যে সব সুন্দর নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে এগুলি তাঁর একান্ত বিনয় ও নম্রতার প্রমাণ বহন করে। কেননা এসব কাজ তিনি প্রয়োজনীয় উপকরণ কিংবা কাজের লোকজনের অভাবজনিত কারণে করেননি। তাঁর কাছে উপকরণ বা লোকজনের অভাব ছিল না। তবে তিনি নিজের নম্রতা ও বিনয় নীতি প্রকাশার্থে এসব কাজ নিজ হাতে ও নিঃসংকোচে করতেন।

বুখারী শরীফে হযরত আসওয়াদ ইব্ন ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজ গৃহে কি কি কাজ করে থাকতেন? তখন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি ঘরের অন্যদের কাজকর্মে স্বহস্তে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু যখন নামাযের সময় হতো তখন কোন প্রকার বিলম্ব না করে মসজিদে চলে যেতেন। (বুখারী শরীফ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ঃ ৮৯২)

আলোচ্য হাদীস থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্রিয় নবী ﷺ অন্যান্য সাধারণ মানুষের ন্যায় পারিবারিক বিভিন্ন কাজে শরীক থাকতেন। উদাহরণস্বরূপ যেমন নিজে বকরীর দুধ দোহন করতেন, নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন ইত্যাদি। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

١٢٤. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَرَّ بِصَبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ حَدَّثَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مُغِدٌّ ـ

১২৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি বালকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে সালাম দেন। তারপর আমাদেরকে হাদীস শুনিয়ে বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বালকদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি দ্রুত পথচলা অবস্থায় তাদেরকে সালাম দেন।

١٢٥. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِصِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ـ

১২৫. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাচ্চাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন সে মুহূর্তে তিনি তাদেরকে সালাম দেন।

١٢٦. عَنْ أنَسٍ قَالَ بَعَثَنِى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَاجَةٍ فَمَرَرْتُ بِصِبْيَانٍ فَقُمْتُ مَعَهُمْ فَأَبْطَأتُ عَلَيْهِ فَخَرَجَ وَرَاَنِىْ مَعَ الصِّبْيَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ـ

১২৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে একটি কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন। পথিমধ্যে বাচ্চাদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। আমি তাদের সেখানে দাঁড়ালাম। তাতে অনেক দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার তালাশে বের হয়ে আমাকে বাচ্চাদের সঙ্গে দেখলেন। তখন তিনি তাদেরকে সালাম দিয়েছিলেন।

١٢٧. عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم۔

১২৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বাচ্চাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি তাদেরকে সালাম দেন।

١٢٨. عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَنَا فِىْ غِلْمَةٍ نَلْعَبُ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ثُمَّ أَرْسَلَنِىْ فِىْ حَاجَةٍ۔

১২৮. আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন বাচ্চাদের সঙ্গে মিলে খেলাধুলা করছিলাম। তিনি আমাদেরকে সালাম দেন। তারপর আমাকে একটি কাজের জন্য পাঠিয়ে দেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসগুলোর বক্তব্য অভিন্ন। এখানে প্রিয় নবী ﷺ-এর পরম বিনয় ও নম্র আচরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ সব হাদীস থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, প্রিয় নবী ﷺ বাচ্চাদের শিক্ষা দানের জন্য নিজেই সালাম দিতেন। আর এভাবে তাদেরকে সালাম দেওয়া তাঁর দৃষ্টিতে কোন লজ্জা বা সম্মানহানিকর বলে মনে হতো না। বলা বাহুল্য, বাচ্চাদেরকে সালাম দেওয়ার মধ্যে বহু উপকারিতা বিদ্যমান। ১. বাচ্চাদেরকে সালাম দেওয়ার দ্বারা তাদের মধ্যে একজন অন্যজনকে সালাম দানের অভ্যাস গড়ে ওঠে। ২. তাতে সমাজে ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুনের ভিত কায়েম হয়, ৩. নিজে বাচ্চাদেরকে সালাম করার দ্বারা মন থেকে গর্ব ও অহংকার ইত্যাদি দূরীভূত হয়, ৪. 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বাক্যটি একটি দু'আ বিশেষ। এ দু'আটির ব্যাপক প্রচলনের কারণে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ গড়ে ওঠে, ৫. এই সালাম ইসলামের বিশেষ একটি প্রতীক। কাজেই সর্বশ্রেণীর মাঝে সালামের ব্যাপক প্রচলন থাকলে সেটি একটি মুসলিম সমাজ বলে বোঝা যায়।

একখানা হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন আস (রা) বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি প্রিয় নবী ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইসলামী আমলগুলোর মধ্যে কোন্ আমলটি সর্বাপেক্ষা উত্তম ? প্রিয় নবী ﷺ উত্তর দিলেন যে, লোকজনকে আহার করানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করা। (তারগীব ওয়া তারহীব, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৩)

অপর একখানা হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ (হে মানুষ সকল!) তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে ঈমান আনয়ন করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি গড়ে না নিবে। আচ্ছা! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের পরামর্শ দিব যে কাজটি করার কারণে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভালবাসা গড়ে উঠবে ? মনে রেখ! সে কাজটি হলো সালামের বহুল প্রচলন। তোমরা যখনই একজন অন্যজনের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখনই তাকে সালাম করবে। আর সালাম দেওয়াকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বানিয়ে নাও। (তারগীব ওয়া তারহীব, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৩)

একটি হাদীসে হযরত বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা সালামের ব্যাপক প্রচলন করে নাও। তা হলে নিজেরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকতে পারবে। (ঐ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৪)

হযরত সাহল ইব্‌ন হুনাইফ (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি শুধু "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলে তার আমলনামায় দশটি নেকী লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ" বলে তার আমল নামায় বিশটি নেকী লেখা হয়। আর যে ব্যক্তি "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" বলে তার আমলনামায় ত্রিশটি নেকী লেখা হয়। (তারগীব ওয়া তারহীব, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৮)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, সবচেয়ে অথর্ব হলো সে ব্যক্তি যে দু'আ করতেও অক্ষম (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতেও জানে না।) আর সবচেয়ে বড় কৃপণ সে ব্যক্তি যে সালাম করার ব্যাপারে কার্পণ্য করে। (তারগীব ওয়া তারহীব, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৯)

হযরত আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আগে সালাম দেয় সে মহান আল্লাহ্‌র অধিক ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ সাক্ষাতের সময় আগে সালাম দেয়ার কারণে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে। (মিশ্‌কাত শরীফ, পৃষ্ঠা ৩৯৮)

এভাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন যে, অগ্রে সালাম দানকারী ব্যক্তি গর্ব ও অহংকার থেকে মুক্ত থাকে। (মিশ্‌কাত, পৃষ্ঠা ৪০০)

একখানা হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক (অধিকার) রয়েছে ঃ

এক. সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করা,

দুই. সে মারা গেলে তার কাফন ও জানাযায় শরীক হওয়া,

তিন. একজন অন্যজনকে দাওয়াত করলে তা কবুল করা,

চার. একজন অন্যজনের সহিত সাক্ষাতের সময় সালাম করা,

পাঁচ. একজন হাঁচি দিয়ে "আলহামদু লিল্লাহ্' বলার পর অন্যজন তার জবাব দেওয়া। অর্থাৎ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা।

ছয়. একজন অন্যজনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি সর্বাবস্থায় কল্যাণ কামনা করা। (মিশ্‌কাত শরীফ, পৃষ্ঠা ২৯৭)

অপর একখানা হাদীসে হযরত কাতাদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ তোমরা নিজ গৃহে প্রবেশের সময় ঘরের লোকজনকে সালাম দিয়ে প্রবেশ কর। আবার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিয়ে বের হও। (যুজাজাতুল মাসাবীহ্, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮)

ফাত্ওয়ায়ে আলমগীরী গ্রন্থে আছে, "প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজ গৃহে প্রবেশের সময় 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে প্রবেশ করা চাই। আর যদি কোন জনশূন্য ঘরে প্রবেশ করে তখন নিম্নোক্ত বাক্যের দ্বারা সালাম করবে। বাক্যটি হলো– اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ"

١٢٩. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ بِنِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ-

১২৯. হযরত আস্মা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ মহিলাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে সালাম দেন।

ফায়দা ঃ আলিমগণ লিখেছেন যে, মহিলাদেরকে সালাম দেওয়ার বিষয়টি প্রিয় নবী ﷺ-এর ব্যক্তিগত আমল ছিল। কারণ তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত। তিনি ফিত্‌নায় পতিত হওয়া থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ নিরাপদ। কাজেই প্রিয় নবী ﷺ ব্যতীত অন্য লোকদের জন্য বিধান হলো গায়রে মুহাররাম মহিলাকে সালাম না দেওয়া উত্তম। অবশ্য কোন মহিলা যদি এমন হয় যে, বয়স বার্ধক্যের সীমানায় পৌছে গেছে তাকে সালাম দিতে কোন আপত্তি নেই। আল্লামা ইব্‌ন আবেদীন (র) শামী গ্রন্থে লিখেছেন যে, "গায়রে মুহাররাম ব্যক্তির জন্য কোন বেগানা মহিলাকে সালাম দেওয়া অনুচিত। তবে ঐ বেগানা মহিলা যদি বৃদ্ধা হন তাহলে তাকে সালাম দেয়া যায়। অনুরূপ যদি কোন বৃদ্ধা হাঁচি দিয়ে 'আল হামদুলিল্লাহ্' বলে তাহলে বৃদ্ধা হওয়ার কারণে তার হাঁচির জবাব দেয়া যায়। পক্ষান্তরে কোন মহিলা যদি বৃদ্ধা না হয় তা হলে তাকে সালাম কিংবা তার হাঁচির জবাব দেয়া যাবে না। (কেননা এখানে ফিত্‌নায় পতিত হওয়ার আশংকা আছে) তবে মনে মনে হাঁচির জবাব দিতে হবে।"

একখানা হাদীসে হযরত জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদল মহিলার পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি তাদেরকে সালাম দেন। (মিশ্‌কাত, পৃষ্ঠা ৩৯৯)

আল্লামা হালীমী (র) বলেন যে, যেহেতু প্রিয় নবী ﷺ কোন প্রকার ফিত্নায় পতিত হওয়া থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন, এ কারণে তাঁর জন্য বেগানা মহিলাকে সালাম দেওয়া জায়িয ছিল। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে নিরাপদ থাকার উপর সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকবেন তার জন্যও বেগানা মহিলাকে সালাম দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যায়, অন্যথায় তার নীরব থাকাই শ্রেয়। (আউনুল মা'বূদ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৫১৯)

গ্রন্থকারের এখানে উপরোক্ত হাদীসগুলো উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো সালামের ব্যাপারে প্রিয় নবী ﷺ -এর আমলী-নীতি তুলে ধরা। অর্থাৎ প্রিয় নবী ﷺ শিশু কিংবা বৃদ্ধা, পুরুষ কিংবা মহিলা নির্বিশেষে সকলকেই সর্বাগ্রে সালাম দিতেন।

١٣٠. عَنْ أنَسٍ قَالَ مَارَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ اَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ اسْتَرْضَعَ لابْنِهِ إبْرَاهِيْمَ فِى أَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَكَانَ زَوْجُهَا قَيْنًا فَيَاْتِيْهِ وَعَلَيْهِ اَثَرُ الْغِبَارِ فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ وَيَشُمُّهُ ـ

১৩০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি ব লেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাইতে সন্তানদের প্রতি অধিক স্নেহপ্রবণ আর কাউকে দেখিনি। তিনি তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইব্রাহীম (রা)-কে দুধপান করানোর জন্য মদীনার উপকণ্ঠে বসবাসকারিণী জনৈকা ধাত্রীর কাছে দিয়েছিলেন। ধাত্রীর স্বামী ছিলেন একজন কর্মকার। যখন প্রিয় নবী ﷺ নিজ সন্তানকে দেখার জন্য সেখানে যেতেন তাঁর শরীর ধুলায়িত হয়ে যেত। এ সত্ত্বেও তিনি তাঁকে বুকে জড়িয়ে নিতেন। তাঁকে চুম্বন করতেন এবং নাকের কাছে তুলে সোহাগ করতেন।

١٣١. عَنْ أنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أرْحَمَ النَّاسِ بِالصِّبْيَانِ وَكَانَ لَهُ ابْنُ مُسْتَرْضَعُ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَدْنَةِ وَكَانَ ظِئْرُهُ قَيْنًا ، وَكَانَ يَاْتِيْهِ وَنَحْنُ مَعَهُ وَقَدْ دُخِنَ الْبَيْتُ بِالاِذْخِرِ فَيَشَمُّهُ وَيُقَبِّلُهُ ـ

১৩১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শিশুদের প্রতি সর্বাধিক স্নেহপ্রবণ ছিলেন। তাঁর এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর জন্য তিনি মদীনার উপকণ্ঠের জনৈকা ধাত্রী ঠিক করেছিলেন। ধাত্রীর স্বামী ছিলেন একজন কর্মকার। প্রিয় নবী ﷺ নিজ পুত্রকে দেখার জন্য সেখানে যেতেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও থাকতাম। ধাত্রীর ঘর ইয্খির ঘাস জ্বালানো ধোঁয়ায় ভরে থাকত। এ সত্ত্বেও তিনি নিজ সন্তানকে কোলে তুলে নিতেন। তাঁকে নাকের কাছে তুলে সোহাগ করতেন এবং চুম্বন করতেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস দুটির বক্তব্য অভিন্ন। গ্রন্থকার আলোচ্য হাদীসদ্বয়কে প্রিয় নবী ﷺ -এর বিনয় ও নম্রতা অনুচ্ছেদে পেশ করার কারণ হলো, এ দু'টি হাদীসে তাঁর পবিত্র

জীবন যাত্রার সরলতা ও অকৃত্রিমতা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি এ কথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, তিনি পরিবারের লোকজন ও সন্তান-সন্ততি বিশেষত শিশুদেরকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। তাঁর পরম নিরহংকারের প্রমাণ এই যে, তিনি নিজের দুগ্ধপোষ্য শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য একজন কর্মকারের মত সাধারণ ব্যক্তির ঘরে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তাছাড়া সেই কর্মকারের গৃহে বারবার যাতায়াত করা এবং পথিমধ্যে ধুলার কারণে আপাদমস্তক ভরে যাওয়াকে নিজের আত্মমর্যাদা হানিকর বলে মনে করেননি। কর্মকারদের গৃহে স্বাভাবিকভাবেই ধোঁয়া থাকে। প্রিয় নবী ﷺ এ সত্ত্বেও নিঃসংকোচে তাদের গৃহে প্রবেশ করতেন। তারপর একজন সাধারণ পিতাও যখন ধুলামাখা দেহে সন্তানকে কোলে নিতে দেরি করে সেখানে তিনি এ সব উপেক্ষা করে নিজ সন্তানকে কোলে নিয়ে স্নেহ প্রবণতার পরম উদাহরণ পেশ করলেন। অথচ অহংকারী ও আত্মপূজারী লোকেরা শিশুদের সাথে এভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়া এবং তাদেরকে স্নেহ ও মমতায় জড়িয়ে নেয়াকে নিজেদের মানমর্যাদা হানিকর বলে বোধ করে থাকে।

প্রিয় নবী ﷺ নিজে যেভাবে শিশুদেরকে আদর-সোহাগ করতেন সেভাবে অন্যদেরকেও তাদের আদর-সোহাগের জন্য উপদেশ দিতেন। হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ ধরনের বহু বর্ণনা পাওয়া যায়, যেখানে শিশুদের প্রতি তাঁর সীমাহীন স্নেহ ও মমতার পরিচয় ফুটে উঠেছে। একখানা হাদীসে বলা হয়েছে যে, একদা প্রিয় নবী ﷺ তাঁর দৌহিত্র হযরত হাসান (রা)-কে গভীরভাবে স্নেহ করছিলেন। এটি দেখে হযরত আক্‌রা ইব্‌ন হাবিস (রা) নামক এক সাহাবী বলে উঠলেন, আমার তো দশটি সন্তান আছে। অথচ আমি তো কাউকে আদর-সোহাগ করি না। প্রিয় নবী ﷺ তখন বললেন ঃ যারা মানুষের প্রতি সোহাগ ও মায়া-মমতা করে না তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকও সোহাগ ও মায়া-মমতা করবেন না। (হায়াতুস্ সাহাবা, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৯)

হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে অপর একটি সূত্রে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে এক মহিলা আসল। মহিলার সঙ্গে দু'টি শিশু ছিল। হযরত আয়েশা (রা) ঐ মহিলাকে তিনটি খেজুর খেতে দিলেন। মহিলাটি তার দু'টি বাচ্চাকে দু'টি খেজুর দিয়ে একটি নিজে খেতে চাইল। এ সময় শিশুরা পুনরায় তার দিকে চোখ তুলে তাকাল। মহিলা খেজুরটিকে দু'টুক্‌রা করে অর্ধেক করে উভয় বাচ্চাকে দিয়ে দিল। তারপর সে চলে গেল। অতঃপর প্রিয় নবী ﷺ গৃহে ফিরে আসলে হযরত আয়েশা (রা) এ ঘটনা তাঁকে শোনালেন। তখন প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ মহিলাটি (তার সোহাগ ও মমত্ববোধের কারণে) বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ বেহেশ্‌তের উপযুক্ত বিবেচিত হবে। (হায়াতুস্, সাহাবা, ২ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৭০)

١٣٢. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُوْلُ مَارُفِعَ مِنْ بَيْنَ يَدَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضْلُ شَوَاءٍ قَطُّ وَلَاحُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ -

১৩২. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে কখনো উচ্ছিষ্ট ভুনা মাংস তুলে নেয়া হয়নি এবং তার জন্য কখনো কার্পেট বিছান হয়নি।

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন বিনয়ী সাধারণ মানুষের মতই মাটিতে বসে আহার করতেন। আহার শেষে তিনি বরতন খুব ভাল করে পরিষ্কার করতেন এবং অহংকারী লোকদের মতো খাবার বরতনে উচ্ছিষ্ট রেখে দিতেন না। খাবার বরতনে যেসব গর্বিত ও অহংকারী লোক কিছু না কিছু উচ্ছিষ্ট রেখে দেয়, তার দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য থাকে স্বীয় ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য প্রকাশ করা। অর্থাৎ তারা যেনো তাদের ঐ উচ্ছিষ্ট খাবারের প্রতি তার পরিমাপ যা-ই হোক না কোন আদৌ মুখাপেক্ষী নয়। তাদের দৃষ্টিতে আহার্যের কোন কদর ও মর্যাদা নেই। (নাউযুবিল্লাহ্) নবী আকরাম হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ-এর শিক্ষা ও তাঁর জীবন পদ্ধতি এই অর্থহীন অবজ্ঞা লোক-দেখানো প্রাচুর্য থেকে (যা মূলত নিয়ামতের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন) সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। তা ছিল বিনয়, বশ্যতা ও আনুগত্যের উপর ভিত্তিশীল। তাঁর শিক্ষা ও পবিত্র জীবন চরিত্র অধ্যয়ন করলে এ সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে (আহারের পর) আঙুল, বরতন (রেকাবী, প্লেট প্রভৃতি) ভালভাবে পরিষ্কার করে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমরা কি জানো খাবারের কোন্ লোকমা ও কোন্ অংশের মধ্যে বরকত নিহিত রয়েছে ? (মিশ্‌কাত, পৃষ্ঠা ৩৬৩) খাবার খেয়ে রেকাবীতে উচ্ছিষ্ট রেখে দেয়া তা নষ্ট করার নামান্তর ও নিয়ামতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন স্বরূপ। তাই বরতন ও আঙুলে লেগে থাকা খাবার উত্তমরূপে চেটে খাওয়া উচিত। অবশ্য খাবার যদি বেশি বেঁচে যায় এবং তা নষ্ট করা উদ্দেশ্য না হয়, তবে তা অবশিষ্ট রেখে দিতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু তা এইভাবে অবশিষ্ট রেখে দিবে যা নিজের কিংবা অন্য কারো খেতে ঘৃণা না হয়। এক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হচ্ছে, প্রথমেই আহার্য প্রয়োজন মাফিক বরতনে তুলে নিতে হবে। অনুরূপভাবে চামচ বা আঙুলে যে আহার্য লেগে থাকে তাও অবশ্যই চেটে খাওয়া উচিত, যাতে আল্লাহ্ প্রদত্ত এই নিয়ামত নষ্ট না হয়।

অনুরূপ যদি আহার্যের কোনো লোকমা মাটিতে পড়ে যায়, তবে তাও তুলে নিতে হবে। অবশ্য যদি নোংরা ও নাপাক স্থানে না পড়ে। সে ক্ষেত্রে মাটি মিশ্রিত অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট পরিষ্কার অংশ খেতে হবে। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামতের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, বিনয় ও আনুগত্যের নিয়ম। এক হাদীসে হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ শয়তান প্রতিটি কাজের সময় তোমাদের কাছে

উপস্থিত থাকে এমনকি আহার করার সময়ও। তাই যখন আহার করার সময় লোকমা মাটিতে পড়ে যাবে, তখন তা তুলে নিবে এবং ধুলাবালি পরিষ্কার করে লোকমাটি খাবে। শয়তানের জন্য রেখে দিবে না। অনুরূপভাবে যখন তোমরা আহার শেষ করবে, তখন স্বীয় আঙুলসমূহ পরিষ্কার করবে এবং যে আহার্য তাতে লেগে থাকবে তা চেটে খাবে। কেননা আহার্যের কোন্ অংশে বরকত নিহিত আছে তা তোমাদের জানা নেই। (মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৬৩)

হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর উপরোক্ত হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাটিতে বসে খেতেন এবং নিজের জন্য কোনো বিশেষ স্থান বা বিছানা পত্রের ব্যবস্থা করতেন না। যেমনিভাবে অহংকারী ও আত্মপূজারী লোকেরা স্বীয় শানশওকত প্রকাশের জন্য খাবার মজলিসে কার্পেট গালিচা কিংবা টেবিল চেয়ারের বন্দোবস্ত করে থাকে। বরং সরদারে দু'জাহান শাহানশাহে আরব ও আজম সাধারণ মানুষের মত কোনো বিছানা ছাড়াই মাটিতে বসে খানা খেতেন। এতে তার আল্লাহর বান্দাসুলভ বিনয় ও চরম গর্বহীনতাই প্রকাশ পায়। অনুরূপভাবে তিনি আসন করে বসে কিংবা ঠেস দিয়ে কখনো আহার করতেন না। এটাও আত্মগর্বীদের অভ্যাস। এ সম্পর্কে হযরত আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ আমি আসন করে বসে (কিংবা ঠেস লাগিয়ে) কখনো আহার করি না। (মিশকাত, পৃষ্ঠা-৩৬৩)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কখনো আসন করে আহার করতে দেখা যায়নি। আর তিনি কখনো তাঁর সঙ্গীদের আগে আগে চলতেন না। (বরং বিনয়বশত তাদের মাঝখানে চলতেন) (মিশকাত, পৃষ্ঠা ২৬৬)

এক হাদীসে নবী ﷺ বলেন, তোমরা আহার করার সময় জুতা খুলে নাও। কেননা এটা (জুতা খুলে নেয়া) একটি ভাল অভ্যাস। (জামি সগীর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৮)

যেসব মুসলমান আজকাল ইউরোপের অন্ধ অনুসরণে জুতা পরিধান করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আহার করাকেই ভদ্রতা মনে করে, তাদের চিন্তা করা উচিত যে, হাশরের দিন তারা আল্লাহ্র হাবীব ও উম্মতের সুপারিশকারী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা ﷺ -এর সামনে কিভাবে উপস্থিত হবে।

এই সব হাদীস থেকে নবী ﷺ আহার করার সময় কি পরিমাণ বিনয় নম্রতা অবলম্বন করতেন, তা সহজেই অনুমান করা যায়। আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলমানকে তাঁর সুন্দরতম চরিত্র ও অনুপম আদর্শ অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

١٣٢. عَنْ أَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَتَى النَّبِىَّ ﷺ رَجُلٌ يُكَلِّمُهُ فَأُرْعِدَ فَقَالَ عَوِّنْ عَلَيْكَ فَلَسْتُ بِمَلِكٍ، اِنَّمَا أَنَا ابْنُ اِمْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تَأْكُلُ الْقَدِيْدَ

১৩৩. হযরত আবূ মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট কিছু কথা বলার জন্য এলো। কিন্তু সে তাঁর ভয়ে কাঁপতে লাগল। তিনি বললেন ঃ ভয় করো না। আমি তো তোমার বাদশাহ নই (যে, আমাকে দেখে তুমি ভয় করবে)। বরং আমি হচ্ছি কুরায়শ বংশের এমন এক মহিলার সন্তান যিনি (সাধারণ মেয়েদের মত) শুকানো গোশ্ত ভক্ষণ করতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকেও নবী ﷺ-এর বিনয়, নম্রতা ও আত্মগর্বহীনতা প্রকাশ পায়। এটা স্পষ্ট যে, তিনি একদিকে ছিলেন সমস্ত নবী ও রাসূলদের সরদার এবং অপরদিকে ছিলেন সমগ্র আরব-আজমের নেতা ও দু'জাহানের পথপ্রদর্শক। প্রতিটি ব্যক্তিকেই তাঁর মাহাত্ম্য, মহিমা ও প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। যখনই কোনো আগন্তুক তাঁর সামনে আসতো, তার ভয় ও প্রভাবের দরুন তার মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর স্বভাবগত বিনয় ও সরলতার অবস্থা ছিল এরূপ যে, তিনি তার সাথে অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয় অবলম্বন করতেন। কেউ যদি ভয় পেতো, তবে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিতেন এবং কথায় ও কাজে প্রকাশ করতেন। তার প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন।

١٣٤. عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَأَبِىْ ذَرٍّ قَالاَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانِىْ أَصْحَابِهِ، فَيَجِيْئُ الْغَرِيْبُ وَلاَيَدْرِى أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ، فَطَلَبْنَا إِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيْبُ إِذَا أَتَاهُ، فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِيْنٍ فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ وَنَجْلِسُ بِجَانِبَيْهِ -

১৩৪. হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আবূ যার (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁর সাহাবীদের মাঝখানে সাধারণ মানুষের মতো উপবেশন করতেন। কোনো আগন্তুক আগমন করলে বুঝতে পারতো না যে, তাদের মধ্যে তিনি (রাসূলুল্লাহ্) ﷺ কোন্ জন যে পর্যন্ত সে জিজ্ঞেস না করতো। তাই আমরা (সাহাবীগণ) নবী ﷺ-এর জন্য এমন একটি আসন তৈরির অনুমতি প্রার্থনা করলাম, যার উপর উপবেশন করলে তাঁকে আগন্তুকরা সহজেই চিনতে পারে। (বর্ণনাকারী বর্ণনা করেন) অতঃপর আমরা (তাঁর অনুমতি নিয়ে) তাঁর জন্য একটি মাটির চত্বর তৈরি করলাম। তিনি তার উপর আসন গ্রহণ করতেন এবং আমরা তাঁর উভয় দিকে (আশপাশে) বসতাম।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর স্বভাবগত সরলতা ও প্রকৃতিগত বিনয়-প্রিয়তার পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়। তিনি সাহাবাদের মাঝে নিরহংকারভাবে উপবেশন করতেন। যেরূপ সাধারণ বন্ধু-বান্ধবরা একসাথে মিশে বসে থাকে। আমীর-উমারা ও রাজা-বাদশাহদের মত তাঁর বসার জন্য কোনো কুরসী ছিল না; কোনো সিংহাসন, কার্পেট-গালিচা ও শাহী দরবারও ছিল না। সেখানে কোনো শাহী আড়ম্বর, দাসদাসীর

করজোড় সারি, স্তাবক ও গুণগায়কদের তোশামোদ-খোশামোদও ছিল না—যাতে তাঁর স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রকাশ পেতে পারে। কেননা এসব বিষয় ছিল তাঁর প্রকৃতিগত বিনয়ের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি এসব আদৌ পছন্দ করতেন না। কিন্তু যখন বাইরের নতুন নতুন প্রতিনিধি দলের আগমন বেড়ে গেলো এবং দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ তাঁর সাক্ষাৎ ও বায়আত গ্রহণের জন্য আসতে লাগলো, তখন সাহাবাগণ এ অনিবার্য প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে তাঁর বসার জন্য একটি স্বতন্ত্র আসন তৈরির আবেদন করলেন এবং তিনিও অপরিহার্যতা লক্ষ করে মাটির একটি আসন তৈরির অনুমতি দেন।

١٣٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كُلْ (جَعَلَنِى اللّٰهُ فِدَاكَ) مُتَّكِئًا فَانَّهُ أَهْوَنَ عَلَيْكَ، قَالَتْ فَأَصْغى بِرَأسِهِ حَتّٰى كَادَ أَنْ تُصِيْبَ جَبْهَتُهُ الاَرْضَ ثُمَّ قَالَ لاَ بَلْ اَكُلُ كَمَا يَأكُلُ الْعَبْدُ وَاجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ۔

১৩৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (আল্লাহ্ আমাকে আপনার জন্য কুরবান করে দিন) আপনি ঠেস দিয়ে বসে আহার করুন। তাতে আপনি আরাম অনুভব করবেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একথা শুনে তিনি তাঁর শির মুবারক এতই নিচু করলেন যে, তাঁর কপাল মাটি স্পর্শ করার উপক্রম হলো। তারপর তিনি বললেন ঃ না, বরং আমি একজন সাধারণ গোলামের মতো আহার করবো এবং একজন সাধারণ লোকের মতো বসবো।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, দু'জাহানের সরদার, রাব্বুল আলামীনের প্রিয়তম বন্ধু হযরত মুহাম্মদ ﷺ কোনো অবস্থাতেই সরলতা ও বিনয় ত্যাগ করা পছন্দ করেন নি। খাবার জন্য বসার ক্ষেত্রে তো তিনি বিশেষভাবেই বিনয় অবলম্বন করতেন। তিনি কখনো আসন করে বসে কিংবা হেলান দিয়ে আহার করেন নি। হযরত আয়েশা (রা) যখন ভালবাসা ও সহানুভূতিবশত নবী ﷺ-কে একটু আরামের সাথে বসে খাবার খেতে অনুরোধ করলেন, বরং তখন তিনি তাঁর অনুরোধ ও অবস্থানের উল্টো দাসত্ব প্রকাশের জন্য আরো যমীনের উপর ঝুঁকে গেলেন এবং মুখেও বিনয় প্রকাশ করলেন।

আলিমগণ বলেন, ঠেস কিংবা হেলান দিয়ে খানা খাওয়ার চারটি অবস্থা হতে পারে। চারটি অবস্থাই এই হাদীসের আওতায় এসে যাচ্ছে। (১) ডান বা বামে কোনো তাকিয়া বা পাঁচিল প্রভৃতির উপর ভর করা। (২) হাতের তালু মাটির উপর রেখে তার উপর ভর করা। (৩) কোনো পাঁচিল বা তাকিয়ার সাথে কোমর লাগিয়ে সাহায্য নেয়া। (৪) গদি কিংবা কার্পেট প্রভৃতির উপর আসন করে বসে আহার করা। এই চারটি অবস্থাই সুন্নতের খেলাফ।

١٣٦. عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى خِوَانٍ وَلاَ فِيْ سُكُرُّجَةٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ-

১৩৬. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো টেবিলে বসে আহার করেন নি। এবং ছোট প্লেটেও নয়। এই অবস্থায়ই তিনি মহিমান্বিত মহান আল্লাহ্র সাথে মিলিত হয়েছেন (ইন্তিকাল করেছেন)।

ফায়দা ঃ এ হাদীস রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রকৃতিগত বিনয় ও সরলতা সম্বলিত খানা খাওয়ার সুন্নত তরীকা ও আদব প্রকাশ করছে। টেবিল ও ভূমি থেকে উঁচু দস্তরখানে পৃথক পৃথক প্লেটে খানা খাওয়া অহংকারী ও দাম্ভিক লোকদের নিদর্শন। এর উদ্দেশ্য সাধারণত স্বীয় শান-শওকত ও অহমিকা প্রকাশ করা। এছাড়া এটা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ বৈ কিছু নয়। এই ধরনের লোক ফিরিঙ্গিদের মতো আহার করাকে গর্বের বিষয় বলে মনে করে। অথচ হাদীস শরীফে এসেছে 'مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ' "যে ব্যক্তি যে জাতির অনুসরণ করবে, সে ঐ জাতির লোক বলে গণ্য হবে।" মাটিতে বসে চামড়া কিংবা কাপড় কিংবা চাটাইর দস্তরখানে হলে এক বরতনে যৌথভাবে আহার করা রাসূলে করীম ﷺ -এর পবিত্র সুন্নত। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদেরকে বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজকে পাশ্চাত্যের অনুসরণের স্থলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উস্ওয়ায়ে হাসানা (উত্তম আদর্শ)–কে মনেপ্রাণে অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

مَا ذُكِرَ مِنْ عَلاَمَةِ رِضَاهُ وَعَلاَمَةِ سُخْطِهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি বোঝা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

١٣٧. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ رِضَاهُ غَضَبُهُ بِوَجْهِهِ كَانَ اِذَا رَضِيَ فَكَأَنَّمَا مُلاَحَكُ الْجُدُرِ وَجْهَهُ وَاِذَ غَضِبَ خُسِفَ لَوْنُهُ وَاسْوَدَّ، قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ اللَّيْثِيْ يَقُوْلُ هِيَ الْمِرْاَةُ تُوْضَعُ فِي الشَّمْسِ فَيُرٰى ضَوْءُهَا عَلَى الْجِدَارِ يَعْنِي قَوْلَهُ مُلاَحَكُ الْجُدُرِ-

১৩৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি তাঁর চেহারা মুবারক দেখেই বোঝা যেতো। তিনি যখন কোনো ব্যাপারে খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক খুশির কারণে চমকাতে থাকতো এবং মনে হতো যেনো পাঁচিলের আলোকচ্ছটা আয়নার মতো তাঁর পবিত্র চেহারায় প্রতিফলিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে তিনি যখন কোনো বিষয়ে অসন্তুষ্ট হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক অসন্তোষ ও ক্রোধের কারণে মলিন ও বিবর্ণ হয়ে যেতো।

আবূ বাক্‌র (ইব্‌ন আবূ আযিম) (র) বলেন, আমি আবুল হাকাম লায়সীর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, নবী ﷺ-এর চেহারা মুবারক ছিল আয়নার মতো। তা সূর্যের আলোর সামনে রাখলে প্রাচীরে তার বিকিরণ ঘটতো।

١٣٨. عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا سَرَّهُ الْاَمْرُ اِسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ دَارَةُ الْقَمَرِ ـ

১৩৮. হযরত কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোনো বিষয়ে খুশি হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক দীপ্ত চাঁদের বৃত্তের মতো মনে হতো।

ফায়দা ঃ এ অনুচ্ছেদে গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য শুধু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির লক্ষণ ও তা বোঝা সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণনা করা। সুতরাং যে হাদীসেই এই অবস্থা সংক্রান্ত কথা বিদ্যমান ছিল তিনি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন নি।

কোনো বিষয়ে নবী ﷺ-এর খুশি ও সন্তুষ্ট হওয়ার লক্ষণ তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে তা স্পষ্ট ফুটে উঠতো। অনুরূপভাবে অপছন্দনীয় ও অনভিপ্রেত বিষয় তাঁর মনে সহসা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো, ফলে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে তাকালেই বোঝা যেতো যে, এ বিষয়টি তাঁর পছন্দনীয় নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি তাঁর চেহারা মুবারক দেখে অনুমান করতে পারতো। এর দ্বারা এও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নবী ﷺ সবচেয়ে অনুভূতিশীল ও কোমল-হৃদয় ছিলেন। তাঁর সুস্থ মনে প্রতিটি ভাল-মন্দ বিষয় সহসা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো। এক হাদীসে হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে পরিষ্কার বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লজ্জা-শরমের ক্ষেত্রে একজন পর্দানশীল কুমারীর চাইতেও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। তিনি যখন কোনো জিনিস অপছন্দ করতেন আমরা তা তাঁর চেহারা দেখেই বুঝে ফেলতাম। (মিশকাত, পৃষ্ঠা ৬১৯)

দ্বিতীয় যে বিষয়টি এই হাদীসসমূহ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও সুদর্শন ছিলেন। কোনো ব্যক্তি যখন নবী ﷺ-এর সৌন্দর্য বর্ণনা করতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করতেন। এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেহারা ছিল সবচেয়ে সুন্দর এবং তাঁর দেহের রং ছিল সবচেয়ে উজ্জ্বল। যেকোন ব্যক্তি তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনা করতো, সে তাঁর চেহারাকে পূর্ণিমার চাঁদের সাথে তুলনা করতো। (আল ফাযায়িলুল মুহাম্মাদিয়া, লিনুহাস, পৃষ্ঠা ১৮২)

এক হাদীসে আবূ ইসহাক সুবাঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত বারা'আ ইব্‌ন আযিব (রা)-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো যে, নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডল কি তলোয়ারের মতো

চমকদার ছিল ? তিনি বললেন, না। বরং পূর্ণিমার চাঁদের মতো উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান ছিল। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০২)

অন্য এক হাদীসে হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) বলেন, নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডল চন্দ্রের বৃত্ত সমতুল্য চমকদার ও গোল ছিল (আল ফাযায়িলুল মুহাম্মাদিয়া, পৃষ্ঠা ১৬৬, সূত্র আবূ নুআয়মের দালায়েল গ্রন্থ)।

এক হাদীসে হযরত জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখমণ্ডল চন্দ্র ও সূর্যের মতো উজ্জ্বল, দীপ্ত ও গোলাকার ছিল। (মুসলিম)

উপরোক্ত দু'টি হাদীসের প্রথমটিতে নবী ﷺ-এর পবিত্র মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল আয়নার সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় হাদীসে চন্দ্রের বৃত্তের সাথে যা চমকদারও হয় এবং গোলাকারও। এই দু'টি বস্তু অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বল বস্তু হলেও প্রকৃত অর্থে নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডলের সাথে তুলনা করা যোগ্য নয়। কোথায় চন্দ্র-সূর্য ও কোথায় তাঁর চমক্‌দার চেহারা মুবারক। যা মহান আল্লাহ্‌র মা'রিফফাতের নূর ও ওহীর নূর দ্বারা এরূপ উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত ছিল এই অনুভব জগতের কোনো বস্তুই তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।

١٣٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ ، فَقَالَ اَلَمْ تَرَى اِلٰى زَيْدٍ قَالَ أَبُوْبَكْرٍ لاَيَقُوْلُ أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ اِلاَّ اللَّيْثُ -

১৩৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার কাছে আনন্দিত অবস্থায় আগমন করলেন। আনন্দের আতিশয্যের দরুন তাঁর চেহারার লাবণ্য চমকাচ্ছিল। তিনি আনন্দিত কণ্ঠে বললেন, তুমি কি যায়দ সম্পর্কে কিছু শোননি ?

গ্রন্থকার শায়খ আবূ বাক্‌র (র) বলেন, এ হাদীসে উল্লিখিত أَسَارِيْرُ وَجْهِهِ (চেহারার লাবণ্য) শব্দটি হাদীসের রাবী লায়স ব্যতীত অন্য কোনো রাবী বর্ণনা করেন নি।

ফায়দা ঃ গ্রন্থকার (র) যেহেতু কেবল নবী ﷺ-এর আনন্দ চিহ্ন ও সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির লক্ষণসমূহ বর্ণনা করতে চেয়েছেন, তাই পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন নি। শুধু সেই অংশটুকুই উল্লেখ করেছেন, যা উদ্দেশ্য স্পষ্ট করার জন্য যথেষ্ট ছিল। পুরো হাদীসটি বুখারী শরীফে এই ভাষায় উল্লিখিত হয়েছে ঃ

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ তাঁর নিকট আগমন করলেন। তখন আনন্দে তাঁর মুখমণ্ডলের (অপরূপ) লাবণ্য চমকাচ্ছিল। অতঃপর তিনি (আনন্দিত কণ্ঠে) বললেন, আয়েশা! তুমি কি জানো না যে, খ্যাতনামা কাইয়্যাফ (Physiognomist) মুজযায মুদলাজী যায়দ ও উসামা সম্পর্কে কি বলেছে ? ঐ কাইয়্যাফ এ

দু'জনের পা দেখে বলেছে যে, তাদের পায়ের মধ্যে মিল ও সামঞ্জস্য রয়েছে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একজন পিতা ও একজন পুত্র। (বুখারী শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০২)

ঘটনা এই ছিল যে, হযরত উসামা (রা) হযরত যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-এর পুত্র ছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর গায়ের রং ছিল অত্যন্ত কালো এবং তাঁর পিতা হযরত যায়দ ইব্ন হারিসা (রা)-এর গায়ের রং ছিল অত্যন্ত ফর্সা। এজন্য মক্কার মূর্খ লোকেরা তাঁর বংশ সম্পর্কে খোঁটা দিতো। তারা বলতো যে, উসামা যায়দের পুত্র নয়। (নাউযুবিল্লাহ্)

হযরত যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) বনূ কিলাব গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর মাতা একবার তাঁকে সাথে নিয়ে তাঁর গোত্রে গিয়েছিলেন। সেখানে লুটতরাজ সংঘটিত হলো, লুটেরারা হযরত যায়দকে ধরে নিয়ে উকায বাজারে বিক্রি করলো। হযরত হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) তাকে তাঁর ফুফু খাদীজা (রা)-এর জন্য চারশ' দিরহামে খরিদ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হযরত খাদীজা (রা)-কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন, তখন তিনি তাঁর গোলাম হযরত যায়দ ইব্ন হারিসাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সেবাযত্নের জন্য তাঁকে দান করলেন। যায়দের পিতা হারিসা (রা) যখন তাঁর পুত্রের খবর জানতে পারলেন, তখন তিনি তাকে নেয়ার জন্য নবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলেন। নবী ﷺ যায়দকে ইখ্তিয়ার দিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর পিতার সাথে আপন গৃহ ও গোত্রে ফিরে যেতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে নবী ﷺ-এর কাছে থেকেও যেতে পারেন। হযরত যায়দ (রা) তাঁর পিতার সাথে যেতে অস্বীকার করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সান্নিধ্যে থাকাকে স্বীয় গোত্র ও মাতা-পিতার উপর প্রাধান্য দিলেন। নবী ﷺ তাঁকে পোষ্যপুত্র বানিয়ে নিলেন এবং হযরত উম্মু আয়মান (রা)-এর সাথে তাঁকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করলেন। এর গর্ভেই তাঁর পুত্র হযরত উসামা (রা) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার রং-এর স্থলে মাতার রং অর্থাৎ কালো রং-এর হয়েছিলেন। তাই আরবের মূর্খ লোকেরা তাঁর বংশ সম্পর্কে সন্দেহ করতো এবং ভর্ৎসনা করতো। কিন্তু জনৈক কাইয়্যাফ যখন তাদের দু'জনের পা দেখে সত্য কথা ব্যক্ত করলো যে, উসামা ও যায়দ পিতা-পুত্র, তখন নবী ﷺ খুব খুশি হলেন এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছেও তিনি তাঁর খুশির কথা ব্যক্ত করলেন। এমন কি সে খুশির নিদর্শন তাঁর মুখমণ্ডলেও পরিদৃষ্ট হচ্ছিল। তাঁর চেহারা মুবারক আনন্দের আতিশয্যে চমকাচ্ছিল। হযরত যায়দ ও উসামা (রা) দু'জনই নবী ﷺ -এর খুব প্রিয় ছিলেন।

এই হাদীসটিই বুখারী শরীফের অন্য একস্থানে এই ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, একবার এক কাইয়্যাফ আমাদের নিকট এলো তখন নবী ﷺ উপস্থিত ছিলেন এবং উসামা ইব্ন যায়দ ও যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) উভয়ে (পিতা-পুত্র) একই চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলেন। তাদের শুধু পা চাদরের বাইরে ছিল। তখন ঐ কাইয়্যাফ তাঁদের পা দেখে বললো, এই পাগুলো পরস্পর মিলে যাচ্ছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন,

কাইয়্যাফের এই উক্তির ফলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অত্যন্ত খুশি হলেন। কেননা আরবের লোকেরা কাইয়্যাফের কথা বিশেষত বংশের ক্ষেত্রে দলীল রূপে গণ্য করতো। সুতরাং কাইয়্যাফের এই সাক্ষ্য কুরায়শদের জন্য দাঁতভাঙ্গা জবাব ছিল। একারণেই নবী ﷺ তার কথা পছন্দ করলেন এবং তিনি হযরত আয়েশার সাথেও এ বিষয়টি আলোচনা করলেন। (বুখারী শরীফ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২০)

١٤٠. عَنْ عَلِيُّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَاى مَايُحِبُّ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ۔

১৪০. হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোনো পছন্দনীয় জিনিস দেখতেন, তখন বলতেন (الحمد لله الذى بنعمته......) সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার জন্য, যাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সমস্ত ভাল কাজ সম্পন্ন হয়।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, নবী ﷺ-এর খুশি ও সন্তুষ্টির এক বাচনিক নির্দশন এও ছিল যে, তিনি যখন কোনো পছন্দনীয় বিষয় দেখতেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণ গাইতেন এবং বলতেন اَلْحَمْدُ اللّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ। যেনো এটি কিংবা এই ধরনের আরো প্রশংসা-বাণী তাঁর খুশি ও পছন্দের নিদর্শন ছিলো।

١٤١. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ شَهِدْتُ مِنَ الْمِقْدَادِ مَشْهَداً لِاَنْ اَكُوْنَ اَنَا صَاحِبُهُ اَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا فِى الاَرْضِ مِنْ شَئٍ وَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا غَضِبَ اِحْمَرَّ وَجْهُهُ

১৪১. তারিক ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, আমি হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদের এমন এক মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত আছি, সে মর্যাদা যদি আমি লাভ করতে পারতাম, তবে দুনিয়ার সকল সম্পদ থেকে আমার কাছে তা প্রিয়তর হতো। হযরত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোনো ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হতেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল ক্রোধে লাল হয়ে যেতো।

ফায়দা ঃ এ হাদীসের শেষাংশ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অসন্তুষ্টির চিহ্ন এই ছিলো যে, তাঁর মুখমণ্ডল ক্রোধে লাল হয়ে উঠতো। এ হাদীসের প্রথম অংশ এক দীর্ঘ হাদীসের সংক্ষিপ্তসার। বুখারী মুসলিমের বিভিন্ন অধ্যায়ে তা সবিস্তার বর্ণিত রয়েছে। যেমন এক হাদীসে তারিক ইব্ন শিহাব (র) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি হযরত মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা)-এর এমন এক মর্তবা ও মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছি, সে মর্তবা ও মর্যাদা দুনিয়ার সকল সম্পদ থেকে আমার কাছে

প্রিয়তর। সে মর্যাদা হচ্ছে এই যে, একবার মিকদাদ ইব্ন আসওয়াদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর দরবারে হাজির হলেন। তখন নবী ﷺ লোকদেরকে কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করছিলেন। তখন মিকদাদ (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মূসা (আ)-এর জাতি যেরূপ তাদের নবী হযরত মূসাকে বলেছিলো যে, যাও, তুমি এবং তোমার রব দু'জনে গিয়ে আমালিকা জাতির সাথে যুদ্ধ করো আর আমরা এখানে বসে রইলাম। সেরূপ আমরা কখনো আপনাকে বলবো না। বরং আপনার ডানে-বামে, সামনে-পেছনে থেকে কাফিরদের সাথে তুমুল যুদ্ধ চালিয়ে যাবো এবং শেষ রক্তবিন্দু প্রবাহিত করবো। হাদীসের রাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন, আমি লক্ষ করলাম মিকদাদের এই কথা নবী ﷺ খুব পছন্দ করলেন এবং আনন্দে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠলো। (বুখারী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬৪)

হযরত মিকদাদ (রা)-এর এই জীবন-উৎসর্গমূলক উক্তি নবী ﷺ খুব পছন্দ করলেন। তাই হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) আকাঙ্ক্ষা করলেন যে, হযরত মিকদাদ (রা) তাঁর ঐ জীবন-উৎসর্গকারী বক্তব্য দ্বারা যে মর্তবা হাসিল করেছেন, তা যদি আমিও লাভ করতে পারতাম।

١٤٢. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا غَضِبَ أَحْمَرَ وَجْهُهُ ـ

১৪২. হযরত উম্মু সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন রাগান্বিত হতেন, তখন তাঁর চেহারা মুবারক রাগে লাল হয়ে উঠতো।

ফায়দা ঃ এর পূর্ববর্তী হাদীসটির বিষয়বস্তুও একই। যাতে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ যখন কোনো কিছু অপছন্দ করতেন, কিংবা রাগান্বিত হতেন, তখন তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল রাগে লাল হয়ে উঠতো।

١٤٣. عَنْ أَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا فَلَمَّا أَكْثَرُوْا عَلَيْهِ غَضِبَ فَلَمَّا رَاٰى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ قَالَ أَنَا نَتُوْبُ أَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ عَمَّا كَرِهَ ـ

১৪৩. হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যা তাঁর অপছন্দনীয় ছিল। তিনি নীরব থাকলেন। কিন্তু লোকেরা যখন সে বিষয়ে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। হযরত উমর (রা) যখন তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন দেখলেন, তখন বললেন, আমরা আল্লাহ্র কাছে এমন বিষয় সম্পর্কে তাওবা করছি যা নবী ﷺ পছন্দ করেন না।

ফায়দা ঃ এ হাদীসেও এই বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, নবী ﷺ-এর মুখমণ্ডল দেখেই তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের অনুমান করা যেতো। যেমন হযরত উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন দেখে অনুমান করেছিলেন যে, তিনি এখন রাগান্বিত আছেন। তাই তৎক্ষণাৎ সবার পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে আল্লাহ্র কাছে তাওবা করেন।

مَارُوِيَ فِيْ اِغْضَائِهِ وَاِعْرَاضِهِ عَمَّاكَرِهَهُ ﷺ

নবী ﷺ কর্তৃক অপছন্দনীয় জিনিস পরিহার ও এড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ

١٤٤. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَلَّمَا يُوَاجِهُ اَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ، فَقَرَّبَ اِلَيْهِ صَفْحَةً فِيْهَا قَرْعٌ وَكَانَ يَلْتَمِسُهُ بِاَصَابِعِهِ فَدَخَلَ رَجُلٌ عَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَكَرِهَهُ ، فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا حَتّٰى خَرَجَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ قُلْتُمْ لِهٰذَا اَنْ يَدَعَ هٰذِهِ يَعْنِي الصُّفْرَةَ ـ

১৪৪. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর অভ্যাস ছিলো, তিনি কারো সামনা-সামনি কোনো কথা খুব কমই বলতেন। অর্থাৎ তাঁর অপছন্দনীয় কোন জিনিস দেখলেও সামনা-সামনি খুব কমই তার প্রতিবাদ করতেন। (সুতরাং) একবার তাঁর সামনে লাউ তরকারির একটি পেয়ালা পেশ করা হলো। তিনি অঙ্গুলি দ্বারা লাউয়ের টুক্রা খোঁজ করছিলেন। তখন এমন এক ব্যক্তি তাঁর নিকট প্রবেশ করলো যার গায়ে হলুদ রং-এর খুশ্বুর চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিল। লোকটির এভাবে নবী ﷺ -এর নিকট আসা তাঁর পছন্দ হলো না। কিন্তু তিনি তাকে কিছুই বললেন না। লোকটির এ ধরনের রং ব্যবহার নবী ﷺ-এর পছন্দ হলো না, কিন্তু তিনি কিছুই বলার পূর্বে লোকটি বের হয়ে গেল। তখন নবী ﷺ অপর এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি যদি সে লোকটিকে বলে দিতে যে, হলুদ রং ব্যবহার ছেড়ে দিলেই ভাল হতো।

ফায়দা ঃ এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায় নবী ﷺ কারো থেকে অপছন্দনীয় কোন জিনিস হতে দেখে সাথে সাথেই তাকে সাবধান করতেন না। বরং অধিকাংশ সময় উম্মতের প্রতি সহানুভূতিবশত এড়িয়ে যেতেন। লোকটিকে তৎক্ষণাৎ সামনা-সামনি কিছু না বলার পেছনে রহস্য এই ছিলো যে, এভাবে সামনা-সামনি বললে হয়ত লোকটি তাঁর কথা মান্য না করতেও পারে। এতে লোকটির ইহলোক ও পরলোকের সমূহ ক্ষতি হয়ে যাবে। আর নবী ﷺ-এর কর্মনীতি এসব বিষয়ের ব্যাপারে হতো যা কোন 'উত্তম কাজ' পরিহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। এবং এরূপ বিষয়ে দেরিতে সাবধান করলে কোনরূপ ক্ষতি নেই। কিন্তু কোন হারাম ও শরীয়ত নিষিদ্ধ অশ্লীল কাজের বিষয়ে তিনি তৎক্ষণাৎই পাকড়াও করতেন। যাহোক নবী ﷺ ছিলেন তাঁর উম্মতের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও মেহেরবান। তাঁর এই দয়া ও স্নেহের কারণেই তিনি কোন অপছন্দনীয় ব্যাপারে যা শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ নহে সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করতেন না। এর দ্বারা নবী ﷺ-এর উত্তম তালীম ও তারবিয়াতের (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) অনুমান করা যায়।

١٤٥. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِاَبْصَارِهِمْ وَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى اَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَاَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنِي لٰكِنِّي سَكَتُّ قَالَ فَدَعَانِي النَّبِيُّ ﷺ بِاَبِيْ وَاُمِّيْ مَارَاَيْتُ مُعَلِّمًا اَحْسَنَ تَعْلِيْمًا مِنْهُ مَا ضَرَبَنِيْ وَلَا سَبَّنِيْ ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَالتَّحْمِيْدُ۔

১৪৫. হযরত মুয়াবিয়া ইব্ন আবুল হাকাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে জামায়াতে নামায আদায় করি। (নামাযের মধ্যেই) এক ব্যক্তির হাঁচি এল। রাবী বলেন, (আমি 'আলহামদুলিল্লাহ্' -এর জবাবে) 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলে ফেললাম। তখন নামাযরত লোকেরা আমাকে চোখ তুলে দেখতে লাগলো এবং উরুর উপর হাত মারতে শুরু করলো। আমি দেখলাম তারা আমাকে জোর করে চুপ করাতে যাচ্ছে (তখন আমার খুব খারাপ লাগলো)। কিন্তু আমি নিশ্চুপ রইলাম। (নামায শেষে) নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমার মাতাপিতা তাঁর জন্য কুরবান হোন। আমি নবী ﷺ -এর চেয়ে কোন উত্তম শিক্ষক দেখি নাই। তিনি আমাকে না মারধর করলেন, না বকাঝকা করলেন। তারপর বললেন ঃ নামাযে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা ঠিক নয়, নামায হলো আল্লাহ্র তাসবীহ্ (গুণগান) তাকবীর (মহানত্ব) তামহীদ (প্রশংসা)-এর নাম।

ফায়দা ঃ এ ঘটনা হলো তখনকার যখন হযরত মুয়াবিয়া ইব্ন আবুল হাকাম (রা) ছিলেন নও মুসলিম। তখনও তিনি নামাযের সকল বিধি-বিধান শিখতে পারেন নি। তাই এ ঘটনা ঘটে গেল। হযরত মুয়াবিয়া (রা) নিজেই বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর আমাকে ইসলামের কিছু কিছু বিধি-বিধান শেখানো হয়েছিলো। তন্মধ্যে আমাকে এও শেখানো হয়েছিলো যে, তোমার হাঁচি এলে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বলবে। আর যদি অপর কারো হাঁচি আসে এবং সে 'আলহামদুল্লিাহ্' বলে তবে এর জবাবে তুমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলবে। হযরত মুয়াবিয়া (রা) বলেন, একবার আমি নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়ছিলাম। এক ব্যক্তির হাঁচি এল। আর সে 'আলহামদুলিল্লাহ্' বললো। আমি তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বললাম। লোকেরা আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে লাগলো। বিষয়টি আমার ভীষণ খারাপ লাগলো। আমি নামাযের মধ্যেই তাদেরকে বলে ফেললাম তোমরা আমার দিকে চোখ তুলে কেনো দেখছো ? আমার এ অবস্থা দেখে তারা সুবহানাল্লাহ্ বললো। তারপর নবী ﷺ যখন নামায শেষ করলেন তখন জিজ্ঞেস করলেন, নামাযে কে কথা বললো ? তারপর তিনি নিজেই বললেন ঃ এ বেদুঈন। তারপর তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, নামায ত কুরআন পড়া, এবং আল্লাহ্র যিকরের জন্য। সুতরাং তুমি যখন নামাযে থাকবে তখন এ

সবই পড়বে। (দুনিয়াবী কথাবার্তা বলবে না।) এ ঘটনা বর্ণনার পর বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে স্নেহপরায়ণ ও মেহেরবান শিক্ষক জীবনেও দেখিনি।

গ্রন্থকারের এ হাদীসটি এ অনুচ্ছেদে সংকলনের উদ্দেশ্য হলো নবী ﷺ কর্তৃক সাহাবায়ে কিরামের বিভিন্ন ছোট-খাটো ত্রুটিবিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়ার অবস্থা বর্ণনা করা এবং তিনি কিভাবে ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা দিয়ে তালীম দিতেন তা তুলে ধরা। নবী ﷺ-এর এই অনুপম আদর্শ আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য।

١٤٦. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا فِى الْمَسْجِدِ وَأَصْحَابُهُ مَعَهُ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِىِّ ﷺ مَهْ مَهْ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ تَزْرِمُوْهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنَ الْقَذْرِ وَالْبَوْلِ وَالْخَلاَءِ أَوْكَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ-

১৪৬. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে অবস্থান করছিলেন। সাহাবা কিরামও তাঁর সাথে বসেছিলেন। ইত্যবসরে এক বেদুঈন সেখানে আসল এবং মসজিদের মধ্যেই (এক পাশে) পেশাব করতে লাগলো। সাহাবা কিরাম হায়! হায়! বলে তাকে পেশাব করতে বিরত রাখতে চাইলেন। কিন্তু নবী ﷺ বললেন ঃ তাকে পেশাব করতে বাধা দিও না। তারপর ঐ বেদুঈন যখন পেশাব করা শেষ করলো, তখন তাকে তিনি বললেন, দেখো, এই মসজিদগুলো আবর্জনা ছড়ানো ও পেশাব পায়খানা করার জন্য নয়। কিংবা এই ধরনেরই কোনো উক্তি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ করেছেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকেও নবী ﷺ -এর অপরিসীম দয়া ও মমত্ববোধের অনুমান করা যায়। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আছে, ঐ বেদুঈন যখন পেশাব করা শেষ করলো, তখন নবী ﷺ পানি আনিয়ে স্বয়ং এ স্থানটি ধৌত ও পবিত্র করান। পেশাব করার মাঝখানে ঐ বেদুঈনকে বাধা দিতে তাঁর নিষেধ করার কারণ হচ্ছে, পেশাব করার মাঝখানে বাধা দিলে তাতে তার কষ্ট হতে পারতো এবং মূত্রনালিতে পেশাব আটকে যেতে পারতো। এক রিওয়ায়াতে আছে, নবী ﷺ ঐ ব্যক্তিকে ডেকে বললেন ঃ এই মসজিদসমূহ পেশাব ও ময়লা ছড়ানোর জন্য নয়। এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র, নামায ও কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য বানানো হয়েছে। এ হাদীসগুলো উম্মতের সাধারণ মানুষের জন্য উপদেশ ও তালীম-তারবিয়াতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে এক বিরাট শিক্ষা। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মূর্খসুলভ কাজকর্মে ধৈর্যধারণ করে তাদেরকে স্নেহ ও ভালবাসার সাথে দীনী বিষয়সমূহ শিক্ষা দেয়া উচিত।

١٤٧. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا بَلَغَهُ عَنْ رَجُلٍ شَيْئٌ لَمْ يَقُلْ لَهُ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا بَلْ قَالَ مَابَالُ اَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا ـ

১৪৭. **হযরত আয়েশা** (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো অপছন্দনীয় বিষয় অবগত হতেন, তখন তিনি তাকে সম্বোধন করে একথা বলতেন না যে, তুমি এরূপ এরূপ বলেছো। বরং তিনি (অনির্দিষ্টভাবে) বলতেন, লোকদের কি হয়েছে যে, তারা এরূপ এরূপ কথা বলছে ?

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকেও নবী ﷺ সুসামাজিকতা ও মননশীলতার অনুমান করা যায়। তিনি কখনো কাউকে সম্বোধন করেও সাবধান করতেন না। আর কারো নাম ধরেও তার অপছন্দনীয় বিষয় প্রকাশ করতেন না। বরং তিনি যদি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো অপছন্দনীয় বিষয় অবহিত হতেন এবং তিনি তাকে সতর্ক করতে চাইতেন, তবে সাধারণভাবে সাবধান করে দিতেন। যেমন তিনি বলতেন, লোকদের কি হয়েছে যে, এরূপ অলীক কথা বলে। তিনি কখনো এরূপ বলতেন না যে, অমুক ব্যক্তির কি হয়েছে যে, এরূপ অলীক কথা বলে। এ হচ্ছে তালীম-তারবিয়াতের এমন এক শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি যাতে ঝগড়া-বিবাদ ও শত্রুতা সৃষ্টি হয় না। আর যাকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হলো, সেও তার ভ্রান্তির ব্যাপারে অপর লোকের সামনে লজ্জিত হয় না। সামাজিক আচার বা শিক্ষার ব্যাপকতা ও সার্বজনীনতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উম্মতকে কত পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, তা এই ধরনের ঘটনাবলি থেকেই অনুমিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর পদাংক অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

١٤٨. عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرِفَ ذٰلِكَ فِىْ وَجْهِهٖ ـ

১৪৮. হযরত ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোনো বিষয় অপছন্দ করতেন, তা তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল থেকেই অনুমান করা যেতো।

ফায়দা ঃ এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীস এবং পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ "নবী ﷺ -এর সন্তুষ্টির ও অসন্তুষ্টি নিদর্শন"–এ সবিস্তার বর্ণিত হয়েছে।

এখানে গ্রন্থকার এ হাদীসটি কেবল এজন্য বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ প্রতিটি বিষয়ে সামনা-সামনি কাউকে ভর্ৎসনা করতেন না, বরৎ তিনি কোনো বিষয়কে অপছন্দ করলে নীরব থাকতেন। কিন্তু এই অপছন্দ তাঁর মুখমণ্ডলে অবশ্যই প্রকাশ পেতো। কোনো কোনো অপছন্দনীয় বিষয় এমন হয়, যা কেবল চেহারা দ্বারা প্রকাশ করাই যথেষ্ট হয় এবং কোনো

কোনো বিষয় মুখে প্রকাশ করারও প্রয়োজন হয়। প্রথম হাদীসটি শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কিত ছিলো। অনুরূপভাবে কোনো কোনো লোক এমন হয়ে থাকে, যাদের সতর্ক করার জন্য কেবল চেহারা দ্বারা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাই যথেষ্ট হয় এবং কোনো কোনো লোককে সতর্ক করার জন্য মুখে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। এই দুই হাদীসের মধ্যে নবী ﷺ-এর কর্ম-পদ্ধতির পার্থক্য এর উপরই নির্ভরশীল। যা হোক, নবী ﷺ যে সব লোককে সংশোধন করতে চাইতেন, তিনি তার কথা ও কাজ দ্বারা তার মনে কোনো কষ্ট দিতেন না। কেননা, সংশোধন ও শিক্ষা-দীক্ষার কাজে মনে কষ্ট দান ক্ষতিকর। এতে ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়।

١٤٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ وَجْدُهُ أَكْثَرَ مَسَّ لِحْيَتِهِ ـ

১৪৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোনো কঠিন সংকটে পতিত হতেন, তখন তিনি বারংবার (মুবারক) দাড়িতে হাত বুলাতেন।

ফায়দা ঃ এ অবস্থা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতাকেই প্রকাশ করে। নচেৎ সাধারণত মানুষ এরূপ ক্ষেত্রে মুখে তার মনের আক্রোশ প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু তাতে সাধারণত ক্ষতি হয়। ন্যূনপক্ষে এই দুঃখ ও উষ্মা প্রকাশে মানুষের মনে কষ্ট হয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এ পদ্ধতি পরিহার করতেন এবং স্বয়ং কষ্ট সহ্য করতেন।

١٥٠. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ عِنْدَ إِحْدٰى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَأَرْسَلَتْ إِحْدٰى نِسَائِهِ بِقَصْعَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ بِيَدِ الرَّسُوْلِ فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا الأُخْرٰى ثُمَّ جَعَلَ وَيَجْمَعُ الطَّعَامَ فَيَقُوْلُ غَارَتْ أُمُّكُمْ كُلُوْا فَكُلُوْا، فَجَلَسَ الرَّسُوْلُ حَتّٰى جَاءَتِ الْكَاسِرَةُ بِقَصْعَتِهَا الَّتِىْ هِىَ فِىْ بَيْتِهَا فَدَفَعَ الصُّحْفَةَ الصَّحِيْحَةَ إِلَى الرَّسُوْلِ وَتَرَكَ الْمَكْسُوْرَةَ فِى الَّتِى كَسَرَتْهَا ـ

১৫০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর মধ্য থেকে কোনো একজনের নিকট অবস্থান করছিলেন। ইত্যবসরে তাঁর সহধর্মিণীদের মধ্য থেকে কোনো একজন (কিছু খাদ্যদ্রব্যসহ) একটি বাটি তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। যে উম্মুল মু'মিনীনের নিকট তিনি ঐ দিন অবস্থান করছিলেন, তিনি খাদ্য নিয়ে আগমনকারীর হাতে হাত দ্বারা আঘাত করলেন। ফলে বাটি পড়ে গিয়ে ভেঙে গেলো। নবী ﷺ তার উভয় টুক্রা তুলে নিলেন এবং তাকে একে অপরের সাথে মিলিয়ে নিলেন। এরপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খাবারগুলো একত্রিত করে বললেন যে, তোমাদের মায়ের (উম্মুল

মু'মিনীনের) আত্মমর্যাদাবোধে (আঘাত) লেগেছে, তোমরা খাবারগুলো খেয়ে ফেলো। সুতরাং সবাই তা খেয়ে ফেললো। খাবার নিয়ে আগমনকারী বাটি নেয়ার জন্য বসে রইল। ইতিমধ্যে বাটিটি যাঁর হাতে ভেঙেছিলো, তিনি তাঁর ঘর থেকে একটি নিখুঁত বাটি নিয়ে এলেন। নবী ﷺ খাবার নিয়ে আগমনকারীকে ঐ নিখুঁত বাটিটি দিয়ে দিলেন এবং ভাঙা বাটিটি যিনি ভেঙেছিলেন তাঁরই ঘরে রেখে দিলেন।

ফায়দা ঃ এ ঘটনাটিও নবী ﷺ-এর মহৎ ক্ষমা গুণের জ্বলন্ত প্রমাণ। ঘটনাটি ছিলো এরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর গৃহে অবস্থান করছিলেন। এই সময় তাঁর অন্য এক সহধর্মিণী কারো মাধ্যমে একটি বাটিতে করে কিছু খাবার নবী ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। একজন নারী হিসাবে হযরত আয়েশা (রা)-এর আত্মমর্যাদায় বাধলো যে, তাঁর গৃহে তাঁর কোনো সতীনের পক্ষ থেকে তাঁর স্বামীর জন্য খাবার আসবে। তাই তিনি ঐ কাজটি করলেন। একটু চিন্তা করুন, নবী ﷺ-এর বিবেচনায় এ কাজটি কতখানি অপছন্দনীয় হতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে হযরত আয়েশা (রা)-এর এহেন কাজের কোনো কৈফিয়ত তলব করলেন না কিংবা তাঁকে ভর্ৎসনাও করলেন না। বরং হযরত আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে নারী জাতির স্বভাবগত আত্মমর্যাদাবোধের (ঈর্ষা) ওজর পেশ করে অন্যদেরকেও নারীর এই স্বভাবগত দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং বিক্ষিপ্ত খাবারগুলো একত্রিত করে নিজেও খেলেন ও অন্যদেরকেও খাওয়ালেন। বস্তুত এটা নবী ﷺ-এরই মহান চরিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ যে, অপছন্দনীয় বিষয়ের অপছন্দনীয় অংশটুকু উপেক্ষা করে শুধু তার কৈফিয়ত তলব করা ও ভর্ৎসনা করা থেকেই বিরত থাকেননি, বরং তার সপক্ষে প্রকৃতিগত দাবির ওজরও বর্ণনা করেন।

١٥١. عَنْ أَنَسٍ قَالَ اسْتَحْمَلَ أَبُوْ مُوْسٰى النَّبِىَّ ﷺ، فَوَافَقَ مِنْهُ شَغَلاً فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ أَحْمِلُكَ، فَلَمَّا قَفَا دَعَاهُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ حَلَفْتَ لاَ تَحْمِلُنِىْ قَالَ وَأَنَا أَحْلِفُ لأَحْمِلَنَّكَ فَحَمَلَهُ ـ

১৫১. হযরত আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আবূ মূসা আশআরী (রা) নবী ﷺ-এর নিকট সফরের জন্য বাহন চাইলেন। নবী ﷺ তখন কোনো কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! এখন আমি তোমাকে কোনো বাহন দেবো না। কিন্তু আবূ মূসা আশআরী (রা) যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন নবী ﷺ তাকে বাহন দেওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন আবূ মূসা আশআরী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তো আমাকে বাহন না দেওয়ার কসম খেয়েছেন। নবী ﷺ তখন বললেন, এখন আমি কসম করে বলছি যে, তোমাকে অবশ্যই বাহন দেবো। সুতরাং তিনি তাঁকে বাহন দিয়ে দিলেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীসের মর্ম সুস্পষ্ট। কোনো কোনো হাদীসে বর্ণিত আছে, যেহেতু তখন নবী ﷺ-এর নিকট দেওয়ার মতো কোনো বাহন ছিলো না, তাই তিনি বাহন দিতে অস্বীকার করেছিলেন। মুসলিম শরীফের (কিতাবুল ঈমান) এক হাদীসে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি একবার আমার কতিপয় আশআরী বন্ধুর সাথে নবী ﷺ -এর নিকট সফরের জন্য বাহন চাইতে গেলাম। কিন্তু তিনি বাহন দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাকে দেওয়ার মতো কোনো বাহন নেই। (বর্ণনাকারী বলেন) এরপর কিছুক্ষণ আমরা নবী ﷺ-এর দরবারে অবস্থান করলাম। ইতিমধ্যে তাঁর কাছে কোথাও থেকে কিছু উট এসে গেলো। সুতরাং তিনি উটগুলোর মধ্য থেকে সাদা কুঁজওয়ালা তিনটা উট আমাদেরকে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। উট নিয়ে আমরা চলতে লাগলাম। আমি কিংবা আমাদের মধ্য থেকে কেউ বললো, এ উটগুলোর মধ্যে আল্লাহ্ বরকত দান করবেন না। কেননা, আমরা এসে যখন নবী ﷺ-এর নিকট বাহন প্রার্থনা করেছিলাম, তখন তিনি বাহন না দেয়ার কসম খেয়েছিলেন। আর এখন আমাদেরকে বাহন দিয়েছিলেন। সুতরাং তারা নবী ﷺ -এর নিকট ফিরে এলো এবং তাঁকে একথা জানালো। তিনি বললেন, আমি তো তোমাদেরকে বাহন দেইনি। তোমাদেরকে বাহন দিয়েছেন আল্লাহ্ তা'আলা। আর আল্লাহ্‌র কসম! আমি যদি কখনো কসম করি, এবং তার বিপরীতে তার চেয়ে উত্তম দেখতে পাই, তবে আমি সে কাজ করে ফেলি এবং কসমের কাফ্‌ফারা প্রদান করি।

এ হাদীস থেকে এও জানা গেলো, যদি কোনো বিষয়ে কসম খাওয়া হয় এবং এর বিপরীত কোন বস্তুতে মংগল বা কল্যাণ পরিলক্ষিত হয়, তবে ঐ কসম ভেঙে ফেলা উচিত এবং কসমের কাফ্‌ফারা প্রদান করা উচিত।

যেমন এক হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, নবী ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম খেয়েছে, তারপর ভিন্ন কাজ তার থেকে উত্তম পেয়েছে, ঐ উত্তম কাজটিই সে গ্রহণ করবে এবং সে তার পেছনের কসমের কাফ্‌ফারা প্রদান করবে। (মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮)

١٥٢. عَنْ أَنَسٍ قَالَ كُسِرَتْ رُبَاعِيَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَشُجَّ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيْلُ عَلٰى وَجْهِهِ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ وَيَقُوْلُ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوْا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ بِالدَّمِ وَهُوَ يَدْعُوْهُمْ إِلٰى رَبِّهِمْ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَئٌ

১৫২. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধের দিন নবী ﷺ -এর দাঁত মুবারক ভেঙে গিয়েছিলো, শির মুবারক জখম হয়েছিল এবং রক্ত তাঁর চেহারা বেয়ে পড়ছিলো। তখন তিনি রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন ঃ সে জাতি কিরূপে

কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা তাদের নবীর চেহারাকে রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র দীনের প্রতি দাওয়াত দিচ্ছেন। তখন মহান আল্লাহ্ এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ 'لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَئٌّ' এ ব্যাপারে আপনার কোনো ইখ্তিয়ার নেই।

ফায়দা ঃ এটি উহুদ যুদ্ধের প্রসিদ্ধ ঘটনা, যা তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিলো। এ যুদ্ধেই প্রায় ৭০ জন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। দৃঢ়তা, ত্যাগ ও জীবন কুরবানীর দরুনই আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের একটি ক্ষুদ্র দলকে কাফিরদের বিরাট বাহিনীর মুকাবিলায় পরাজয়ের পর বিরাট বিজয় দান করেন। এই যুদ্ধেই এক হতভাগ্য আবদুল্লাহ্ ইব্ন কুমাইয়্যা মুসলমান ব্যূহ ভেদ করে সামনে অগ্রসর হয় এবং নবী ﷺ-এর শিরস্ত্রাণের উপর তলোয়ারের আঘাত হানে। ফলে তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয় এবং শির মুবারক জখম হয়। এই অবস্থায় তাঁর পবিত্র মুখ দিয়ে এই উক্তি নিঃসৃত হলো "সেই জাতি কিভাবে কল্যাণ লাভ করতে পারে, যারা তাদের নবীর চেহারাকে জখম করে দেয়।" কিন্তু আল্লাহ্ পাক রহমতে আলমের মুখ-নিঃসৃত এই উক্তি পছন্দ করলেন না। আয়াত নাযিল হলো ঃ لَيْسَ لَكَ مِنَ الاَمْرِ شَئٌّ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظَالِمُوْنَ তাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হবেন অথবা তাদেরকে শাস্তি দিবেন এ বিষয়ে (হে নবী) আপনার করণীয় কিছুই নেই। কারণ তারা সীমালংঘনকারী।

এ ঘটনা থেকেই অনুমান করুন যে, নবী ﷺ কি পরিমাণ ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করতেন। মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার পরও তিনি ঐ কাফির ও মুশরিকদের জন্য মুখে বদ্ দু'আ করেননি এবং একজন মানুষ হিসেবে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে যে উক্তি প্রকাশ পেয়েছে তাও আল্লাহ্র নিকট তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত মনে করা হয়নি। তাই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে তৎক্ষণাৎ বলে দেয়া হয়েছে যে, এটা আপনার কাজ নয়। আপনার কাজ তো হচ্ছে ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন করা। কেননা, আপনাকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতরূপে প্রেরণ করা হয়েছে।

রিওয়ায়াতসমূহে দেখা যায় যে, এই কষ্টদায়ক জখম অবস্থায়ও নবী ﷺ -এর মুখে ছিলো এই বাণী ঃ 'رَبِّ اغْفِرْ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لاَيَعْلَمُوْنَ' হে আল্লাহ্! আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা করো। কেননা, তারা জানে না।

١٥٣. عَنِ الشِّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا اَسْأَلُهُ شَيْئًا فَجَعَلَ يَعْتَذِرُ اِلَىَّ -

১৫৩. হযরত শিফা বিন্ত আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একবার আমি কিছু চাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট গেলাম। কিন্তু তিনি আমার কাছে অপারগতা প্রকাশ করলেন। (কেননা, তাঁর নিকট তখন দেয়ার মতো কোনো সম্পদ ছিলো না।)

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ এ সাহাবিয়াকে অভদ্র বা শক্ত কথা বলে বিদায় করেননি। বরং সৌজন্য ও ভদ্রতা বজায় রেখে তার কাছে অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এখন আমার কাছে দেয়ার মতো কিছু নেই। নচেৎ আমি তোমাকে অবশ্যই কিছু দিতাম। অথচ এই অপারগতা প্রকাশ করারও তাঁর প্রয়োজন ছিল না।

١٥٤. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَذِرُ اِلَى صَفِيَّةَ وَيَقُوْلُ يَاصَفِيَّةُ إِنَّ أَبَاكَ أَلَّبَ عَلَىَّ الْعَرَبَ وَفَعَلَ حَتّٰى ذَهَبَ ذٰلِكَ مِنْ نَفْسِهَا ـ

১৫৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (উম্মুল মু'মিনীন হযরত) সাফিয়্যা (রা)-এর কাছে (তাঁর পিতার হত্যা সম্পর্কে, যে খায়বারের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিল) ওজর পেশ করতে থাকেন এবং বললেন ঃ হে সাফিয়্যা! তোমার পিতাই তো সারা আরবের লোকদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উস্কিয়ে ছিলো এবং তাদেরকে সমবেত করেছিলো। এরূপ ওজর পেশ করার দরুন তাঁর অন্তর থেকে এই দুঃখ অন্তর্হিত হয়ে যায়।

ফায়দা ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়্যা (রা) খায়বার অধিপতির কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলো বনূ নাযীর গোত্রের বিরাট ধনী ব্যক্তি। পিতা ও স্বামী উভয়েই খায়বারের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। খায়বার দুর্গ বিজিত হওয়ার পর অন্যান্য যুদ্ধবন্দীর সাথে হযরত সাফিয়্যাও বন্দী হন। তাঁর এই আভিজাত্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের দরুন এবং তাঁর মনোরঞ্জন ও মনস্তুষ্টির জন্য নবী ﷺ-এর তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। তাই তিনি গনীমত বণ্টনের মাধ্যমে নবী ﷺ-এর ভাগে পড়লেন এবং তিনি তাঁকে তৎক্ষণাৎ আযাদ করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। কিন্তু এরপর যখনই তাঁর পিতার কথা মনে পড়তো যে, সে মুসলমানদের হাতে খায়বারের যুদ্ধে নিহত হয়েছে, তখন পিতৃত্বের ভালবাসার কারণে নবী ﷺ-এর কাছে সে সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করতেন। নবী ﷺ তাঁর মনে ব্যথা দিতেন না এবং কোনো রকম ধমক বা তিরস্কার না করে তাঁর সামনে যুক্তিসঙ্গত ওজর পেশ করতেন। তিনি বলতেন দেখ (দোষটা তো তোমার পিতারই), তোমার পিতাই তো স্বয়ং যুদ্ধ শুরু করেছিলো। যুদ্ধ না করলে সে মারাও যেতো না। সে-ই তো সারা আরবকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত করেছিলো ও উস্কিয়ে দিয়েছিলো। নবী ﷺ এ ভাবে স্নেহ ও নম্রতা সহকারে তাঁকে বোঝাতেন। ফলে এক সময় তাঁর অন্তর থেকে এই ব্যথা সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়। তিনি আর কোনো দিন এ বিষয়ে নবী ﷺ -এর নিকট কোনো অভিযোগ করেননি।

١٥٥. عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ اَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثُمَّ اِعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّىْ كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللّٰهَ اِلاَّ عَلٰى طُهْرٍ ـ

১৫৫. হযরত মুহাজির ইব্ন কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি নবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হন এবং সালাম করেন। নবী ﷺ ঐ সময় পেশাব করছিলেন। তাই তিনি সালামের জবাব দিলেন না। তারপর (পেশাব শেষ করে) তিনি ওযূ করে তার কাছে ওজর পেশ করলেন। বললেন, পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহ্‌র নাম নেয়া আমার কাছে ভাল মনে হয়নি।

ফায়দা ঃ হাদীসের মর্ম স্পষ্ট। অপর এক হাদীসে হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, একবার নবী ﷺ পেশাব করছিলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি সেখান দিয়ে গমন করছিলো এবং সে ঐ অবস্থায়ই তাঁকে সালাম করলো। তিনি ঐ অবস্থায় সালামের জবাব দিলেন না এবং পেশাব শেষ করে বললেন, তোমরা যখন আমাকে এরূপ অবস্থায় দেখবে, তখন সালাম করবে না। যদি সালাম করো, তবে আমি তার জবাব দেবো না। (সুনানে ইব্ন মাজা, পৃষ্ঠা ৩০)

ফকীহ্গণ যেসব অবস্থায় সালাম দেয়া মাকরূহ লিখেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে পেশাবরত অবস্থায় কাউকে সালাম করা এবং ঐ অবস্থায় সালামের জবাব দেওয়াও মাকরূহ।

مَا رُوِيَ فِيْ رِفْقِهِ بِأُمَّتِهِ ﷺ

উম্মতের প্রতি নবী ﷺ-এর সহানুভূতি সম্পর্কিত রিওয়ায়াতসমূহ

١٥٦. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَقْرَأُ بِالسُّوْرَةِ الْقَصِيْرَةِ وَالسُّوْرَةِ الْخَفِيْفَةِ -

১৫৬. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সালাতরত অবস্থায় যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতেন তখন (শিশুটির মায়ের মনে কোন অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে এ আশংকায় তিনি সালাত সংক্ষিপ্ত করে) ছোট একটি আয়াত কিংবা ছোট একটি সূরা তিলাওয়াতের মাধ্যমে সালাত শেষ করে নিতেন।

١٥٧. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيْ قَالَا صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلَاةَ الْغَدَاةِ وَسَمِعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَخَفَّفَ الصَّلَاةَ، فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَفَّفْتَ هٰذِهِ الصَّلَاةَ الْيَوْمَ؟ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ فَخَشِيْتُ اَنْ يَفْتِنَ اُمَّهُ -

১৫৭. হযরত আবূ হুরায়রা ও হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, একবার নবী ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত পড়ছিলেন। সালাত পড়ানো কালে তাঁর কানে একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ পৌছল। নবী ﷺ তখন সালাত সংক্ষিপ্ত করে দেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আজ আপনি সালাতকে এতটুকু সংক্ষিপ্ত করলেন ? উত্তরে তিনি ইরশাদ করেন, আমি সালাতরত অবস্থায় যখন কোন শিশুর

কান্নার আওয়াজ শুনি তখন আমার আশংকাবোধ হয়, হয়ত শিশুটির মা সালাতরত অবস্থায় পেরেশানীতে পড়বে। (এ কারণে আমি সালাত সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছি।)

ফায়দা ঃ উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের অর্থ সুস্পষ্ট। গ্রন্থকার এখানে উম্মতের প্রতি নবী ﷺ -এর মনে কতটুকু মায়া ও ভালবাসা ছিল এবং তাদের প্রতি তিনি কতটুকু দরদ ও সহানুভূতি পোষণ করতেন তার বর্ণনা পেশ করেছেন। এ ধরনের হাদীসগুলি থেকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য কতখানি মায়া ও ভালবাসা এবং কতখানি দরদ ও সহানুভূতি রাখতেন। ফজরের সালাতে দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করা মুস্তাহাব। এটিই ছিল ফজরের সালাতে নবী ﷺ -এর নিয়ম। কিন্তু তিনি একটি শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে কেবল এ কারণে যে, এই শিশু ও শিশুটির সালাতরত মায়ের মনে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে সে জন্য নিজের নিয়ম ভঙ্গ করে সালাত সংক্ষিপ্ত করে নিতেন। যেন সালাত দীর্ঘ হওয়ার কারণে শিশু ও শিশুর মাকে অস্থির হতে না হয়।

বস্তুত মানবীয় গুণাবলির মধ্যে মায়া-মমতা একটি মহৎ গুণ এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি অভ্যাস। এর পরিধি অনেক ব্যাপক। মায়া-মমতা ও ভালবাসার সম্পর্ক কেবল নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সকল প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, অধস্তন কর্মচারী, শিষ্য ও গুরু নির্বিশেষে সকল সৃষ্ট জগতের সঙ্গে জড়িত। স্বজনদের সঙ্গে হোক আর পরজনদের সঙ্গে হোক মানুষ যখন এ মায়া-মমতাকে নিজের আদর্শ ও অভ্যাসে পরিণত করে এবং সৃষ্ট জীবের সহিত সর্বদা কোমল আচরণ করেন তখন তিনি নিজেও যেমন শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেন তেমনি অন্যদের জন্যও শান্তি ও আনন্দপূর্ণ জীবন যাপনের কারণ হিসাবে পরিগণিত হন। এ ধরনের সদাচার দ্বারা গোটা সমাজের মধ্যে পারস্পরিক মায়া-মমতা, ভ্রাতৃত্ব, মান-সম্মান রক্ষা ও কল্যাণ কামনার এমন একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে উঠে যা আল্লাহ্ পাকের নিকট খুবই পছন্দনীয়। আর যে ব্যক্তির কারণে এ পরিবেশ গড়ে উঠে তিনি আল্লাহ্ পাকের বাণী 'سَبَقَتْ رَحْمَتِىْ عَلَى غَضَبِىْ' (আমার দয়া ও অনুগ্রহ আমার ক্রোধ ও গযবের উপর প্রবল হয়ে থাকে)–এর প্রকাশস্থল হিসাবে হন। আমাদের পরম অনুগ্রহকারী সারা বিশ্বের রহ্মত নবী ﷺ তাঁর নিম্নোক্ত বাণীতে আমাদেরকে এদিকে পথনির্দেশ করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট থেকে নম্রতা ও কোমল আচরণ নীতির পরিপূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়েছে সে ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানের সকল কল্যাণের পূর্ণতা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মায়া-মমতা ও কোমল আচরণ গুণ থেকে বঞ্চিত সে ইহকাল ও পরকাল উভয় জাহানের যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।" (ইমাম বাগাভী (র) সংকলিত শারহুস্ সুন্নাহ্)।

١٥٨. عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِيْمًا رَفِيْقًا اَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً فَظَنَّ اَنَّا قَدْ اشْتَقْنَا فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَاهُ مِنْ اَهْلِنَا فَاَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْجِعُوْا اِلٰى اَهَالِيْكُمْ فَاَقِيْمُوْا فِيْهِمْ ـ

১৫৮. হযরত মালিক ইব্ন হুয়ায়রিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ছিলেন **অতিশয় কোমল-প্রাণ,** অতীব দয়ালু ও সহানুভূতিশীল। আমরা স্বগোত্রীয় একটি প্রতিনিধি দলের সাথে বিশ দিন পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্যে অবস্থান করেছিলাম। তখন তাঁর মনে হলো, হয়তো আমাদের মনে বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে থাকবে। কাজেই তিনি আমাদেরকে ডাকলেন এবং বাড়িতে আমাদের কারা কারা আছে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তাঁকে বিস্তারিত জানালাম। তখন তিনি ইরশাদ করেন ঃ এবার তোমরা নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং সেখানেই স্থায়িভাবে অবস্থান কর (এবং দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ করে যাও)।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ লোকজনের মানসিক অবস্থার প্রতি কতটুকু সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তা ছাড়া আরো বোঝা যায় যে, মানুষের জন্য তাঁর প্রাণে কতটুকু দয়া ও মমতা বিদ্যমান ছিল। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনে তাঁকে 'رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِيْنَ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। স্বয়ং তিনি তাঁর নিজের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন ঃ اَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ —আমি সৃষ্ট জাহানের হিদায়েতের জন্য প্রেরিত রহমত।' সুবহানাল্লাহ্!

١٥٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَقَدَ الرَّجُلُ مِنْ اِخْوَانِهِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ سَأَلَ عَنْهُ فَاِنْ كَانَ غَائِبًا دَعَا لَهُ وَاِنْ كَانَ شَاهِدًا زَارَهُ وَاِنْ كَانَ مَرِيْضًا عَادَهُ ـ

১৫৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যদি একাধারে তিনদিন কোন মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাৎ না পেতেন তা হলে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সে যদি সফরে আছে বলে জানতেন তাহলে তার জন্য দু'আ করতেন। আর যদি সে (মদীনায়) উপস্থিত থাকতো (অথচ কোন অপারগতার কারণে হাজির হতে পারছে না) তা হলে তিনি নিজে তার সাক্ষাতের জন্য যেতেন। আর যদি লোকটি অসুস্থ বলে জানতেন তা হলে তিনি সেখানে গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ নিজের সঙ্গী ও পরিচিতদের সাথে কতখানি স্নেহপূর্ণ ও আন্তরিক, মনজয় ও খোঁজ-খবরের আচরণ করতেন। নবূওয়াতের গুরু দায়িত্ব পালনে সর্বদা ব্যাপৃত ও মশগুল থাকা সত্ত্বেও তিনি উপস্থিত ও অনুপস্থিত প্রতিটি সঙ্গীর ব্যাপারে পূর্ণ খবরাখবর রাখতেন এবং প্রত্যেকের জন্য উদার আচরণ প্রদর্শন করতেন। নবী ﷺ-এর এই উন্নত চরিত্র মাধুরী বর্বর নির্মম আরব জাতির অন্তরে এমন প্রীতি ও মমতার

সৃষ্টি করেছিল যার উপমা জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। সাহাবীগণ তাঁর জন্য ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। ঘোরতর যুদ্ধ চলাকালে তাঁরা নবী ﷺ-কে আড়ালে রেখে শত্রুর সকল তীর নিজেদের বুক পেতে নিতেন। নবী ﷺ -এর যেকোন আহ্বানে তাৎক্ষণিক 'লাব্বায়ক' (আমি হাজির, আমি হাজির) বলে সাড়া দিতেন। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এই মহান নবী ﷺ-এর অনুপম স্বভাব-চরিত্র এবং তাঁর সুন্দরতম রীতি-নীতি ও কাজকর্মের পূর্ণ অনুসরণের শক্তি দান করুন।

١٦٠. عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى صَلَاةً فَعَجَّلَ فِيْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّمَا عَجَّلْتُ اَنِّي سَمِعْتُ صَبِيًا يَبْكِيْ فَخَشِيْتُ اَنْ يَشُقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَبَوَيْهِ

১৬০. হযরত আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ সালাত পড়ালেন এবং সালাত খুব দ্রুত শেষ করলেন। তারপর বললেন ঃ আমি সালাত ত্বরা করে শেষ করার কার হলো যে, সালাতে আমি যখন কোন শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনি তখন আমার আশঙ্কা হয় যে, শিশুটির এ কান্নার দরুন তার মাতাপিতার মনে কোন কষ্টের উদ্রেক না হয়।

١٦١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَاَلَهُ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ فَجَذَبَهُ فَشَقَّ الْبُرْدَ حَتّٰى بَقِيَتِ الْحَاشِيَةُ فِيْ عُنُقِ النَّبِيِّ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِشَيْءٍ-

১৬১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন নবী ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে কিছু প্রার্থনা করল। নবী ﷺ একটি চাদর পরিহিত ছিলেন। লোকটি প্রার্থনার আতিশয্যে তাঁর চাদর ধরে এত জোরে টান দিলো যে, চাদরটি ফেঁড়ে গিয়ে একপার্শ্ব নবী ﷺ-এর কাঁধের উপর ঝুলতে থাকে। নবী ﷺ লোকটির এই (অসৌজন্যমূলক) আচরণ সত্ত্বেও তাকে কিছু দান করতে নির্দেশ দেন।

ফায়দা ঃ আলোচ্য হাদীসের অর্থ সুস্পষ্ট। এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজের উম্মতের প্রতি কতটুকু দয়ালু এবং কতটুকু ক্ষমাশীল ছিলেন। একজন রুক্ষ প্রকৃতির বেদুঈন যে প্রার্থনা করতেও শিখেনি তারপর আবার দু'জাহানের সরদার মহানবী ﷺ-এর সাথে এহেন অসৌজন্যমূলক আচরণ যা কেবল তাঁরই মান মর্যাদা হানিকর নয় বরং যেকোন ভদ্রলোকের পক্ষেও অসহনীয়। কিন্তু নবী ﷺ এই রুক্ষ লোকটির সাথে ক্ষমাশীলতা এবং দয়াপূর্ণ আচরণ করেন; যেভাবে তিনি অন্য লোকদের সাথে আচরণ করে থাকেন। বস্তুত উন্নত চরিত্রের এই সুউচ্চ আসন তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। একমাত্র তাঁরই পবিত্র সত্তা এই পদমর্যাদার পরিপূর্ণ ধারক। এ কারণেই কুরআনে হাকীমের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (হে নবী) নিশ্চয়ই আপনি উন্নত চরিত্রের অধিকারী। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে উন্নত চরিত্র অবলম্বনের তাওফীক দান করুন। আমীন!

١٦٢. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَامُعَاذُ اِذَا كَانَ فِى الشِّتَاءِ فَغَلِّسْ بِالْفَجْرِ وَاطِلِ الْقِرَاءَةَ قَدْرَ مَا يُطِيْقُ النَّاسُ وَلاَ تُمِلْهُمْ ، فَاِذَا كَانَ الصَّيْفُ فَأَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَاِنَّ اللَّيْلَ قَصِيْرٌ وَالنَّاسُ يَنَامُوْنَ فَأَمْهِلْهُمْ حَتّٰى يَدَارَكُوْا ـ

১৬২. হযরত মুআয ইব্ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামেনে (গভর্নর নিযুক্ত করে) পাঠালেন এবং বলেন, হে মুআয! শীতের মৌসুমে তুমি ফজরের সালাত শুরু ওয়াক্তে পড়াবে। আর সালাতে কিরাআত এতটুকু দীর্ঘ করবে যতটুকু লোকজনের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়। অতিশয় দীর্ঘ কিরাআতের কারণে মানুষের মনে যেন বিরক্তি না আসে। আর গরমের মৌসুমে তুমি ফজরের সালাত শেষ ওয়াক্তে পড়াবে। কেননা (গরম কালে) রাত ছোট হয়ে থাকে মানুষের ঘুম শেষ হয় না। কাজেই তাদেরকে এতটুকু সুযোগ দেবে যাতে তারাও সালাতে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়।

ফায়দা ঃ আলোচ্য হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যেভাবে জাগতিক সকল কাজে উম্মতের প্রতি দয়া ও কোমলতার আচরণ করতেন অনুরূপ ইবাদত বন্দেগী ইত্যাদি আদায়ের ক্ষেত্রেও তিনি তাদের জন্য সহজসাধ্য পদ্ধতি অবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন। সহ্য করা যায় না এমন কোন কঠোরতার দরুন ইবাদত করতে তাদের মনে যেন বিরক্তি না আসে সে জন্য তিনি সচেতন থাকতেন। এমন কি তিনি সালাতের মত উচ্চমানের ইবাদত, যার ব্যাপারে নিজেই ইরশাদ করেছেন যে, "আমার নয়নের প্রশান্তি হলো সালাত," ব্যাপারেও তিনি সহজলভ্যতা ও সহজসাধ্যতার নীতি পালনের নির্দেশ দিতেন। শীত ও গরমের মৌসুম এবং রাত দিন ছোট বড় হওয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখার পেছনে এটিই হলো মূল রহস্য—যেন কঠোরতা দেখে শংকিত হয়ে কেউ দীনাদারী ও ইবাদত বন্দেগী ছেড়ে না বসে। আল্লাহ্ তা'আলা এই দীনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে ইরশাদ করেন ঃ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ এই দীনের মাঝে সংকীর্ণতার কোন কিছু নেই, এটি তোমাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষ ইব্রাহীমের দীন" (সূরা হাজ্জ ঃ ৭৮)

١٦٣. عَنْ جَابِرٍ قَالَ غَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدٰى وَعِشْرِيْنَ غَزْوَةً بِنَفْسِهِ، شَهِدْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ غِبْتُ عَنِ اثْنَتَيْنِ، فَبَيْنَا اَنَا مَعَهُ فِىْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ اِذَا اَعْيٰى فَاَضْحٰى تَحْتَ اللَّيْلِ فَبَرَكَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى اٰخِرِنَا فِىْ اُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَيَزْجِى الضَّعِيْفَ وَيُرْدِفُ وَيَدْعُوْلَهُمْ فَانْتَهٰى اِلَىَّ وَاَنَا اَقُوْلُ يَالَهْفَ اُمَّتَاهُ! وَمَا زَالَ لَنَا نَاضِحِ سُوْء، فَقَالَ مَنْ هٰذَا ؟ قُلْتُ اَنَا جَابِرٌ بِأَبِىْ وَاُمِّى يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا شَأْنُكَ ؟ قُلْتُ اَعْيٰى نَاضِحِىْ فَقَالَ اَمَعَكَ عَصًا

قُلْتُ نَعَمْ فَضَرَبَهُ ثُمَّ بَعَثَهُ ثُمَّ اَنَاخَهُ وَوَطِئَ عَلَى ذِرَاعِهِ وَقَالَ ارْكَبْ فَرَكِبْتُ فَسَايَرْتُهُ فَجَعَلَ جَمَلِيْ يَسْبِقُهُ فَاسْتَغْفَرَلِيْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ مَرَّةً ـ فَقَالَ لِيْ مَا تَرَكَ عَبْدُ اللّٰهِ مِنَ الْوَلَدِ ؟ يَعْنِيْ اَبَاهُ قُلْتُ سَبْعَ نِسْوَةٍ قَالَ اَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِذَا قَدِمْتَ الْمَدِيْنَةَ فَقَاطِعْهُمْ فَاِنْ اَبَوْا فَاِذَا حَضَرَ جِدَادَ نَخْلِكُمْ فَاذِنِيْ وَقَالَ لِيْ هَلْ تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِمَنْ ؟ قُلْتُ بِفَلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ بِاَيِّمٍ كَانَتْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ فَهَلاَّ فَتَاةً تُلاَعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ؟ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كُنَّ عِنْدِيْ نِسْوَةٌ خُرَقٌ يَعْنِيْ اَخْوَاتُهُ فَكَرِهْتُ اَنْ اٰتِيَهُنَّ بِامْرَأَةٍ خَرْقَاءَ ، فَقُلْتُ هٰذِهِ اَجْمَعُ لِاَمْرِيْ قَالَ فَقَدْ اَصَبْتَ وَرَشَدْتَ فَقَالَ بِكَمْ اَشْتَرَيْتَ جَمَلَكَ قُلْتُ بِخَمْسِ اَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ قَدْ اَخَذْنَاهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ فَقَالَ يَابِلَالُ ! اَعْطِهِ خَمْسَ اَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ يَسْتَعِيْنُ بِهَا فِيْ دَيْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَزِدْهُ ثَلَاثًا وَارْدُدْ عَلَيْهِ جَمَلَهُ ، قَالَ هَلْ قَاطَعْتَ غُرَمَاءَ عَبْدِ اللّٰهِ ؟ قُلْتُ لاَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَتَرَكَ وَفَاءً ؟ قُلْتُ لاَ قَالَ لاَعَلَيْكَ اِذَا حَضَرَ جِدَادَ نَخْلِكُمْ فَاذِنِيْ فَاذَنْتُهُ فَجَاءَ فَدَعَا لَنَا فَاسْتَوْفَى كُلُّ غَرِيْمٍ مَا كَانَ يَطْلُبُ تَمْرًا وَفَاءً وَبَقِيَ لَنَامَاكُنَّا نَجِدُ وَاَكْثَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ارْفَعُوْا وَلاَ تَكِيْلُوْا فَرَفَعْنَا فَاَكَلْنَا مِنْهُ زَمَانًا ـ

১৬৩. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একুশটি যুদ্ধে স্বয়ং অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে উনিশটিতেই আমি শামিল থাকি। অবশিষ্ট দু'টির মধ্যে উপস্থিত ছিলাম না। একবার আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে যুদ্ধে যাত্রা করেছিলাম। এমন সময় রাত্রিকালে আমার উটটি হাঁটতে অক্ষম হয়ে পড়ল। নবী ﷺ পেছনের লোকজনের সাথে আমাদের পেছনে আসছিলেন। পেছনের লোকজনের সাথে তাঁর আসার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি পেছন থেকে দুর্বলদেরকে চলতে সাহায্য করতেন, প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদেরকে নিজের বাহনে আরোহণ করিয়ে নিতেন এবং দুর্বলদের জন্য দু'আ করতে থাকতেন। (পথ চলতে চলতে আমিও পেছনে পড়ে গিয়েছিলাম) তিনি যখন আমার কাছে আসলেন আমি তখন নিজের দুর্বলতা ও অক্ষমতার দরুন নিজে নিজেকে তিরস্কার করছিলাম। হায়! আমার মায়ের বিনাশ! কেননা আমার উট অক্ষম হয়ে গিয়েছে। এ সময় নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার মাতাপিতা কুরবান হোক, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্। তিনি বললেন, তোমার কি হয়েছে ? আমি বললাম আমার উটটি (ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে বসে গেছে আর দাঁড়াচ্ছে না)। তিনি বললেন,

তোমার হাতে (হাঁকিয়ে নেওয়ার কোন) লাঠি আছে কি ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ, আছে। তখন তিনি লাঠির সাহায্যে উটটিকে প্রহার করলেন, এটি দাঁড়াল। তারপর পুনরায় উটটিকে বসিয়ে সম্মুখের পা দু'টি সজোরে চিপে দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, যাও, আরোহণ কর। আমি উটটির পিঠে আরোহণ করলাম এবং চালাতে থাকলাম। দেখলাম, নবী ﷺ -এর মুবারক হাতের স্পর্শের কারণে আমার উটটি তাঁর উট থেকেও আগে আগে চলতে শুরু করেছে। নবী ﷺ সে রাতে আমার পঁচিশবার মাগফিরাতের দু'আ করেন। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা আবদুল্লাহ মৃত্যুকালে কতজন সন্তান রেখে গিয়েছেন ? আমি বললাম, সাত কন্যা। তিনি বললেন, তার উপর কি কিছু ঋণও ছিল ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, এবার মদীনায় ফিরে গিয়ে ঋণদাতাদের সাথে একটা ফয়সালা করে নিও। তারা যদি তোমার ফয়সালা মানতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে খেজুর আহরণের মৌসুমে তুমি আমাকে সংবাদ দিবে। তারপর তিনি আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, কাকে বিবাহ করেছ ? আমি বললাম, অমুকের বিধবা কন্যা। তারা মদীনাতেই বসবাস করে। তিনি বললেন, কোনো কুমারীকে বিয়ে করলে না কেন ? তাহলে সে তোমার জন্য এবং তুমি তার জন্য অধিকতর মনস্তুষ্টি ও ভালবাসার কারণ হতে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের ঘরে অনভিজ্ঞ কুমারীরা আছে। (অর্থাৎ আমার ছোট বোনেরা সকলে কুমারী) কাজেই আমি তাদের সমবয়সের আরেকজন কুমারীকে ঘরে আনা পছন্দ করিনি। আমি সিদ্ধান্ত করেছিলাম কোন একজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মহিলাকে ঘরে আনা হলে আমার পারিবারিক কাজকর্মে অধিকতর কল্যাণজনক প্রমাণিত হবে। নবী ﷺ বললেন, তাহলে তুমি ঠিক কাজ করেছ এবং উত্তম পথ অবলম্বন করেছ। তারপর নবী ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এ উট তুমি কত মূল্যে খরিদ করেছিলে ? আমি বললাম, পাঁচ উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে। তিনি বললেন, উটটি আমি তোমার কাছ থেকে খরিদ করে নিলাম। এরপর মদীনা শরীফ পৌছে আমি উটটি নবী ﷺ-এর খেদমতে পেশ করে দেই। তিনি হযরত বিলালকে ডেকে বললেন, বিলাল তুমি জাবিরকে পাঁচ উকিয়া স্বর্ণ পরিশোধ কর। সে (তার পিতা হযরত) আবদুল্লাহ্র ঋণ শোধে এ অর্থ ব্যয় করবে। তাকে আমার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত আরো তিন উকিয়া স্বর্ণ দিয়ে দিবে এবং তাকে তার উটটিও ফিরিয়ে দিবে।

তারপর নবী ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তোমার পিতা আবদুল্লাহ্র ঋণদাতাদের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করেছ কি ? আমি বললাম, জী না। নবী ﷺ বললেন, আবদুল্লাহ্ কি এতটুকু সম্পদ রেখে গেছে যা দিয়ে ঋণ শোধ করা সম্ভব ? আমি বললাম, জী না। তিনি বললেন, ঠিক আছে কোন অসুবিধা হবে না। তোমাদের বাগানে খেজুর আহরণের সময় ঘনিয়ে এলে আমাকে সংবাদ দিও। সে মতে আমি (সময়মত) নবী ﷺ -কে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি আগমন করলেন এবং আমাদের জন্য দু'আ করলেন। (তাঁর সে দু'আর বরকতে) খেজুর

থেকে ঋণদাতা সকলের পাওনা পরিপূর্ণভাবে শোধ করে দেওয়া হলো। তারপর আমাদের হাতে সেই পরিমাণ খেজুর অবশিষ্ট রয়ে গেল যতটুকু আমরা অন্যান্য বছর আহরণ করতাম। এমনকি অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য বছরের তুলনায় পরিমাণে কিছু বেশিও ছিল। তারপর নবী ﷺ আমাকে বললেন, এ খেজুরগুলি ঘরে নিয়ে যাও। তবে দেখ এগুলিকে পরিমাপ করবে না। সে মতে আমার উক্ত খেজুর বহুদিন পর্যন্ত খেতে থাকি।

ফায়দা ঃ আলোচ্য হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ -এর দু'টি মুজিয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। একটি হলো, তাঁর দু'আর বরকতে ক্লান্ত হয়ে পড়া অক্ষম একটি উট পুনরায় শক্তি লাভ করে এবং দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করে। আর অপরটি হলো, তাঁর বরকতে সামান্য পরিমাণের খেজুর এত অধিক পরিমাণের হলো যে, তা থেকে সকল ঋণ পরিশোধ করেও অতিরিক্ত রয়ে গেল। এমন কি অন্যান্য মৌসুমে যে পরিমাণ খেজুর জাবির (রা) বাগান থেকে পেতেন তার চেয়েও বেশি রয়ে গেল।

উল্লেখিত হাদীসটি বর্ণনা করা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো উম্মতের প্রতি প্রিয় নবী ﷺ -এর মমত্ববোধ ও আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত পেশ করা। বিশেষত তিনি সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র মানুষের সাথে কতটুকু সহানুভূতি প্রদর্শন এবং তাদেরকে কত সাহায্য করতেন এ কথার প্রমাণ পেশ করা। এ হাদীসে সুস্পষ্ট বিবরণ বিদ্যমান যে, প্রিয় নবী ﷺ হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-কে কেবল মৌখিকভাবেই সহানুভূতি প্রদর্শন করে ক্ষান্ত হননি বরং তাঁর পিতার রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য আর্থিকভাবেও সাহায্য করেন। তিনি তাঁর বাগানে উৎপাদিত খেজুরে বরকতের জন্য দু'আ করেন। ফলে আল্লাহ্ পাক তাঁর ঋণসমূহ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন। অধিকন্তু তাঁর পরিবারের আহারের জন্য তাঁর কাছে যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বৃত্তও থেকে যায়।

বর্ণিত হাদীসের ঘটনাটির মধ্যে সমবেদনা ও আর্থিক সাহায্যের এ বিষয়টি মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষামূলক। এখানে দু'জাহানের রহমত প্রিয় নবী ﷺ হযরত জাবির (রা)-এর মন থেকে অনুগ্রহ প্রাপ্তির বোঝা লাঘব করার উদ্দেশ্যে নামমাত্র মূল্যে তাঁর উটটি খরিদ করেন—যেন হযরত জাবির (রা)-কে এ উটের মূল্য গ্রহণে কোন সংকোচ বোধ না করেন। তাছাড়া মদীনায় পৌঁছে উটের মূল্য প্রদানের সময় অতিরিক্ত আরো তিন উকিয়াসহ বিক্রীত উটটিও তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুত হযরত জাবিরের উট খরিদ করা প্রিয় নবী ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল না। এ কারণে জাবির (রা) যখন উটের দ্বারা মদীনা পৌঁছা পর্যন্ত আরোহণ করার শর্ত আরোপ করেন তখন মহানবী ﷺ সেই শর্ত মেনে নেন। অথচ বাহ্যিকভাবে এ ধরনের শর্তারোপ নিষিদ্ধ। কেননা অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ (নবী ﷺ শর্তের সাথে কোন বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন) কাজেই যেহেতু প্রিয় নবী ﷺ-এর মূল উদ্দেশ্য উট খরিদ করা নয়, বরং উদ্দেশ্য ছিল

উটের দাম বলে হযরত জাবিরকে আর্থিক সাহায্য করা। আর একারণেই তিনি উপরোক্ত শর্ত মেনে নিতে কোন দ্বিধা প্রকাশ করেন নি। তারপর মদীনা পৌছে তিনি কেবল উটের মূল্যই নয় বরং উটসহ অতিরিক্ত আরো তিন উকিয়া স্বর্ণ তাকে প্রদান করেন। এভাবে এ উম্মতের জন্যও কর্তব্য যে, তারা যখন নিজেদের কোন অভাবী ঋণগ্রস্ত ভাইয়ের আর্থিক সাহায্য করার ইচ্ছা করবেন তখন এমন পন্থা অবলম্বন করবেন যার ফলে অভাবী ব্যক্তি সাহায্য গ্রহণ করতে সংকোচবোধ না করেন এবং যথাসম্ভব অভাবী লোকটি অনুগ্রহ ভাজন হওয়ার বোঝা থেকে যেন হাল্কা রাখেন।

١٦٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللّٰهِ الَّذِىْ لَااِلٰهَ اِلاَّ هُوَ اِنْ كُنْتُ لَاَ شُدُّ الْحَجَرَ عَلٰى بَطْنِى مِنَ الْجُوْعِ وَاِنْ كُنْتُ لَاَعْتَمِدُ بِيَدِىْ عَلَى الاَرْضِ مِنَ الْجُوْعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلٰى طَرِيْقِهِمُ الَّذِىْ يَخْرُجُوْنَ فِيْهِ فَمَرَّ بِىْ اَبُوْ بَكْرٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مَاسَاَلْتُهُ عَنْهَا اِلاَّ لِيَسْتَتْبِعَنِى فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ عُمَرُ فَسَاَلْتُهُ عَنْ اٰيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ مَا سَاَلْتُهُ اِلاَّ لِيَسْتَتْبِعَنِىْ فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ اَبُوْ الْقَاسِمِ ﷺ فَعَرَفَ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَمَا فِىْ وَجْهِىْ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ اَبَا هِرٍّ الْحَقْ فَاتَّبَعْتُهُ فَدَخَلَ فَاسْتَاْذَنْتُ فَاَذِنَ لِىْ فَوَجَدَ لَبَنًا فِىْ قَدَحٍ فَقَالَ لِاَهْلِهِ اَنّٰى لَكُمْ هٰذَا اللَّبَنُ ؟ قَالُوْا اَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ، فَقَالَ يَااَبَاهِرٍّ اِنْطَلِقْ اِلٰى اَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِىْ قَالَ فَاَحْزَنَنِىْ ذٰلِكَ وَاَهْلُ الصُّفَّةِ اَضْيَافُ الاِسْلَامِ لَا يَاْوُوْنَ اِلٰى اَهْلٍ وَلَا مَالٍ اِذَا جَاءَتْهُ اَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِمْ وَلَمْ يَرْزَاْ مِنْهَا شَيْئًا وَ اِذَا جَاءَتْهُ هَدِيَّةٌ اَرْسَلَ اِلَيْهِمْ فَاَشْرَكَهُمْ فِيْهَا فَاَصَابَ مِنْهَا قَالَ فَاَحْزَنَنِىْ اِرْسَالُهُ اِيَّاىَ وَقُلْتُ اَرْجُوْ اَنْ اَشْرَبَ مِنْ هٰذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً اَتَغَذّٰى بِهَا فَمَا يُغْنِىْ عَنِّىْ هٰذَا اللَّبَنُ فِىْ اَهْلِ الصُّفَّةِ وَاَنَا الرَّسُوْلُ ، فَاِذَا جَاؤُا اَمَرَنِىْ فَكُنْتُ اَنَا اُعَاطِيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَاعَةِ رَسُوْلِهِ بُدٌّ ، فَانْطَلَقْتُ اِلَيْهِمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَاَقْبَلُوْا فَاسْتَاْذَنُوْا فَاَذِنَ لَهُمْ فَاَخَذُوْا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، وَقَالَ اَبَاهِرٍّ! قُلْتُ لَبَّيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ قُمْ فَاَعْطِهِمْ فَاَخَذَ الْقَدَحَ فَاَعْطِى الرَّجُلَ حَتّٰى يَرْوِىْ ، ثُمَّ يَرُدُّهُ اَلَىَّ حَتّٰى رَوِىَ جَمِيْعُ الْقَوْمِ فَانْتَهَيْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخَذَالْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ

رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ اِلَىَّ فَتَبَسَّمَ وَقَالَ اُقْعُدْ فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ وَقَالَ اِشْرَبْ [illegible]زال يَقُوْلُ اِشْرَبْ حَتَّى قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَااَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ فَاَرِنِى فَرَدَدْتُ اِلَيْهِ الاِنَاءَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ شَرِبَ مِنْهُ ـ

১৬৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সেই পবিত্র সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই যে, আমি (অনেক সময়) ক্ষুধার তাড়নায় নিজের পেটের উপর পাথর বেঁধে রাখতাম। আর (কোন কোন সময়) এই ক্ষুধাজনিত কষ্টের কারণে নিজের দু'হাত দ্বারা মাটির উপর ভর দিয়ে বসে থাকতাম। আল্লাহ্‌র শপথ, একদিন এমন হয়ে গিয়েছিলো যে, (মসজিদে নববী থেকে) বেরিয়ে যাওয়ার পথের উপর বসে পড়ি। (যেন আমার ক্ষুধার্ত অবস্থা কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে) এ সময় হযরত আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তাঁকে শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি আমাকে সঙ্গে করে (ঘরে) নিয়ে যাবেন এবং কিছু খেতে দিবেন—পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করলাম। কিন্তু তিনি আমার প্রকৃত ইচ্ছা কিছুই উপলব্ধি করলেন না। (প্রশ্নটির জবাব দিয়ে) চলে গেলেন। আমাকে আর সঙ্গে করে নিলেন না। অতঃপর (এ পথ দিয়ে) হযরত উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর আগমন ঘটল। আমি তাঁকেও এ উদ্দেশ্য নিয়ে কুরআনে পাকের একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। (এ আশায় যে) তিনি হয়ত আমাকে সঙ্গে করে ঘরে নিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি আমার প্রকৃত মনোভাবটি উপলব্ধি করলেন না। প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলে গেলেন। আমাকে আর সঙ্গে করে নিলেন না। এরপর রহমতে আলম আবুল কাসিম ﷺ এ পথে আগমন করলেন। তিনি আমার চেহারা দেখেই আমার অন্তরের ভাষা উপলব্ধি করে নেন। তিনি স্মিত হেসে বললেন, আবূ হির, আস, আমার সঙ্গে চল। আমি নবী ﷺ-এর পিছু পিছু চললাম। তিনি উম্মুল মু'মিনীনদের একজনের ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে ভিতরে ডেকে নেন। এ সময় তিনি ঘরে এক পেয়ালা দুধ রক্ষিত আছে দেখলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এ দুধ তোমার কাছে কোথা থেকে এসেছে ? ঘরওয়ালারা বললেন, অমুক ব্যক্তি আপনার জন্য হাদিয়া পাঠিয়েছে। নবী ﷺ তখন আমাকে বললেন, হে আবূ হির! যাও সুফ্‌ফার সকলকে ডেকে আনো। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, এ কথা শুনে আমি বড় চিন্তায় পড়ে গেলাম। কেননা আহলে সুফ্‌ফার সকলেই ইসলাম ও মুসলমানদের মেহমান। তাদের কারোর না আছে কোন ঘরবাড়ি আর না কোন পরিবার-পরিজন। সাদাকার যে সকল জিনিস প্রিয় নবীর কাছে আসতো তিনি তা তাদের জন্য পাঠিয়ে দিতেন। তিনি নিজের জন্য এ থেকে কিছুই রাখতেন না। আর তাঁর কাছে যদি হাদিয়ার কোন কিছু আসতো তাহলে সকলকে ডেকে এনে নিজের সঙ্গে আহার করাতেন। তখন প্রিয় নবী ﷺ নিজেও আহার করতেন, সঙ্গে অন্যরাও আহার

করতো। (মোট কথা আহলে সুফ্ফার লোকেরা প্রায়ই অভুক্ত অবস্থায় দু'জাহানের রহমত নবী ﷺ -এর অপেক্ষায় বসে থাকতেন।) আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, কাজেই নবী ﷺ-এর আমাকে তাদের ডেকে আনতে পাঠানোর বিষয়টি আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিলো। আমি মনে মনে ভাবলাম, আশা তো করেছিলাম আমি এ দুধটুকু পান করে কিছুটা স্বস্তি লাভ করবো। কিন্তু আহলে সুফ্ফার সকলের সাথে এই এক পেয়ালা দুধের কতটুকু আমার ভাগ্যে আসবে। আবার যেহেতু আমিই তাঁদেরকে ডেকে আনছি, কাজেই তারা যখন আসবে নবী ﷺ তখন আমাকেই সকলের মাঝে দুধ বণ্টন করে দিতে নির্দেশ দিবেন। (আমি নিজে রয়ে যাবো সকলের শেষে। কাজেই আমার জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে কিনা বলা যায় না।) কিন্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তরও নেই। এসব ভেবে আমি সুফ্ফাবাসীদের কাছে গেলাম। তাদেরকে ডাকলে তারা সকলে আসলেন। তারপর নবী ﷺ -এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি অনুমতি দেন। সকলে নিজ নিজ আসনে বসার পর নবী ﷺ আমাকে বললেন, হে আবূ হির! আমি বললাম, লাব্বাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, দাঁড়াও সকলকে একের পর এক দুধের এই পেয়ালা থেকে পান করতে দাও। সে মতে আমি পেয়ালাটি একজন থেকে নিয়ে অন্যজনকে পৌঁছিয়ে দিতে থাকি। তারা প্রত্যেকে তৃপ্তি ভরে পান করার পর পেয়ালা আমাকে ফেরত দিতেন। এভাবে পালাক্রমে আহলে সুফ্ফার সকলেই পেট পূর্ণ করে পান করার পর আমি পেয়ালাটি নিয়ে প্রিয় নবীর কাছে উপস্থিত হই। তিনি পেয়ালাটি নিজের সামনে রাখলেন। তারপর মাথা উপরে তুলে আমার দিকে তাকালেন এবং স্মিত হেসে বললেন, বসে পড়ো। আমি বসে গেলাম। তিনি বললেন, এবার তুমি পান করো। সে মতে আমি পেটভরে দুধ পান করলাম। তিনি পুনরায় আমাকে বললেন, পান করো। ফলে আমি আবার পান করি। (এভাবে তিনি বারবার আমাকে বলতে থাকেন আর আমি পান করতে থাকি।) অবশেষে আমি বললাম, কসম সেই সত্তার! যিনি আপনাকে সত্যসহ নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, এক ঢোক পরিমাণ দুধ পান করার মতও কোন জায়গা খালি নেই। তিনি বললেন, ঠিক আছে পেয়ালাটি আমাকে দাও। আমি পেয়ালাটি প্রিয় নবীর হাতে তুলে দিলে তিনি মহান আল্লাহ্র প্রশংসা জ্ঞাপন করলেন এবং নিজেও সেই পেয়ালা থেকে পান করলেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ-এর এমন অত্যাশ্চর্য একটি মুজিযার বর্ণনা করা হয়েছে যা মানবীয় বুদ্ধি ও উপলব্ধির সম্পূর্ণ উর্ধ্বে। এক পেয়ালা দুধ নবী ﷺ-এর বরকতে এবং তাঁর হাতে প্রকাশিত মুজিযা হিসাবে এত অধিক পরিমাণ হয়েছে যে, ষাট কিংবা সত্তর জন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত মানুষের একটি দ[illegible] তা থেকে তৃপ্তিভরে পান করার পরও তা শেষ না হওয়া মানুষের বুদ্ধির অগম্য। বস্তুত [illegible] এবং এ ধরনের আরো হাজার হাজার মুজিযা প্রিয় নবী ﷺ-এর বরহক নবী হওয়ার [illegible] করে। [illegible]রত আবূ

হুরায়রা (রা), যাকে আহলে সুফ্‌ফার এক পর্যায়ের নাযিম বলা চলে তিনিও মাত্র এক পেয়ালা দুধে এত সংখ্যক মানুষের জন্য যথেষ্ট হওয়ার বিষয়টি কল্পনা করতে পারেন নি। নিজে নিজের অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার অবস্থা অতিশয় সরলতার সাথে ব্যক্ত করে দেন। আল্লাহ্ পাক এ সামান্য দুধে এত অত্যাশ্চর্যজনক বৃদ্ধি ও বরকত প্রদান করেন যে, তা সকলের জন্যই যথেষ্ট হয়ে গেল। বরং কিছু অবশিষ্টও রইল। মনে হয় যেন পেয়ালাটির পরতে পরতে কোন ঝর্ণা বিদ্যমান ছিল যে, মানুষ যতটুকু পান করেছিলো সঙ্গে সঙ্গে ততটুকু আবার পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এ হাদীস থেকে আরো বোঝা যায় যে, উম্মতের জন্য প্রিয় নবী ﷺ-এর মনে কতখানি আন্তরিকতা ও দরদ বিদ্যমান ছিলো। তাঁর দরদপূর্ণ দৃষ্টি উম্মতের অন্তরস্থ সূক্ষ্ম অবস্থা ও চিন্তাভাবনাকে তাদের চেহারা গবাক্ষপথ দিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করত। হযরত আবূ বকর (রা)-এর দৃষ্টি আবূ হুরায়রা (রা)-এর চেহারা ও তার প্রশ্ন করা থেকে যে ভাবকে অনুধাবন করতে পারেননি, হযরত উমরের সচেতন চাহনি যা অনুভব করেনি দয়ার মহাসমুদ্র প্রিয় নবী ﷺ-এর দরদমাখা দৃষ্টি তা সহজেই উপলব্ধি করে নেয়।

এ হাদীস থেকে সবচেয়ে বড় যে কথাটি বোঝা যায় তা হলো অনাহারক্লিষ্ট সাহাবীদের আত্মমর্যাদাবোধ। তাঁরা অনাহার ও দারিদ্রে অকল্পনীয় যাতনা নীরবে সহ্য করতেন। কিন্তু কারোর সামনে তা প্রকাশ করতেন না। কারোর কাছে ভিক্ষা চাওয়া বা হাত পাতা তো কল্পনাই করা যায় না। এরাই হলেন সেসব দারিদ্র ব্যক্তিত্ব যাদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ পাকের ইরশাদ হলো ঃ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لاَيَسْئَلُوْنَ النَّسَ اِلْحَافًا ـ প্রকৃত প্রাপ্য হলো সেসব অভাবগ্রস্ত লোকজনের, যারা আল্লাহ্‌র পথে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকে যে, দেশময় ঘোরাফেরা করার সুযোগ থাকে না। যাচ্ঞা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে ধারণা করে; (হে নবী) আপনি তাদেরকে লক্ষণ দেখেই চিনতে পারেন। তারা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচ্ঞা করে না। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৩)

তাদের সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন ঃ يَدْخُلُ لْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الاَغْنِيَاءِ অভাবগ্রস্তরা সম্পদশালীদের সত্তর বছর পূর্বে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। (আল-হাদীস)

١٦٥. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَدَّثَ بِالْحَدِيْثِ اَوْ سَاَلَ عَنِ الاَمْرِ كَرَّرَهُ ثَلاَثًا لَيُفْهِمَ وَيُفْهَمَ عَنْهُ ـ

অতি উত্তম যা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়া সম্ভব, যদিও না সে আমল সামান্য পরিমাণের হয়। তারপর তিনি বললেন, আমাকে এখানে সালাত পড়তে কেবল এ আশংকাটিই বারণ করেছে যে, এ ব্যাপারে আবার আমার উপর এমন কোন নির্দেশনা অবতীর্ণ হয়ে যায় যা পালনে তোমরা সক্ষম হবে না।

ফায়দা ঃ ইতিপূর্বে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উম্মতের ব্যাপারে সীমাহীন দরদী ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন। এমনকি তিনি তাদের বিভিন্ন ইবাদত পালন ও আমল করার ক্ষেত্রেও সহজসাধ্যতা ও সহজলভ্যতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। এই দরদ ও দয়ার কারণেই তিনি রাতের সেই নিয়মিত নফল পড়া বর্জন করেন। এখানে নবী ﷺ-এর আশংকাবোধ হয়েছিল যে, এভাবে নিয়মিত আদায় করা হলে এ সালাত উম্মতের উপর ফরয হয়ে যেতে পারে। আর তখন তাদের পক্ষে তা পালন করে যাওয়া কষ্টকর হয়ে পড়বে।

١٦٧. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ

১৬৭. হযরত মুআয ইব্‌ন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ইয়ামেনে (গভর্নর নিযুক্ত করে) প্রেরণ করেন। তারপর তিনি পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটি জামে তিরমিযী গ্রন্থে পরিপূর্ণ বর্ণিত হয়েছে। সেখানে হযরত মুআয (রা) বলেছেন যে, প্রিয় নবী ﷺ আমাকে ইয়ামেনের গভর্নর বানিয়ে পাঠান। আমি যখন যাত্রা করলাম তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আমাকে পুনরায় ডাকালেন। আমি ফিরে আসার পর তিনি আমাকে বললেন, তুমি নিশ্চয় জান আমি তোমাকে লোক পাঠিয়ে ডেকে এনেছি কেন। তিনি আরো বললেন, দেখ "তুমি আমার অনুমতি ব্যতিরেকে হাদিয়ার নামে মানুষের কাছ থেকে কোন জিনিস গ্রহণ করো না। কেননা এটি খেয়ানতের মাল-এর অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি খেয়ানতের মাধ্যমে সম্পদ গ্রহণ করবে তাকে কিয়ামতের দিন সেই মালসহ আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে হবে।" আমি তোমাকে এই এতটুকু কথা বলে দেয়ার জন্য পুনরায় ডেকে এনেছি। যাও, নিজের কর্তব্য পালন করো।

প্রিয় নবী ﷺ-এর ওসীয়ত করার মূল কারণও হলো তাঁর অন্তরে উম্মতের প্রতি মমত্ববোধ। তিনি চাইতেন মানুষের উপর যেন কাজকে সহজ করা হয়, তাদের সাথে কোমল আচরণ করা হয়। গভর্নর বা শাসনকর্তাদেরকে হাদিয়া-তোহফা প্রদানের জটিলতা যেন তাদেরকে পোহাতে না হয়। প্রিয় নবী ﷺ নিজেও এ নীতির উপর আমল করতেন এবং নিজের গভর্নরদেরকেও এ নীতি পালনের নির্দেশ দিতেন।

مَارُوِىَ فِىْ كَظْمِهِ الْغَيْظَ وَحِلْمِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা এবং ক্রোধ সংবরণ বিষয়ক রিওয়ায়াতসমূহ

١٦٨. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدًا فِى الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ اَصْحَابُهُ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَزْرُمُوْهُ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَىْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْبَوْلِ وَالْخَلَاءِ اِنَّمَا هِىَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةِ ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ ـ

১৬৮. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ সাহাবাদের সঙ্গে মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন জনৈক বেদুঈন সেখানে আসলো এবং মসজিদের ভিতরে পেশাব করতে শুরু করলো। সাহাবাগণ তাকে বারণ করে বলতে লাগলেন, থাম! থাম! একথা শুনে নবী ﷺ বললেন, (লোকটিকে পেশাব করতে) বাধা দিও না। তারপর তিনি লোকটিকে ডাকলেন এবং বললেন, দেখ এ মসজিদগুলো পেশাব-পায়খানা কিংবা এ জাতীয় কোন আবর্জনার জায়গা নয়। এগুলো হলো পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত, আল্লাহ্‌ পাকের যিকর ও সালাত পড়ার স্থান। তারপর তিনি এক বালতি পানি আনতে নির্দেশ দেন এবং পানিটি সেই জায়গায় প্রবাহিত করে দেন। (যেন মসজিদের মাটি পবিত্র হয়ে যায়।)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ কতখানি ধৈর্য ও সহিষ্ণু এবং ক্রোধ নিবারণকারী ছিলেন। তিনি বেদুঈনের প্রতি কোমল আচরণ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। অতিশয় মমত্ববোধ ও উদারতা নিয়ে তাকে তিনি উপদেশ দেন। তারপর নিজেই সেই অপবিত্র স্থানটি পানি দ্বারা পবিত্র করেন। এই একটি ঘটনা থেকে নবী ﷺ-এর কয়েকটি উন্নত চরিত্র মাধুরীর অনুমান করা যায়। যেমন ঃ এক অজ্ঞ অসামাজিক লোকটির ক্রোধ উদ্দীপক ত্রুটির ব্যাপারে তিনি ধৈর্য-সহ্য ও সহিষ্ণুতার আচরণ করেন। তারপর আন্তরিকতা ও মমত্ববোধ প্রকাশের মাধ্যমে অতিশয় কার্যকর পদ্ধতিতে তাকে শিক্ষা দেন এবং তার নৈতিক ত্রুটির সংশোধন করেন। উপরন্তু এক অসাধারণ বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে নিজেই মসজিদের সে স্থানটি ধুয়ে পবিত্র করেন। এভাবে মৌখিক উপদেশ ও সতর্কীকরণের সাথে সাথে কার্যতভাবেও মানুষের মনে মসজিদের পবিত্রতা ও সম্মান রক্ষার বিষয়টি বদ্ধমূল করে দেন। আল্লাহ্‌ পাক তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

١٦٩. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اَحْلَمِ النَّاسِ وَاَصْبَرِهِمْ وَاَكْظَمِهِمْ لِلْغَيْظِ -

১৬৯. হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আব্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সহিষ্ণুতাপরায়ণ, সর্বাধিক ধৈর্যশীল ও সর্বাধিক ক্রোধ সংবরণকারী।

١٧٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٍ اِذْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ مُرْتَدِيًا بِبُرْدٍ مِنَ النَّجْرَانِيَّةِ اِذْ تَبِعَهُ اَعْرَابِيٌّ ، فَاَخَذَ بِمَجَامِعِ الْبُرْدِ اِلَيْهِ ثُمَّ جَبَذَهُ اِلَيْهِ جَبْذَةً فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نَحْوِ الاَعْرَابِىْ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهِ ، وَاِذَا اَثَرُ حَاشِيَةِ الْبُرْدِ فِىْ نَحْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضَحِكَ وَقَالَ مَاشَاْنُكَ فَقَالَ لَهُ يَامُحَمَّدُ جُدْلِىْ مِنَ الْمَالِ الَّذِىْ عِنْدَكَ - قَالَ مُرُوْا لَهُ ﷺ

১৭০. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা বসা ছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দরজা দিয়ে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ নাজরানে তৈরি একটি চাদর পরিহিত ছিলেন। এ সময় জনৈক বেদুঈন তাঁর পেছনে এসে দাঁড়ায়। সে নবী ﷺ-এর চাদরের এক পার্শ্ব ধরে তাকে নিজের দিকে সজোরে টান দিয়েছিলো। ফলে নবী ﷺ বেদুঈন লোকটির দিকে ঘুরে গেলেন এবং তাঁর গ্রীবাদেশে চাদর টানার দাগ পড়ে গেল। (লোকটির এই ত্রুটি ও অমার্জিত আচরণ সত্ত্বেও) তিনি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন এবং বললেন, তোমার ব্যাপার কি ? বেদুঈন লোকটি তাঁকে উত্তর দিল, হে মুহাম্মদ! আপনার কাছে যে সম্পদ আছে তা থেকে আমাকে কিছু দিন। নবী ﷺ তাকে কিছু দান করতে নির্দেশ দিলেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সীমাহীন কোমল আচরণের কথা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মানুষের প্রতি তাঁর অসীম উদারতা ও ভালবাসা ছিল। একটি মূর্খ বেদুঈন লোকের এত বড় মূর্খতা ও অভদ্র আচরণ করা সত্ত্বেও তিনি না কোন কিছু মনে করেছেন, না তাকে কোনরূপ তিরস্কার করেছেন। বরং তার অভদ্র ও অসৌজন্যমূলক আচরণ সত্ত্বেও নিজের ক্রোধ নিবারণ করে নেন। নবী ﷺ এ কারণে শুধু নিজের বিরক্তি বোধকেই চেপে রাখেন নি অধিকন্তু নিজে মৃদু হেসে তাকে কিছু দান করার জন্য নির্দেশও প্রদান করেন। এটি প্রিয় নবী ﷺ -এর পয়গম্বর সুলভ উন্নত চরিত্র ও অনুপম মমত্ববোধের একটি নমুনা। আল্লাহ্পাক আমাদের সকলকে তাঁর এই উন্নত চরিত্র মাধুরীর পরিপূর্ণ অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন!

١٧١. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يَسْتَعِيْنُهُ فِىْ شَيْئٍ، فَأَعْطَاهُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ اَحَسَنْتُ اِلَيْكَ ؟ فَقَالَ الاَعْرَابِىُّ ، لاَ ، وَلاَ اَجْمَلْتَ ، قَالَ فَغَضِبَ الْمُسْلِمُوْنَ وَقَامُوْا اِلَيْهِ ، فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنْ كُفُّوْا، قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةَ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى الاَعْرَابِىْ فَدَعَاهُ اِلَى الْبَيْتِ فَقَالَ اِنَّكَ جِئْتَنَا فَسَأَلْتَنَا فَاَعْطَيْنَاكَ فَقُلْتَ مَا قُلْتَهُ ، فَزَادَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ اَحَسَنْتُ اِلَيْكَ ؟ قَالَ الاَعْرَابِىُّ نَعَمْ ، فَجَزَاكَ اللّٰهُ مِنْ اَهْلٍ وَعَشِيْرَةٍ خَيْرًا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّكَ كُنْتَ جِئْتَنَا فَسَأَلْتَنَا فَأَعْطَيْنَاكَ وَقُلْتَ مَا قُلْتَ وَفِىْ اَنْفُسِ شَيْئٌ مِنْ ذٰلِكَ فَاِنْ اَحْبَبْتَ فَقُلْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ مَاقُلْتَ بَيْنَ يَدِىْ حَتَّى تَذْهَبَ مِنْ صُدُوْرِهِمْ مَا فِيْهَا عَلَيْكَ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ عِكْرِمَةُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَمَّا كَانَ الْغَدَاو الْعَشِىُّ جَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا جَاءَ فَسَأَلَنَا فَاَعْطَيْنَاهُ وَقَالَ مَا قَالَ وَاِذَا دَعَوْنَاهُ اِلَى الْبَيْتِ فَأَعْطَيْنَاهُ زَعَمَ اَنَّهُ قَدْ رَضِىَ ، أَكَذٰلِكَ ؟ قَالَ لاَعْرَابِىُّ نَعَمْ ، فَجَزَكَ اللّٰهُ مِنْ اَهْلٍ وَعَشِيْرَةٍ خَيْرًا ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلاَ اَنَّ مَثَلِىْ وَمَثَلُ هٰذَا الاَعْرَابِىْ كَمَثَلِ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ نَاقَةٌ فَشَرَدَتْ عَلَيْهِ فَاَتَبَعَهَا النَّاسُ فَلَمْ يَزِيْدُوْهَا اِلاَّ نُفُوْرًا فَنَادَاهُمْ صَاحِبُ النَّاقَةِ ! خَلُّوا بَيْنِى وَبَيْنَ نَاقَتِىْ ، فَأَنَا اَرْفَقُ بِنَا وَاَعْلَمُ فَتَوَجَّهُ لَهَا صَاحِبُ النَّاقَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَاَخَذَ لَهَا مِنْ قِمَامِ الاَرْضِ فَرَدَّهَا هَوْنًا هَوْنًا حَتّٰى جَاءَتْ وَاسْتَنَاخَتْ وَشَدَّ عَلَيْهَا وَاِنِّى لَوْ تَرَكْتُكُمْ حَيْثُ قَالَ الرَّجُلُ مَاقَالَ فَقَتَلْتُمُوْهُ دَخَلَ النَّارَ -

১৭১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে জনৈক বেদুঈন নবী ﷺ-এর নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনার জন্য আসলো। নবী ﷺ তাকে কিছু দান করলেন। তারপর বললেন, আমি কি তোমার প্রয়োজন পূরণ করিনি ? তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিনি ? বেদুঈন উত্তর দিলো না, (আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন নি এবং) আমার প্রতি সদাচার করেন নি। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটির উত্তর শুনে উপস্থিত মুসলিমগণ ক্ষেপে গেলেন এবং তারা লোকটির দিকে উঠে আসলেন। কিন্তু নবী ﷺ তাদের হাতের ইশারায় থামিয়ে দেন। হযরত ইকরিমা (রা) বলেন, যে বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নবী ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং বাড়ির দিকে চলে গেলেন। তারপর বেদুঈন লোকটিকে বাড়ি আসার জন্য ডেকে পাঠালেন।

(লোকটি আসলে) তিনি তাকে বললেন যে, তুমি আমাদের কাছে এসে কিছু প্রার্থনা করেছো। আমরা তোমাকে (যতটুকু সম্ভব) দান করেছি। অথচ তুমি এর উপর যা বলার বলে দিয়েছো। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাকে আরো কিছু মালামাল দান করে জিজ্ঞেস করলেন, এবার কি আমি তোমার সাথে সুন্দর আচরণ করলাম ? লোকটি উত্তর দিল, জী হ্যাঁ! আল্লাহ্ আপনাকে এবং পরিবার-পরিজনকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লোকটিকে বললেন, দেখ, তুমি আমাদের কাছে এসে কিছু প্রার্থনা করেছো। আমরা তোমাকে কিছু দান করলাম। তাতে তুমি যা বলার বলেছো। কিন্তু এর কারণে আমরা সাহাবীদের মনে (তোমার উপর) অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তুমি যদি ভাল মনে করো তাহলে তাদের সামনে গিয়েও তুমি এ কথাটি বলো যা এখন আমার সাথে বলেছো। তা হলে তোমার ব্যাপারে তাদের মনে যে অসন্তুষ্টি বিদ্যমান তা দূরীভূত হয়ে যাবে। বেদুঈন লোকটি বললো, খুব ভাল কথা। হাদীসের বর্ণনাকারী ইকরিমা (র) বলেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর যখন প্রভাত হলো (কিংবা তিনি বলেছেন) যখন সন্ধ্যা হলো তখন লোকটি (সাহাবীদের কাছে) আসলো। এ সময় নবী ﷺ সাহাবীদেরকে লক্ষ করে বললেন, তোমাদের এই সাথী আমার কাছে এসে কিছু প্রার্থনা করেছিল। আমি তাকে কিছু দান করলাম। তাতে সে যা বলার বলেছে। এরপর আমি তাকে বাড়ি ডেকে নেই এবং আরো কিছু প্রদান করি। ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। (তারপর তিনি বেদুঈন লোকটির দিকে তাকিয়ে) বললেন, ঘটনা কি এরূপ নয় ? সে উত্তর দিল, জী হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এবং আপনার পরিবার-পরিজনকে উত্তম বিনিময় দান করুন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, অতঃপর নবী ﷺ বললেন, দেখো এ বেদুঈন লোকটির সাথে আমার উদাহরণ হলো এমন যেমন কোন ব্যক্তির, যার একটি উট্‌নী ছিলো। উট্‌নী সেই লোকের কাছ থেকে ভয় পেয়ে পালাতে লাগলো। এ সময় লোকজন তাকে ধরার জন্য পেছনে পেছনে ছুটলো। ফলে তার ভয় আরো বেড়ে গেলো। উট্‌নীর মালিক তখন লোকজনকে বললো, তোমরা আমাকে আমার উট্‌নীর পেছনে ছুটতে দাও। কেননা আমি এ উট্‌নীর প্রতি তোমাদের চেয়ে অধিক দাপরায়ণ এবং তার প্রকৃতি সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞাত। তারপর মালিক নিজে তার দিকে অগ্রসর হলো এবং তাকে একটি উঁচুস্থানে গিয়ে ধরে ফেললো। তারপর ধীরে ধীরে তাকে ফিরিয়ে আনলো। উট্‌নী ফিরে আসার পর মালিক তাকে বসাতে চাইলে সে বসে গেলো এবং তার পিঠের উপর বোঝা বেঁধে নিলো। কাজেই আমি যদি তোমাদেরকে বেদুঈন লোকটির কথা বলার সময় ছেড়ে দিতাম তাহলে তখন তোমরা তাকে হত্যা করে ফেলতে। আর তাকেও জাহান্নামে চলে যেতে হতো।

ফায়দা ঃ উল্লেখিত হাদীসটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উন্নত চরিত্র মাধুরী নির্দেশ করছে। এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ নৈতিকতার সকল উন্নত আদর্শ ও গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। মানবীয় জীবন ও চরিত্রের কোন একটি ক্ষুদ্র দিকও তার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি থেকে বাইরে ছিলো না। তিনি সাহাবীদের মনমেজাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সে কারণে কারোর কোন ত্রুটির উপর তাকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করতেন না। বেদুঈন লোকটির সাথে তাঁর আচরণ ঠিক এরূপই হয়েছিল। লোকটির অসৌজন্যমূলক

উত্তর দান সত্ত্বেও তিনি তাকে কিছু বলেননি। আর সাহাবাদেরকেও কিছু বলতে অনুমতি দেননি। এহেন নরম আচরণ নবী ﷺ এ জন্যও অবলম্বন করেছিলেন যেন লোকটির মনে অসন্তুষ্টি আরো বৃদ্ধি পেতে না পারে। তাই তিনি তাকে নিজ বাড়ি ডেকে নেন। অতিরিক্ত আরো কিছু দান করে তাকে খুশি করে দেন। ঘটনাটিকে তিনি সাহাবীদের কাছে একটি উপমার সাহায্যে ঘটনার প্রেক্ষিতসহ বুঝিয়ে দেন, যেন তাদের অন্তরেও লোকটির ব্যাপারে কোন খারাপ ধারণা অবশিষ্ট না থাকতে পারে। এক সার্বজনীন রহমত হিসেবে তাঁর আগমন এ কথার যাবতীয় দাবি ও চাহিদা তাঁর উপরোক্ত উন্নত চরিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্মপদ্ধতির দ্বারা পরিপূর্ণ হলো। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ সকল চরিত্র সৌন্দর্য ও প্রজ্ঞার দ্বারা সুসমৃদ্ধ করুন।

١٧٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا اَرَادَ هُدَى زَيْدِبْنِ
سَعْنَةَ قَالَ زَيْدُ مَا مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ اِلاَّ وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِيْ وَجْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ
حِيْنَ نَظَرْتُ اِلَيْهِ اِلاَّ اِثْنَانِ لَمْ اَخْبَرْهُمَا مِنْهُ يَسْبَقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ وَلَا يَزِيْدُهُ
شِدَّةُ الْجَهْلِ اِلاَّ حِلْمًا ، فَكُنْتُ اَنْطَلِقُ اِلَيْهِ لِاُخَالِطَهُ فَاَعْرِفَ حِلْمَهُ مِنْ جَهْلِهِ
فَخَرَجَ يَوْمًا مِنَ الْحُجُرَاتِ يُرِيْدُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهُ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ
عَنْهُ ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَسِيْرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدْوِيْ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَرْيَةَ بَنِيْ
فُلَانٍ اَسْلَمُوْا وَدَخَلُوْا فِيْ الاِسْلَامِ وَحَدَّثْتُهُمْ اَنَّهُمْ اِنْ اَسْلَمُوْا اَتَتْهُمْ اَرْزَقُهُمْ رَغَدًا
وَقَدْ اَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ وَشِدَّةٌ وَقُحُوْطٌ مِنَ الْعَيْشِ وَاِنِّيْ مُشْفِقُ اَنْ يَخْرُجُوْا مِنَ
الاِسْلَامِ طَمَعًا كَمَا دَخَلُوْا فِيْهِ طَمَعًا، فَاِنْ رَأَيْتَ اَنْ تُرْسِلَ اِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُعِيْنُهُمْ
بِهِ فَعَلْتَ، فَقَالَ زَيْدُبْنُ سَعْنَةُ فَقُلْتُ اَنَا اَبْتَاعُ مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا وَسَقًا فَبَايَعَنِيْ
وَاَطْلَقْتُ هِمْيَانِيْ وَاَعْطَيْتُهُ ثَمَانِيْنَ دِيْنَارًا، فَدَفَعَهَا اِلَى الرَّجُلِ وَقَالَ اَعْجِلْ
عَلَيْهِمْ بِهَا وَاَغِثْهُمْ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ الْمَحَلِّ بِيَوْمٍ اَوْ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةٍ فَخَرَجَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ اِلَى جَنَازَةٍ بِالْبَقِيْعِ وَمَعَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيْ نَفَرٍ مِنْ اَصْحَابِهِ فَلَمَّا
صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ وَدَنَا مِنَ الْجِدَارِ جَذَبْتُ بُرْدَيْهِ جَبْذَةً شَدِيْدَةٍ حَتّٰى سَقَطَ عَنْ
عَاتِقِهِ، ثُمَّ اَقْبَلْتُ بِوَجْهٍ جَهْمٍ غَلِيْظٍ فَقُلْتُ اَلاَ تُقْضِيْنِيْ يَا مُحَمَّدُ فَوَ اللّٰهِ
مَاعَلِمْتُكُمْ بَنِيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَمُطِلٌّ وَقَدْ كَانَ لِيْ بِخَالَطَتِكُمْ عِلْمٌ قَالَ زَيْدُ
فَارْتَعَدَتْ فَرَائِضُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَالْفُلْكِ الْمُسْتَدِيْرِ ثُمَّ رَمَى بِبَصَرِهِ ثُمَّ

قَالَ اَىْ عَدُوَّ اللّٰهِ اَتَقُوْلُ هٰذَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ؟ وَتَصْنَعُ بِهِ مَا اَرَى؟ وَتَقُوْلُ مَا اَسْمَعُ؟ فَوَالَّذِىْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَوْلَا مَا اَخَافُ فَوْقَهُ لِسَبَقَنِىْ رَاسُكَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ اِلَى عُمَرَ فِىْ تَؤْدَةٍ وَسُكُوْنٍ ثُمَّ تَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ لَاَنَا وَهُوَ اَحْوَجُ اِلَى غَيْرِ هٰذَا اَن تَاْمُرَنِىْ بِحُسْنِ الْاَدَاءِ وَتَاْمُرَهُ بِحُسْنِ اتِّبَاعِهِ اِلَى هُنَا عَنْ اَبِىْ عَاصِمٍ وَزَادَ اَبُوْ زُرْعَةَ فِىْ حَدِيْثِهِ اِذْهَبْ بِهٖ يَا عُمَرُ فَاقْضِ حَقَّهُ وَزِدْهُ عِشْرِيْنَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ مَكَانَ مَارَعْتَهُ قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ فَذَهَبَ بِىْ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَضَانِىْ حَقِّىْ وَزَادَنِىْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقُلْتُ مَاهٰذَا قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَزِيْدَكَ مَكَانَ مَارَعْتُكَ فَقُلْتُ اَتَعْرِفُنِىْ يَاعُمَرُ؟ قَالَ لَا فَمَنْ اَنْتَ ؟ قَالَ اَنَا زَيْدُ ابْنُ سَعْنَةَ قَالَ الْحِبْرُ؟ قُلْتُ الْحِبْرُ قَالَ فَمَا دَعَاكَ اِلَى اَنْ تَفْعَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَافَعَلْتَ وَتَقُوْلُ لَهُ مَا قُلْتُ قُلْتُ يَا عُمَرُ اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوَّةِ شَىْءٌ اِلَّا وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِىْ وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ نَظَرْتُ اِلَيْهِ اِلَّا اثْنَتَانِ لَمْ اَخْبُرْهُمَا مِنْهُ يَسْبَقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ ، وَلَا يَزِيْدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ اِلَّا حِلْمًا فَقَدِ اخْتَبَرْتُهُ مِنْهُ فَاُشْهِدُكَ يَا عُمَرُ اَنِّىْ قَدْ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا ، وَاُشْهِدُكَ اَنَّ شَطْرَ مَالِىْ - فَاِنِّىْ اَكْثَرُهَا مَالاً - صَدَقَةٌ عَلَى اُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ اَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ فَاِنَّكَ لَاتَسَعُهُمْ كُلُّهُمْ قُلْتُ اَوْ عَلٰى بَعْضِهِمْ، قَالَ فَرَجَعَ عُمَرُ وَزَيْدُبْنُ سَعْنَةَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ زَيْدٌ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ فَاٰمَنَ بِهِ وَصَدَّقَهُ وَبَايَعَهُ وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاهِدَ كَثِيْرَةً -

১৭২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সালাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহান আল্লাহ্ যখন যায়িদ ইব্‌ন সা'না (রা)-কে হেদায়েতের ইচ্ছা করলেন তখন যায়িদ ইব্‌ন সা'না বলল, আমি মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর চেহারা মুবারক দর্শন করেই তাঁর নবুওয়াতের নিদর্শনসমূহের দু'টি ব্যতীত অবশিষ্ট সবগুলি অনুধাবন করে নিয়েছি। যে দু'টি আমি অনুধাবন করতে পারিনি সেগুলি হলো, (এক) তাঁর এ পরিমাণ ধৈর্যশীলতা যে, তাঁর ক্রোধের উপর সহিষ্ণুতা প্রবল থাকবে। (দুই) তাঁর সহিত যত বেশি মূর্খতার আচরণ করা হবে ততই তাঁর ধৈর্যশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

যায়িদ ইব্‌ন সা'না বলেন, আমি এ দুটি নিদর্শনের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য চেষ্টা করি। আমি তাঁর দরবারে বারবার আসা-যাওয়া করি এবং তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত থেকে ধৈর্যশীলতার গুণ পর্যবেক্ষণ করি, একদা তিনি হুজরাগুলোর কোন একটি থেকে বেরিয়ে আসলেন। হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি একটি বাহনে আরোহণ করে আসল। তাকে দেখতে বেদুঈন মনে হচ্ছিল। লোকটি নবী ﷺ -কে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ﷺ ! অমুক গোত্রের লোকেরা ইসলাম কবুল করেছে। আমি তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলাম যে, তারা যদি ইসলাম কবুল করে তাহলে তাদের রুজি-রোজগারে সমৃদ্ধি আসবে। অথচ বর্তমানে তারা অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষে জীবন যাপন করছে। কাজেই আমার আশংকা হচ্ছে যে, তারা যে ভাবে লোভ নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করেছে তদ্রূপ অন্য কোন লালসায় পড়ে ইসলাম থেকে বেরিয়ে না যায়। অতএব আপনি যদি ভাল মনে করেন, সাহায্য হিসেবে তাদের জন্য কিছু পাঠিয়ে দিন। (এ কথা শুনে) যায়িদ ইব্‌ন সা'না নবী ﷺ -কে বললেন, আপনি আমার সাথে একটি (অগ্রিম) কেনাবেচা করুন। আমি আপনার নিকট থেকে টাকার বিনিময়ে এক ওয়াসাক জিনিস খরিদ করলাম। এ কথা বলে আমি আমার থলি খুললাম এবং আশিটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে নবী ﷺ -কে দিলাম। নবী ﷺ সেই টাকা লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, এ টাকা নিয়ে তুমি তাদের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাও এবং তাদের সাহায্য কর। যায়িদ ইব্‌ন সা'না (রা) বলেন, তারপর যখন মাল পরিশোধ করার সময় ঘনিয়ে আসল, কেবল দু'-একদিন বাকি। এ সময় তিনি মদীনাবাসীদের গোরস্থান জান্নাতুল বাকীতে এক জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য বাইরে আসলেন। হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)সহ কতিপয় সাহাবীও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। নবী ﷺ যখন সালাত শেষ করে দেওয়ালের কাছে আসলেন তখন আমি তাঁকে তাঁর চাদরের উভয় পার্শ্ব ধরে সজোরে টান দিলাম যে, গ্রীবাদেশ থেকে চাদরটি নিচে পড়ে গেল। আমি খুবই রূঢ়ভাবে চেহারা বিকৃত করে তাঁর দিকে তাকালাম এবং বললাম, হে মুহাম্মদ! আপনি কি আমার পাওনা পরিশোধ করবেন না ? আল্লাহ্‌র শপথ! আবদুল মুত্তালিবের গোষ্ঠীর মধ্যে আমি আপনাকে চিনি। আপনি অত্যন্ত টালবাহানাকারী। আপনাদের সাথে চলাফেরা করে আমার এ কথা বুঝতে আর বাকি নেই। (যায়িদ ইব্‌ন সা'না) বলেন, (একথা) শুনে হযরত উমর (রা)-এর ঘাড় ও বুক (ঢেউয়ের মাঝে) গোলাকার নৌযানের ন্যায় কাঁপতে শুরু করলো। তিনি চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। তারপর বললেন, ওহে আল্লাহ্‌র দুশমন! তুমি এমন কথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলছো ? প্রিয় নবীর সঙ্গে তুমি কি আচরণ করছো ? আমি তা দেখে যাচ্ছি আর কী সব কথা বলছো তাও শুনে যাচ্ছি। সেই সত্তার শপথ! যিনি তাঁকে সত্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, যদি আমি আমার ইচ্ছার সেই জিনিসটি নষ্ট হওয়ার আশংকা না করতাম তা হলে আমি তোমার গর্দান উড়িয়ে দিতাম। নবী

ﷺ তখন অতিশয় ধীরসুস্থ ও শান্ত প্রকৃতিতে হযরত উমরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, হে উমর, আমার ও এ ব্যক্তির ব্যাপারে এ কথা বলার বদলে অন্য একটি কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন ছিলো। প্রয়োজনের সে কাজটি হলো তুমি আমাকে তার পাওনা সুন্দরভাবে আদায় করতে বলবে এবং তাকে নরম ভাষায় চাওয়ার নির্দেশ দিবে। আবূ আসিম (রা) হাদীসটির এ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত আবূ যুরআহ (রা) পরবর্তী অংশ সম্পর্কে বলেন, তারপর নবী ﷺ বললেন, হে উমর! লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে যাও এবং তার পাওনা শোধ করে দাও। অধিকন্তু তুমি যেহেতু তাকে ভীতি প্রদর্শন করেছো তাই তাকে বিশ সা' অতিরিক্ত প্রদান করবে। যায়িদ ইব্ন সা'না (রা) বলেন, অতঃপর হযরত উমর (রা) আমাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে যান এবং আমার পাওনা শোধ করে অতিরিক্ত সা' খেজুরও প্রদান করেন। আমি তাকে বললাম, অতিরিক্তটি কিসের বিনিময়ে ? তিনি বললেন, নবী ﷺ আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি যেহেতু তোমাকে ভীতি প্রদর্শন করেছি, এ কারণে তোমাকে কিছু বেশি প্রদান করতে। আমি তাকে বললাম, হে উমর! আপনি আমাকে চেনেন? তিনি বললেন, না, চিনি না। তুমি কে ? তখন আমি বললাম, আমি যায়িদ ইব্ন সা'না। উমর (রা) বললেন, ইয়াহূদীদের পণ্ডিত সা'না ? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। হযরত উমর (রা) বললেন, তা হলে তুমি প্রিয় নবী ﷺ-এর সাথে এহেন আচরণ ও এহেন অভদ্র কথাবার্তা বলেছ কেন ? আমি বললাম, হে উমর! কথা হলো আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারার দিকে তাকালাম তখন তাঁর চেহারায় দু'টি ব্যতীত নবুওয়াতের সব চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। অবশিষ্ট সেই দু'টি হলো তাঁর ধৈর্যশীলতা ও সহিষ্ণুতা এমন থাকবে যে, তাঁর ধৈর্য তাঁর ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে। অপরটি হলো তাঁর সাথে যতই রূঢ় আচরণ করা হবে ততই তাঁর মধ্যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে। কাজেই হে উমর! এখন আমি তোমাকে সাক্ষী রাখছি, আমি মহান আল্লাহ্কে প্রভু হিসাবে, দীন ইসলামকে সত্য দীন হিসাবে এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-কে সত্য নবী হিসেবে মেনে নিতে সম্মত। (অর্থাৎ আমি ঈমান আনয়ন করলাম।) আমি তোমাকে আরো সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমার অর্ধেক সম্পদ নবী ﷺ -এর উম্মতের জন্য ওয়াক্ফ করে দিচ্ছি। কেননা আমার কাছে প্রচুর সম্পদ রয়েছে। হযরত উমর (রা) বললেন, না কিছু সংখ্যক উম্মতের জন্য ? কেননা উম্মতের সকলের জন্য এ সম্পদ যথেষ্ট হবে না। আমি বললাম, ঠিক আছে, উম্মতের কিছু সংখ্যকের জন্য। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর যায়িদ ইব্ন সা'না ও হযরত উমর (রা) উভয়ে নবী ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হন। এবং যায়িদ ইব্ন সানা (রা) কালেমা পড়ে বলেন ঃ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। এভাবে যায়িদ ইব্ন সানা (রা) আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ন করলেন এবং প্রিয় নবী ﷺ-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করলেন। তারপর প্রিয় নবী ﷺ-এর সাথে বহু সংখ্যক যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

ফায়দা : এই বিস্তারিত ঘটনাটি থেকে অনুমান করা যায় যে, নবী ﷺ কতখানি ধৈর্য-গুণসম্পন্ন, সহিষ্ণুতাপরায়ণ ও ক্রোধ দমনকারী ছিলেন। একজন অমুসলিমের এতটুকু ধৃষ্টতা প্রদর্শন সত্ত্বেও নবী ﷺ তাকে কিছুই বললেন না। অধিকন্তু হযরত উমর (রা) তাকে ভয় দেখানোর কারণে তিনি তার দাদা পাওনার অতিরিক্ত আরো কিছু প্রদান পূর্বক লোকটিকে ভীতিমুক্ত এবং সন্তুষ্ট করার নির্দেশ দেন। নবী ﷺ-এর এই পরম ধৈর্যশীলতার ফল দাঁড়াল যে, যায়িদ ইব্‌ন সা'না (রা) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। বস্তুত জগত জুড়ে ইসলামের ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভের পেছনে প্রিয় নবী ﷺ-এর উন্নত চরিত্র মাধুরী ও মহৎ আচরণই ছিল সবচেয়ে বড় উপকরণ। তাঁর উন্নত আদর্শের আকর্ষণে লোকজন তাঁর নিকটবর্তী হতে থাকে, তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক এই উন্নত চরিত্র মাধুরীকে নিম্নোক্ত ভাষায় উপস্থাপন করেছেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ.

আল্লাহ্‌র দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোরচিত্ত হতেন তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। সুতরাং আপনি তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। (সূরা আল ইমরান : ১৫৯)

মানুষের প্রতি কোমল আচরণ করা ও ক্ষমাশীল হওয়া উন্নত চারিত্রিক গুণের পরিচায়ক। মহান আল্লাহ্ আমাদের সকলকে উন্নত চরিত্র অবলম্বনের পূর্ণ তাওফীক প্রদান করুন। আমীন!

١٧٣. عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَقْبَلَ اَعْرَابِىٌّ عَلٰى نَاقَةٍ حَتّٰى اَنَاخَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلٰى نَبِىِّ اللّٰهِ وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ جَالِسٌ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ فِيْهِمُ النُّعَيْمَانُ، فَقَالُوْا لِلنُّعَيْمَانِ وَيْحَكَ اِنَّ نَاقَتَهُ نَاوِيَةٌ يَعْنِىْ سَمِيْنَةٌ فَلَوْنَحَرْتَهَا فَاِنَّا قَدْ قَرِمْنَا اِلَى اللَّحْمِ وَلَوْ قَدْ فَعَلْتَ غَرِمَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَكَلْنَا لَحْمًا. فَقَالَ اِنِّىْ اِنْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ وَاَخْبَرْتُمُوْهُ بِمَا صَنَعْتُ وَجَدَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا لَاتَفْعَلْ فَقَامَ فَضَرَبَ فِىْ لَبَّتِهَا ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَرَّ بِالْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو وَقَدْ حَفَرَ حُفْرَةً وَقَدْ اسْتَخْرَجَ مِنْهَا طِيْنًا، فَقَالَ يَامِقْدَادُ ! غَيِّبْنِىْ فِىْ هٰذِهِ الْحُفْرَةِ وَاَطْبِقْ عَلَىَّ شَيْئًا وَلَا تَدُلَّ عَلَىَّ شَيْئًا فَاِنِّىْ قَدْ اَحْدَثْتُ حَدَثًا. فَفَعَلَ فَلَمَّا خَرَجَ الْاَعْرَابِىُّ رَاٰى نَاقَتَهُ فَصَرَخَ فَخَرَجَ نَبِىُّ

اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا؟قَالُوْا نُعَيْمَانُ ، قَالَ وَاَيْنَ تَوَجَّهَ فَتَبِعَهُ رَسُوْلُ
اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ سَمْزَةُ وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى اَتٰى عَلَى الْمِقْدَادِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
لِلْمِقْدَادِ هَلْ رَاَيْتَ لِيْ نُعَيْمَانَ؟ فَصَمَتَ فَقَالَ لَتُخْبِرَنِيْ اَيْنَ هُوَ ؟ فَقَالَ مَالِيْ بِهِ
عِلْمٌ ؟ وَاَشَارَ بِيَدِهِ اِلٰى مَكَانِهِ فَكَشَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ
مَاحَمَلَكَ عَلٰى مَاصَنَعْتَ؟ قَالَ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاَمَرَنِيْ بِهِ حَمْزَةُ وَاَصْحَابُهُ
وَقَالُوْا كَيْتَ وَكَيْتَ فَاَرْضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالاَعْرَابِيَّ مِنْ نَاقَتِهِ وَقَالَ شَأْنُكُمْ
بِهَا فَاَكَلُوْهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا ذَكَرَ صَنِيْعَهُ ضَحِكَ حَتّٰى تَبْدُوَ
نَوَاجِذُهُ ـ

১৭৩. হিশাম ইব্‌ন ওরওয়া তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, একদা জনৈক বেদুঈন একটি উষ্ট্রীর উপর আরোহণ করে নবী ﷺ-এর সাক্ষাতে আসল। লোকটি মসজিদে নববীর দরজায় উট্‌নীটিকে বসিয়ে নবী ﷺ-এর সাক্ষাতের জন্য ভিতরে প্রবেশ করে। সেখানে হযরত হামযা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রা) কতিপয় মুহাজির ও আনসার সাহাবীসহ বসা ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত নুআইমানও উপস্থিত ছিলেন। সাথীরা হযরত নুআইমান (রা)-কে বললেন, আরে তুমি কি বেদুঈন লোকটির উট্‌নীটি দেখতে পাচ্ছ না ? কী মোটা-তাজা! এটি যদি যবেহ্‌ করতে পারতে! কেননা আজ আমাদের গোশ্‌ত খাওয়ার ইচ্ছা হচ্ছে। তুমি এমনটি ঘটিয়ে ফেললে নবী ﷺ উটনীর মালিককে জরিমানা আদায় করে দেবেন। এদিকে গোশ্‌ত আমরা বিনামূল্যে পেয়ে যাবো। নুআইমান (রা) বললেন, আমি এমনটা করে ফেললে তোমরা রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর কাছে আমার কথা বলে দেবে। আর তখন তিনি আমার প্রতি রাগ করবেন। সাথীগণ বললেন, না, আমরা তা কিছুতেই করবো না। সে মতে হযরত নুআইমান (রা) দাঁড়ালেন এবং উট্‌নীটিকে নাহর করে দিলেন। তারপর সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন। পথিমধ্যে হযরত মিক্‌দাদ ইব্‌ন আমর (রা)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। হযরত নুআইমান (রা) তাঁকে বললেন, হে মিকদাদ! তুমি আমাকে এ গর্তে লুকিয়ে থাকতে দাও। আমার মাথার উপর কোন কিছু দিয়ে ঢেকে ফেলো। আর আমার কথা কাউকে জানাবে না। কেননা আমি একটি নতুন দুষ্টমী করে আসছি। হযরত মিকদাদ (রা) তাই করলেন।

এদিকে বেদুঈন লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে যখন নিজের উট্‌নী মাটিতে পড়া অবস্থায় দেখল তখন সে চিৎকার দিতে লাগল। এ কাজ করেছে কে ? লোকজন বললো, নুআইমান। নবী ﷺ বললেন, সে কোন্‌ দিকে গিয়েছে ? তারপর তিনি তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। হযরত হামযা ও তাঁর সাথীগণও নবী ﷺ-এর সঙ্গে সঙ্গে চললেন। অবশেষে তাঁরা হযরত মিকদাদ (রা) পর্যন্ত পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ তাঁকে বললেন, হে মিকদাদ! তুমি কি নুআইমানকে দেখেছো ? হযরত মিকদাদ (রা) নিরুত্তর। নবী ﷺ বললেন, তোমাকে বলতে হবে সে কোথায় ? হযরত মিকদাদ (রা) মুখে আমি জানি না বলে হাতের ইশারায় সে

স্থানটি দেখিয়ে দেন। সে মতে নবী ﷺ গর্তের ঢাকনা সরালেন এবং বললেন, আরে নিজ প্রাণের দুশমন! এমনটা করলে কেন ? নুআইমান বললেন, কসম আমাকে তো হযরত হামযা ও তাঁর সাথীরা এমনটা করতে বলেছে। তাঁরা আমাকে এ সব কথাও বলেছিল। নবী ﷺ তখন বেদুঈন লোকটিকে তার উট্নীর বিনিময়ে কিছু মালামাল দিয়ে সম্মত করান। তারপর বললেন, যাও উট্নীটি নিয়ে যাও। সেমতে সাথীগণ উট্নীটি নিয়ে গোশ্ত আহার করে। পরবর্তীকালে যখনই নবী ﷺ তাদের এই দুষ্টমির কথা মনে করতেন তখন তাঁর হাসি রোধ করতে পারতেন না। তিনি খিলখিল করে হেসে ফেলতেন এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা যেত।

ফায়দা ঃ উল্লিখিত হাদীস থেকেও এ কথা বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সীমাহীন ক্ষমাশীল ও দয়ালু ছিলেন। কোন কাজে তিনি রাগ করতেন না। তবে হ্যাঁ, যদি দীনী কোন কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হতো তখন তিনি অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করতেন।

١٧٤. عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُوْلُ مَارَاَيْتُ اَحَدًا اَكْثَرَ مِزَاحًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْهُ وَاِنْ كَانَ يَسَنُّوْ اَهْلَ الصَّبِيِّ اِلَى مِزَاحِهِ۔

১৭৪. হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন মুগীরা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (রা) থেকে শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অপেক্ষা অধিক কাউকে কৌতুক করতে দেখেছি, আর না তাঁর চেয়ে অধিক কাউকে মুচকি হাসি হাসতে দেখেছি। আর বাচ্চাদের অভিভাবকরা তো তাঁর এ কৌতুক করাকে নিজেদের গর্ব বলে বোধ করতো এবং খুবই আনন্দিত হতো। এর কারণ ছিলো নবী ﷺ বাচ্চাদের সাথে খুবই কৌতুক করতেন।

ফায়দা ঃ নবী ﷺ থেকে যেভাবে কৌতুক করা প্রমাণিত আছে তদ্রূপ কৌতুক করার উপর নিষিদ্ধতাও বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে এ নিষেধ বিদ্যমান। কাজেই বিষয়টির ব্যাখ্যা আবশ্যক, যাতে বোঝা যায় যে, কোন্ ধরনের কৌতুক জায়িয ও পছন্দনীয়, আর কোন্ ধরনের কৌতুক নিষিদ্ধ। বস্তুত কৌতুকের দু'টি রূপ আছে। একটি হলো, এমন কৌতুক যা ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর যিকর ফিকর থেকে উদাসীন বানিয়ে দেয়। যা ব্যক্তির কঠোর চিন্তার কারণ হয়ে থাকে। এ ধরনের কৌতুক করা সাধারণত হাটে-বাজারের লোকদের নীতি। তারা কথায় কথায় হাসি-ঠাট্টা করে। নানা গল্প-গুজবে মত্ত থাকে। এ সব কৌতুকের সঙ্গে সত্যতা ও বাস্তবতার লেশমাত্র সম্পর্ক থাকে না। কাজেই এ প্রকৃতির কৌতুক একজন মুসলিমের মান-সম্মান ও গাম্ভীর্যকে খুইয়ে দেয়। অধিকন্তু এ ধরনের কৌতুক কখনো কখনো অন্যজনের সম্মান হানি কিংবা উপহাস এমনকি মনকষ্টের কারণ হয়ে থাকে। কাজেই এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। কিন্তু যে কৌতুক মানব মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি করে সেখানে সে সব জিনিস থাকে না। বরং এ কৌতুক দ্বারা অন্যজনের মন সন্তুষ্টি, প্রসন্নতা, আনন্দ ও চিত্তসুখ বৃদ্ধি পায়। যেগুলি সত্যনির্ভর হয়ে থাকে অর্থাৎ কৌতুক বটে

তবে সত্য ও বাস্তবসম্মত। এমন কৌতুক করতে দোষ নেই বরং মুস্তাহাব ও মসনূন বলা চলে। যেমন একটি হাদীসে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, সাহাবীগণ বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদের সঙ্গে কখনো কখনো কৌতুকও করে থাকেন। নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তাতে আপত্তির কি আছে ? কিন্তু এ কৌতুকে আমি অসত্য কথা বলি না। (শামায়েলে তিরমিযী।)

١٧٥. عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَنَحْنُ نَذْكُرُ حُمَّى الْمَدِيْنَةِ وَانْتِقَالَهَا اِلٰى مَهْيَعَةَ وَنَضْحَكُ ثُمَّ صِرْنَا اِلٰى حَدِيْثِ بَرِيْرَةَ وَمَسْكَنِهَا. اِذْ افْتَتَحَ عَلَيْنَا عَبْدُاللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ اَكْثَرْنَا وَقَالَ دَعْنَا مِنْ بَاطِلِكُمَا. قَالَتْ عَائِشَةُ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنِّى لَاَمْزَحُ وَلَا اَقُوْلُ اِلاَّ حَقًّا۔

১৭৫. উবায়দ ইব্‌ন উমায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। আমরা মদীনার প্রসিদ্ধ জ্বর ও জ্বরটির মাহ্‌যাআ অঞ্চলের দিকে প্রত্যাগমন ইত্যাদি নিয়ে কথাবার্তা ও হাসাহাসি করছিলাম। তারপর আমাদের আলোচনা চলে গেল হযরত বারীরা ও তার ঘর সম্পর্কীয় প্রসিদ্ধ ঘটনার দিকে। ইত্যবসরে আমাদের সম্মুখ দিক দিয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) প্রবেশ করলেন। আমরা তাকে দেখে হাসি-তামাশার পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিলাম। তখন তিনি বললেন, আপনারা আমার সামনে এ সব অর্থহীন কথা বলা বন্ধ করুন। এর উপর হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বললেন, সুবহানাল্লাহ্! আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে শুনেননি যে, তিনি বলতেন, আমি কখনো কখনো কৌতুকও করি। কিন্তু কৌতুকের জন্যও আমি যে কথা বলি সেটিও ন্যায়ানুগ ও সত্য হয়ে থাকে।

ফায়দা ঃ প্রাথমিক যুগে মদীনা তাইয়্যেবা ছিল আরবের অন্যান্য শহরের তুলনায় অধিকতর অস্বাস্থ্যকর শহর। এখানকার আবহাওয়া ছিল স্বাস্থ্যহানিকর। লোকজন নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকতো। বিশেষত সর্দি জ্বরের মত কষ্টদায়ক রোগটি এখানে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল। সাহাবীগণ যখন মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করেন তখন অন্যদেরসহ হযরত আবূ বকর ও হযরত বিলাল (রা)-ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মদীনায় অবস্থানের উপর সাহাবীদের অসন্তুষ্টি দেখা দিতে শুরু করে। এ পরিস্থিতি দেখে নবী ﷺ মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করেন; হে আল্লাহ্! মদীনাকে তুমি আমাদের জন্য মক্কার চেয়েও অধিক প্রিয় শহর বানিয়ে দাও। এ শহরের জ্বর রোগকে তুমি মাহয়া অর্থাৎ জুহ্‌ফার দিকে ফিরিয়ে দাও।

আল্লাহ্ পাক নবী ﷺ-এর এ দু'আ কবুল করেন। তারপর থেকে সেই মদীনা শহর জগতের অন্যান্য শহরের তুলনায় অধিকতর সুন্দর ও অধিকতর স্বাস্থ্যকর শহরে পরিণত হয়। এ ঘটনা বস্তুত নবী ﷺ-এর এমন একটি স্পষ্ট মুজিযা, যা সকল ভূগোলবিদকেও স্তম্ভিত করে দেয়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হযরত বারীরা (রা) সম্পর্কীয়। তিনি ছিলেন হযরত আয়েশা (রা)-এর ক্রীতদাসী। মুগীস্ নামক জনৈক ক্রীতদাসের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা) যখন তাকে আযাদ করে দেন তখন শরীয়তের আইন অনুসারে নবী ﷺ তাকে পূর্ব স্বামীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা কিংবা বিচ্ছিন্ন করার ইখ্তিয়ার প্রদান করেন। কেননা, তার স্বামী ছিলেন তখনও ক্রীতদাস অথচ তিনি আযাদী পেয়ে গিয়েছিলেন। ইখ্তিয়ার পেয়ে হযরত বারীরা (রা) সম্পর্ক বিচ্ছেদের পক্ষ অবলম্বনপূর্বক স্বামীর ঘর থেকে চলে যান। তার এ বিরহে স্বামীর খুবই মন কষ্ট হয়। মুগীস বিরহ যাতনায় 'অশ্রুপাত করা অবস্থায় মদীনার অলিগলি ঘুরতে শুরু করে। কিন্তু বারীরার মন কিছুতেই ফিরেনি। শেষ পর্যন্তও সে পূর্ব বিবাহের সম্পর্ক অবশিষ্ট রাখলো না। বৃদ্ধ মুগীস ও বারীরার এ ঘটনা লোকজনের মুখরোচক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। লোকজন আনন্দ উল্লাসের সময় এ ঘটনা বলাবলি করতো।

হযরত উবায়দ ইব্ন উমায়র ও হযরত আয়েশা (রা) উপরোক্ত ঘটনাদ্বয় নিয়ে হাসি কৌতুক করছিলেন। ইত্যবসরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) প্রবেশ করেন। তিনি এ ধরনের গল্প বলার উপর আপত্তি উত্থাপন করলে হযরত আয়েশা (রা) তাঁর আপত্তি খণ্ডন করেন। তিনি নবী ﷺ-এর হাদীসের উদ্ধৃতি শুনিয়ে বলেন, এটি এক ধরনের মিথ্যাযুক্ত প্রফুল্লতা প্রদানকারী কৌতুক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিজেও এ ধরনের কৌতুক করতেন।

١٧٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَهُ اَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْزَحُ؟ فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَمْزَحُ –

১৭৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি (অবাক হয়ে) জিজ্ঞেস করেছিল, নবী ﷺ কখনো কি কৌতুক করেছেন ? তখন ইব্ন আব্বাস (রা) বললেন, হ্যাঁ, নবী ﷺ কৌতুকও করতেন।

١٧٧. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اَحْمِلْنِىْ فَقَالَ اِنَّا حَامِلُوْكَ عَلٰى وَلَدِ النَّاقَةِ قَالَ الشَّيْخُ وَمَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ ؟ فَقَالَ هَلْ تَلِدُ الاِبِلُ اِلاَّ النُّوْقَ ؟ وَقَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوْزٌ –

১৭৭. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে আরোহণ করার জন্য একটি বাহন দান করুন। নবী ﷺ বললেন, ঠিক আছে। তোমাকে আমি আরোহণের জন্য একটি উট্নীর বাচ্চা দিব। প্রার্থনাকারী বৃদ্ধ লোকটি বললো, উট্নীর বাচ্চা দিয়ে আমি কি করবো ? (আমার তো আরোহণের উপযুক্ত বয়স্ক কোন উট কিংবা উট্নীর প্রয়োজন) নবী ﷺ বললেন ঃ প্রতিটি উট্ই কোন না কোন উট্নীর বাচ্চা। অনুরূপভাবে নবী ﷺ একদা কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন, (মনে রাখবে) বেহেশ্তে কোন বৃদ্ধা প্রবেশ করবে না।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কৌতুক করতেন। কিন্তু তাঁর কৌতুকগুলি সর্বদা এমন হতো যা হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার ও প্রফুল্লতা সৃষ্টিসহ সত্য ও বাস্তবসম্মত হয়ে থাকতো। সে মতে তিনি আরোহণের জন্তু সম্পর্কে যা বলেছেন সে ছিল কৌতুক। তারপর প্রশ্নকারীর মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখে তিনি নিজেই কথাটির রহস্য খুলে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি কোন বৃদ্ধা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না বলে যে উক্তি করেছেন সেটিও রহস্যপূর্ণ। কেননা কিয়ামতের দিনে সকল বৃদ্ধই তারুণ্যের রূপ নিয়ে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

١٧٨. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَدْلِغُ لِسَانَهُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ، فَيَرٰى الصَّبِىُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ فَيَبْهَشُ اِلَيْهِ -

১৭৮. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (কৌতুক করে) হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা)-এর সামনে মুখ থেকে জিহ্বা বের করে দেখাতেন। তখন সে বাচ্চা [হাসান ইব্ন আলী (রা)] নবী ﷺ-এর জিহ্বার লাল রং দেখে (খেজুর কিংবা আহারের কোন জিনিস মনে করে) তা ধরার জন্য হাত ঝাপটাতে থাকতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ যেভাবে বড়দের সঙ্গে হাসি-কৌতুক করতেন তেমনি তিনি শিশুদের সঙ্গেও হাসি-কৌতুক এবং স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতেন। এ সব কাজে কোন কিছুতে তিনি সংকোচ অনুভব করতেন না। এমন কি তাঁর আত্মমর্যাদার বিপরীত বলেও জ্ঞান করতেন না। কেননা নবী ﷺ-এর শান-শওকত তাঁর উচ্চাসন সাধারণ মানুষের ন্যায় কৃত্রিম বা বানোয়াট ছিলো না যে, কৌতুক প্রকাশ বা প্রফুল্লতা সৃষ্টির দরুন তা নষ্ট হয়ে যাবে। বরং তাঁর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধও ছিলো মহান আল্লাহ্ কর্তৃক উম্মতের মনে স্থাপিত একটি বিষয়। সে মতে নবী ﷺ -এর কোমল আচরণ, হাসি-কৌতুক প্রফুল্লতা ও আনন্দদায়ক কথাবার্তা উম্মতের প্রতি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি বড় ধরনের রহমত ও নিয়ামতরূপে বিবেচিত। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ، وَلَوْكُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لاَ نْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ -

আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে আপনি তাদের প্রতি কোমল হৃদয় হয়েছিলেন। যদি আপনি রূঢ় ও কঠোর চিত্ত হতেন তাহলে তারা আপনার আশপাশ থেকে সরে পড়ত। (সূরা আল ইমরান ঃ ১৫৯)

কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলে পাক ﷺ-এর হাসিখুশি আচরণ ও কোমলতাই ছিল সেই চিত্তাকর্ষক আচরণ যা উম্মতের নারী-পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ ও শিশুদের অন্তরকেও পাগলপারা করে দিয়েছিল। যার ফলে তাদের সকলে রিসালাতের আলোকশিখায় আত্মোৎসর্গকারী পতঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

١٧٩. عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا عَجُوْزٌ، فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ ؟ قَالَتْ هِيَ مِنْ اَخْوَالِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْعَجُزَ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَلَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُهُنَّ خَلْقًا غَيْرَ خَلْقِهِنَّ -

১৭৯. হযরত মুজাহিদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ হযরত আয়েশা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন তার কাছে জনৈকা বৃদ্ধা বসে রয়েছেন। নবী ﷺ বললেন, এ বৃদ্ধা মহিলাটি কে ? হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আমার মাতুলালয়ের একজন। নবী ﷺ কৌতুক করে বলেছিলেন, বৃদ্ধা মহিলা কখনোই বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। নবী ﷺ-এর এ কথাটি বৃদ্ধার কাছে ভারী বোধ হলো। (সে অস্থির হয়ে উঠল) কিছুক্ষণ পর নবী ﷺ ঘরে ফিরে আসলে হযরত আয়েশা (রা) তাঁকে বিষয়টি জান'লেন। তখন [illegible] বললেন, (আরে) আল্লাহ্ তা'আলা এ বৃদ্ধাদেরকে (কিয়ামতের দিন) তাদের দৈহিক আকৃতি পরিবর্তন পূর্বক যৌবনের আকৃতিতে পুনরুত্থিত করবেন। (যুবতীর বেশেই সকল বৃদ্ধা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে)।

ফায়দা ঃ হাদীসের অর্থ হলো কিয়ামতের দিন সকল বৃদ্ধাকে যুবতীর আকৃতিতে পুনরুত্থিত করা হবে এবং এ আকৃতিতে তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে। কাজেই বৃদ্ধা অবস্থায় কেউ বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না বরং সকলেই প্রবেশ করবে পূর্ণ যৌবনের আকৃতি নিয়ে। বৃদ্ধা মহিলারা সাধারণত কোন কথার গভীর চিন্তা না করেই অস্থির হয়ে উঠে। নবী ﷺ এ কথা জেনেই হযরত আয়েশার মাতুল সম্পর্কীয় বৃদ্ধার সাথে কৌতুক করেন। স্পষ্ট কথা নবী ﷺ তাঁর কথাটির রহস্য জানিয়ে দিলে বৃদ্ধা নবী ﷺ-এর প্রতি গভীরভাবে অনুরাগী হয়ে ওঠেন। হযরত আয়েশা (রা)-ও এ থেকে লাভ করেন পরম চিত্ত প্রফুল্লতা। এটিই ছিল রাহমাতুল্লিল আলামীনের উপযুক্ত মমত্ববোধ ও আন্তরিকতা।

١٨٠. عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَ بِالنَّبِيِّ ﷺ دُعَابَةٌ يَعْنِيْ مِزَاحًا -

১৮০. হযরত ইকরিমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পবিত্র সত্তায় হাসি-খুশির স্বভাব বিদ্যমান ছিল।

١٨١. عَنِ ابْنِ الْوَرْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَانِيْ النَّبِيُّ ﷺ وَرَانِيْ رَجُلًا اَحْمَرَ فَقَالَ اَنْتَ الْوَرْدُ، قَالَ جُبَارَةُ مَازَحَهُ -

১৮১. হযরত ইব্‌ন আবুল ওয়ারদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ আমাকে দেখতে পেলেন। তিনি আমার শরীরের লালচে শুভ্র বর্ণ দেখে বললেন, তুমি তো রীতিমত গোলাপ ফুল। হযরত জুবারা (ইব্‌ন মুফলিস) বলেন, নবী ﷺ এ কথাটি কৌতুক করে বলেছিলেন।

ফায়দা ঃ আবুল ওয়ারদ (রা) ছিলেন নবী ﷺ-এর একজন সাহাবী। তিনি এ উপনামেই অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইতিপূর্বে তার নাম এটি ছিলো না। এ নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো তিনি লালচে শুভ্র বর্ণের ছিলেন। নবী ﷺ আদর করে তাঁকে গোলাপ ফুল অভিহিত করে বলেছিলেন তুমি তো রীতিমত গোলাপ ফুল। সেই থেকে তিনি আবুল ওয়ারদ অর্থাৎ গোলাপ ফুলের বাবা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

١٨٢. عَنْ اِبْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سُرَّ بِالاَمْرِ اِسْتَنَارَ كَاسْتَنَارَةِ الْقَمَرِ -

১৮২. হযরত ইব্‌ন কা'ব ইব্‌ন মালিক তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, নবী ﷺ যখন কোন কাজে আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠত।

١٨٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَرَّهُ الاَمْرُ اِسْتِنَارَ وَجْهُهُ اِسْتِنَارَةَ الْقَمَرِ -

১৮৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কা'ব তাঁর পিতা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, কোন কাজ যখন নবী ﷺ-কে আনন্দিত করত তখন তাঁর চেহারা মুবারক আলোময় চন্দ্রের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠত।

١٨٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ مَسْرُوْرًا تَبْرُقُ اَسَارِيْرُ وَجْهِهِ -

১৮৪. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একদা ঘরে প্রবেশ করলেন আনন্দচিত্ত অবস্থায়। তখন আনন্দের আতিশয্যে তাঁর চেহারা মুবারকের সৌন্দর্য যেন জ্বলজ্বল করছিল।

ফায়দা ঃ প্রিয় নবী ﷺ-এর উজ্জ্বল ললাট ও আলোকময় চেহারা তাঁর প্রসন্ন প্রকৃতি মমত্ববোধ ও উদারতার প্রকৃষ্ট দলীল।

١٨٥ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى لَهْوَاتِهِ، اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ -

১৮৫. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে কখনো এভাবে হো হো করে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখ গহবরের পূর্ণ অংশ আমার নজরে এসেছে, বরং তিনি (আনন্দ ও প্রসন্নতার মুহূর্তে) মুচকি হাসি হাসতেন।

١٨٦ . عَنْ اَبِىْ رَجَاءَ حُصَيْنُ بْنِ يَزِيْدَ الْكَلْبِىْ قَالَ مَارَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ ضَاحِكًا مَا كَانَ اِلاَّ التَّبَسُّمُ -

১৮৬. হযরত আবূ রাজা হোসাইন ইব্‌ন ইয়াযীদ কালবী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে কখনো (মুখ খুলে) হাসতে দেখিনি। তাঁর হাসার পদ্ধতি মুচকি হাসির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস দুটি থেকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ কখনো হো হো করে কিংবা মুখ খুলে হাসতেন না। হাসির মুহূর্তে সাধারণত তিনি মুচকি হাসি হাসতেন। এমন মুহূর্ত তাঁর জীবনে খুবই বিরল পাওয়া গিয়েছে, যেখানে হাসতে গিয়ে তাঁর মুখ খুলে গিয়েছিলো। এ কারণেই বর্ণনাকারী প্রিয় নবী ﷺ-এর সাধারণত নীতির প্রতি সমীহ প্রকাশ করে বলেন, তিনি জোরে হাসার স্থানেও মুচকি হাসি হাসতেন। প্রিয় নবী ﷺ-এর এই মুচকি হাসির কারণ হলো যে হো হো করে কিংবা মুখ খুলে অট্টহাসি হাসার অভ্যাস মানুষের গাম্ভীর্য ও আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ন করে দেয়।

١٨٧ . عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا رَأٰى مَا يَكْرَهُ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاِذَا رَأٰى مَا يَسُرُّهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ -

১৮৭. হযরত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ অর্থাৎ সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। আর তিনি যখন কোন পছন্দনীয় আনন্দদায়ক জিনিস দেখতেন তখন নিম্নোক্ত দু'আ বলতেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ অর্থাৎ সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র জন্য যার অনুগ্রহ ও দয়ার দৌলতেই যাবতীয় কল্যাণকর কাজ সুসম্পন্ন হয়।

ফায়দা ঃ আলোচ্য হাদীসে দু'টি মূল্যবান দু'আর উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'আ দু'টিকে নিজেদের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করে নেয়া বড়ই সৌভাগ্য ও কল্যাণের বিষয়। নবী ﷺ-এর এটিই নিয়ম ছিল।

١٨٨. عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ ضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ -

১৮৮. হযরত সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এভাবে মুখ খুলে হাসেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

١٨٩. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ ضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ اَنْيَابُهٗ -

১৮৯. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এভাবে হাসতে থাকেন যে, তাঁর তীক্ষ্ণ দাঁতগুলি পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত দু'টি হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ-এর মুখ খুলে হাসির উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত এ ধরনের সীমিত সংখ্যক কয়েকটি ঘটনা পাওয়া যায় যেখানে তিনি অনিচ্ছায় মুখ খুলে হেসেছিলেন নতুবা স্বাভাবিকভাবে তাঁর হাসির নীতি ছিল মুচকি হাসি।

١٩٠. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِىْ هِنْدًا عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ اِذَا غَضِبَ اَعْرَضَ وَاَشَاحَ وَاِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَهٗ جُلُّ ضَحْكِهِ التَّبَسُّمُ يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ حَبَّةِ الْغَمَامِ -

১৯০. হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মামা হযরত হিন্দা (রা)-কে নবী ﷺ-এর গুণাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ যখন কারোর প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন তখন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং সে ব্যাপারে অমনোযোগী থাকতেন। আর যখন আনন্দিত হতেন তখন (লজ্জাশীলতার কারণে) দৃষ্টি অবনমিত করে রাখতেন। তাঁর যাবতীয় হাসির নিয়ম ছিল মুচকি হাসি। কিন্তু এ হাসির সময়ে (তাঁর দাঁতগুলি) বরফের মত শুভ্র ও উজ্জল দেখাত।

١٩١. عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ، اَتَانِىْ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَخْتَصِمُوْنَ فِىْ غُلَامٍ اِمْرَاةٍ وَقَعُوْا عَلَيْهَا جَمِيْعًا فِىْ طُهْرٍ وَاحِدٍ وَكُلُّهُمْ يَدَّعِىْ اَنَّهُ اِبْنُهُ، فَاَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَاَلْحَقْتُهُ بِالَّذِىْ اَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ وَبِنَصِيْبِهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَىْ دِيَةِ الْحُرِّ فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهٗ فَضَحِكَ حَتّٰى ضَرَبَ بِرِجْلَيْهِ الْاَرْضَ ثُمَّ قَالَ حَكَمْتَ فِيْهِمْ بِحُكْمِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ حُكْمَكَ فِيْهِمْ -

১৯১. হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে যখন ইয়ামেনে (কাযী নিযুক্ত করে) পাঠিয়েছিলেন, তখন আমার কাছে তিনজন লোক এসে একটি মামলা দায়ের করলো। এ লোকেরা এমন একটি মহিলার গর্ভজাত শিশুর অভিভাবকত্ব নিয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিলো যে তাদের সকলেরই ক্রীতদাসী ছিলো। এর সঙ্গেই তারা একই 'তুহর' চলাকালে শয্যাগ্রহণ করেছিলো। তিনজনের প্রত্যেকেরই দাবি ছিলো যে শিশুটি তার। হযরত আলী (রা) বলেন, আমি তাদের নামে লটারি করলাম। লটারিতে যার নাম উঠেছিলো শিশুটি তাকেই প্রদান করলাম। আর অবশিষ্ট দু'জনের দাবির বিনিময়ে আমি তার কাছ থেকে একজন আযাদ মানুষের যতটুকু দিয়্যাত (রক্তপণ) দিতে হয় তার দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে দু'জনকে দিয়ে দিলাম। তারপর আমি নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলে এ ঘটনা বর্ণনা করি। নবী ﷺ ঘটনা শুনে খুব হাসলেন। এমন কি হাসির আতিশয্যে তিনি আপন পদযুগল যমীনের উপর মারতে থাকেন। তারপর বললেন, হে আলী! তুমি তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক ফয়সালা করেছো। কিংবা নবী ﷺ বলেছেন, তাদের ব্যাপারে তোমার এ সিদ্ধান্তে মহান আল্লাহ্ খুবই সন্তুষ্ট।

ফায়দা ঃ হাদীস বিশারদ আলিমদের মতে এ হাদীসের সূত্র অতিশয় দুর্বল। গ্রন্থকার (র) এখানে হাদীসটির শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা বিচারের জন্য উপস্থাপন করেন। এবং তাঁর উদ্দেশ্য হলো কেবল নবী ﷺ-এর হাসি ও মুচকি হাসির পদ্ধতি বর্ণনা করা। এই লক্ষ্যেই তিনি হাদীসটিকে আলোচ্য অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করেছেন।

١٩٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَبَسَّمَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ -

১৯২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এমন ভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

١٩٣. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا غَضِبَ رُئِيَ بِوَجْهِهِ ظِلَالٌ -

১৯৩. হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ য... রাগান্বিত হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারকে রাগের ছায়ার প্রতিফলন ফুটে উঠত।

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যে ভাবে তাঁর চেহারা মুবারকে আনন্দ ও প্রফুল্লতার প্রতিক্রিয়া ... সঙ্গে ফুটে উঠত, তদ্রূপ তাঁর রাগ ও ক্রোধের প্রতিক্রিয়াও তাঁর মুবারক চেহারায় স্পষ্ট ... যেত।

صِفَةُ بُكَائِهِ وَحُزْنِهِ ﷺ

নবী ﷺ -এর ক্রন্দন করা ও দুঃখিত হওয়ার বর্ণনা

١٩٤. عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَاَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَدَعَاهُ فَضَمَّهُ اِلَيْهِ فَرَاَيْتُهُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ يَكِيْدُ بِنَفْسِهِ ، فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُوْلُ اِلاَّمَا يُرْضَى رَبَّنَا وَاِنَّا بِكَ يَا اِبْرَاهِيْمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ -

১৯৪. আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পুত্র ইব্রাহীম (রা)-কে (তাঁর মৃত্যুর সময়ে) দেখতে গেলাম। (তখন দেখলাম নবী ﷺ তাঁকে এতই ভালবাসতেন যে, সে মুহূর্তে তিনি ছুটে আসেন এবং) তাঁকে একটি ডাক দিয়ে নিজের বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, তারপর আমি ইব্রাহীমকে নবী ﷺ-এর কোলে এমতাবস্থায় দেখলাম যখন তিনি জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলি অতিক্রম করছিলেন। এ সময় প্রিয় নবী ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুপাত করতে থাকে আর তিনি বলতে থাকেন, চক্ষু অশ্রুপাত করছে, হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু মুখ দ্বারা আমরা কেবল এতটুকু কথাই বলতে পারি যতটুকু পর্যন্ত আমাদের প্রতিপালক সন্তুষ্ট থাকেন। হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার বিদায়ে খুবই ভারাক্রান্ত ও ব্যথিত।

ফায়দা ঃ উল্লিখিত হাদীসে নবী ﷺ-এর ক্রন্দন করা ও ব্যথিত হওয়ার অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি হাসার মুহূর্তে যেভাবে ভারসাম্য নীতি পছন্দ করতেন তেমনি দুঃখ ও বেদনার মুহূর্তে ও ক্রন্দন করার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য নীতি রক্ষা করতেন। এ কারণে যেমনি তিনি কখনো অট্টহাসি হাসতেন না, তেমনি জোর আওয়াজে কিংবা চিৎকার দিয়ে কখনো ক্রন্দন করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর ক্রন্দনের সীমা কেবল এতটুকু পর্যন্ত পৌছত যে, নয়নযুগল অশ্রুতে ভরে যেত, হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত। কিন্তু মুখ থেকে কখনো আহ্! উহ্! ধরনের চিৎকার ধ্বনি বেরিয়ে আসতো না। তাঁর নয়নমণি প্রিয়পুত্র যে মুহূর্তে দুনিয়া থেকে শেষবারের মত বিদায় নিচ্ছিলেন তখন বেদনায় তাঁর হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়, কিন্তু মুখে কান্না ধ্বনি চিৎকার ইত্যাদির বদলে চক্ষুদ্বয় থেকে কেবল অশ্রুপাত ঘটতে থাকে।

নবী ﷺ-এর এ নয়নমণি হযরত ইব্রাহীম (রা) উম্মুল মু'মিনীন মারিয়া কিবতিয়া (রা) -এর গর্ভে মদীনা মুনাওয়ারায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু দুগ্ধপানের সময়সীমা অতিক্রমের পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ১৮ মাস।

নবী ﷺ-এর সর্বমোট তিনজন সাহেবজাদা ও চারজন সাহেবজাদী জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রদের মধ্যে সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করেন হযরত কাসিম (রা)। তিনি উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা (রা)-এর গর্ভে জন্ম নেন। তারপর তিনি যখন সবেমাত্র পা বাড়িয়ে হাঁটার বয়স পর্যন্ত পৌঁছেন তখন ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ (রা), তিনি মক্কা মুয়াযযমায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। আর তৃতীয় পুত্র ছিলেন এই হযরত ইব্‌রাহীম (রা)।

নবী ﷺ-এর চারজন সাহেবজাদী ছিলেন। হযরত যায়নাব, হযরত রুকাইয়্যা, হযরত উম্মে কুলসূম ও হযরত ফাতিমাতুয্ যাহরা (রা)। হযরত ফাতিমাতুয্ যাহরা (রা)-এর মাধ্যমেই দুনিয়ায় তাঁর বংশের বিস্তার লাভ ঘটে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইতিহাসের গ্রন্থাবলি দ্রষ্টব্য।

١٩٥. عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُوْمِىُّ لَمَّا اُصِيْبَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَىْ مَنْزِلِهِ فَلَمَّا رَاَتْهُ ابْنَتُهُ جَهَشَتْ فِىْ وَجْهِهِ فَانْتَحَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اَصْحَابِهِ مَاهٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ هٰذَا شَوْقُ الْحَبِيْبِ اِلَىْ حَبِيْبِهِ -

১৯৫. হযরত খালিদ ইব্‌ন সালামা মাখযূমী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা) যখন (মাসতার যুদ্ধে) শাহাদত বরণ করেন তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর গৃহে যান। হযরত হারিসের কন্যা নবী ﷺ-কে দেখেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নবী ﷺ নিজেও তাঁর সাথে কাঁদতে শুরু করেন। তখন জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ কি ব্যাপার! (আপনি নিজেও কাঁদছেন?) নবী ﷺ ইরশাদ করলেন ঃ এটি হলো এক বন্ধুর প্রতি অপর বন্ধুর ভালবাসার আন্তরিক বহিঃপ্রকাশ।

ফায়দা ঃ হযরত যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অন্যতম প্রিয় সাহাবী। জাহেলী যুগে তিনি অপহৃত হন এবং গোলাম হিসাবে বিক্রি হয়ে যান। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা) তাঁকে খরিদ পূর্বক নবী ﷺ-কে হাদিয়া হিসেবে দেন। নবী ﷺ তাঁকে আযাদ করে দেন এবং নিজের পোষ্যপুত্র রূপে বরণ করেন। তিনি যায়দকে অতিশয় ভালবাসতেন। এমন কি যখন হযরত যায়দের পিতামাতা নিজ পুত্রের সন্ধান পেয়ে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চাইলেন তখন হযরত যায়দ (রা) নবী ﷺ-কে ত্যাগ করে আপন পিতামাতার সঙ্গে যেতে অস্বীকার করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি নবী ﷺ-এর কাছে থাকাকেই পছন্দ করেন। তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মূতার যুদ্ধে নবী ﷺ তাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করে সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেছিলেন। এ যুদ্ধে (৮ম হিজরীতে) তিনি শাহাদত লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুতে নবী ﷺ শোকে জর্জরিত হয়ে পড়েন। অতঃপর নবী ﷺ সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর কন্যার গৃহে গমন করলে ভালবাসা ও মানবিক

কারণে তিনিও ক্রন্দন সংবরণ করতে পারেননি। তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে শুরু করেছিলো। সাহাবীগণ তাঁর কাছে এ কান্নার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, এ কান্নাকাটি বস্তুত মানুষের সহজাত একটি বিষয়। পরস্পরের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ও সম্পর্কের কারণে এটি হয়ে থাকে। এ হাদীসের মধ্যেও নবী ﷺ থেকে যে কান্নাকাটি করার উল্লেখ পাওয়া যায় সেটিও নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। এতে চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি, অস্থিরতা ও বিলাপ করার নাম-গন্ধও নেই। তবে বিরহ যাতনা ও বিরহ বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এতটুকু না হওয়া মানুষের কঠোর চিত্ততার পরিচায়ক। (অথচ কঠোর চিত্ততা, দয়া-মায়াহীনতা হলো মমত্ববোধের বিপরীত যা আল্লাহ্‌র কাছে পছন্দনীয় নয়।) তবে কান্নাকাটি করার মুহূর্তে সীমা অতিক্রম করা, চিৎকার কিংবা বিলাপ করা ইত্যাদি শরীয়ত বিরোধী ও নিষিদ্ধ। নবী ﷺ-এর জীবন চরিতের প্রতিটি অধ্যায় উম্মতের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয়। তাঁর এই কর্মপদ্ধতি পরম যাতনা ক্লিষ্টতা ও ব্যথাতুর হওয়ার মুহূর্তে দুঃখ ও বেদনা প্রকাশের একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দিচ্ছে এবং ভারসাম্যপূর্ণ একটি পথের সন্ধান দিচ্ছে। এটিই ছিল সেই উন্নত ও মহান চরিত্র যাঁর ঘোষণায় মহান আল্লাহ্‌ ইরশাদ করেন ঃ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (হে রাসূল) নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। (সূরা কালাম ঃ ৪)

صِفَةُ مَنْطِقِهِ وَاَلْفَاظِهِ ﷺ

নবী ﷺ -এর কথাবার্তা বলার নীতি

١٩٦. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَأَلْتُ خَالِىْ هِنْدًا قُلْتُ صِفْ لِىْ مَنْطِقَهُ؟ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَوَاصِلَ الاَحْزَانِ دَائِمُ الْفِكْرِ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ لاَيَتَكَلَّمُ فِىْ غَيْرِ حَاجَةٍ طَوِيْلُ السِّكْتِ، يَفْتَتِحُ الْكَلاَمَ وَيَخْتِمُهُ بِاَشْدَاقِهِ ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ فَصْلاً لاَ فُضُوْلَ فِيْهِ وَلاَ تَقْصِيْرَ دَمَثُ لَيْسَ بِالْجَافِىْ وَلاَ بِالْمَهِيْنِ يُعَظِّمُ النِّعْمَةَ وَاِنْ دُقَّتْ وَلاَ يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا، لاَ تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا وَمَا كَانَ لَهَا، فَاِذَا تَعُوْطِىْ الْحَقَّ لَمْ يَعْرِفْهُ اَحَدٌ، وَلَمْ يَقُمْ بِغَضَبِهِ شَىْءٌ حَتّٰى يَنْتَصِرَ لَهُ وَاِذَا اَشَارَ اَشَارَ بِكَفِّهِ كُلِّهَا وَاِذَا تَعَجَّبَ قَلَبُهَا، وَاِذَا تَحَدَّثَ اِتَّصَلَ بِهَا يَضْرِبُ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنٰى بَاطِنَ اِبْهَامِهِ الْيُسْرٰى -

১৯৬. হযরত হাসান ইব্‌ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার মামা হযরত হিন্দা ইব্‌ন আবূ হালা (রা)-কে নবী ﷺ-এর কথাবার্তা বলার নীতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, নবী ﷺ তাঁর নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য মহান আল্লাহ্‌ পাকের

সন্তুষ্টি মোতাবেক পালন করার চিন্তায় চির আত্মনিমগ্ন এবং উম্মতের সফলতা ও কল্যাণ চিন্তায় সর্বদা বিভোর থাকতেন। সামান্য পরিমাণের অস্থিরতাও তাঁর ছিলো না। কাজেই অধিকাংশ সময় তিনি চুপ থাকতেন, প্রয়োজন ব্যতিরেকে কোন কথা বলতেন না। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কথা বলতেন খুবই স্পষ্টভাবে। তাঁর কথাগুলি ছিলো উপযুক্ত শব্দমালার দ্বারা গঠিত সৌষ্ঠবতাপূর্ণ বাক্য। এক বাক্য অন্য বাক্য থেকে পৃথক থাকতো। কথাগুলির মধ্যে না কোন অতিরিক্ত শব্দ থাকতো, আর না মর্ম প্রকাশে অক্ষম কোন শব্দ পাওয়া যেত। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী। কদর্যতা কিংবা রূঢ়তা তাঁর ভাষায় ছিলো না। আল্লাহ্ পাকের কোন নিয়ামত তা যতই ছোট হোক, তিনি এর খুবই কদর করতেন। কখনো তা হেয় কিংবা তুচ্ছ মনে করতেন না। জাগতিক কোন কাজ তাকে ক্রোধান্বিত করতো না, (কেননা তাঁর দৃষ্টিতে জাগতিক বিষয়াদির তেমন কোন গুরুত্ব ছিল না) আর জাগতিক কাজকর্ম ক্রোধ নিপাতের বস্তুও নয়। তবে সত্য ও ন্যায়ের উপর হস্তক্ষেপ করা হলে তার চেহারা এত পরিবর্তন হয়ে যেতো যে, কেউ তাঁকে তখন চেনা কঠিন হতো। আর সে মুহূর্তে তাঁর ক্রোধের সামনে দাঁড়িয়ে কোন বিষয় টিকতে সক্ষম হতো না; যতক্ষণ না তিনি অন্যায়ের প্রতিকার করতেন। তিনি যখন কারোর দিকে ইশারা করতেন তখন সম্পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করতেন। (কেননা শুধু অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করা ভালো নয়।) তিনি কখনো কোন কাজে বিস্ময় প্রকাশ করলে হাত মুবারক ঘুরিয়ে নিতেন। কথা বলার সময় কখনো কখনো হাতও নাড়াচাড়া করতেন। এভাবে কখনো তিনি ডান হাতের তালু বাম-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের পেটের উপর মারতেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসটি অনেক দিক থেকে ব্যাপক একটি হাদীস। এ হাদীসে নবী ﷺ-এর কথাবার্তা বলা, বলার ভঙ্গি ও ধরন, বাক্যের মিষ্টতা ও আকর্ষণ, মন-মানসিকতার স্বরূপ এবং কথাবার্তা বলার নীতি সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। এ হাদীসে নবী ﷺ -এর কথাবার্তা বলার ধরন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শের এ অংশটুকুর দ্বারা মানবীয় স্বভাব ও উন্নত নৈতিকতা-বোধের এমন একটি অধ্যায়ের সন্ধান মেলে যা সকল মুসলিমের জন্য জীবন-পাথেয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে। হাদীসটির মধ্যে এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাগুলি পাওয়া যায়, যেগুলি থেকে উম্মতের শিক্ষা গ্রহণ বাঞ্ছনীয় সেগুলি হলো নিম্নরূপ ঃ

তিনি বিনা প্রয়োজনে কথাবার্তা বলতেন না। নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন চিন্তায় সারাক্ষণ আত্ম-নিমগ্ন থাকতেন। উম্মতের সফলতা ও কল্যাণ লাভের চিন্তা সর্বদা তাঁকে বিভোর করে রাখতো। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের চিন্তা-ভাবনার কারণে প্রয়োজনের মুহূর্তে যখন কথাবার্তা বলতেন তখন খুবই স্পষ্টভাষায় পরিষ্কারভাবে কথা বলতেন। কথার মধ্যে কোন মারপ্যাঁচ থাকতো না। কথাগুলি হতো সৌষ্ঠবতাপূর্ণ উপযুক্ত শব্দমালার দ্বারা সুগঠিত। বাক্যগুলি ছিলো যাচাইকৃত ও যথাযথ। তাতে অযথা শব্দ কিংবা দুর্বোধ্য শব্দের মিশ্রণ ছিলো না। শ্রোতাদের বুঝতে কষ্ট হয় এমন কোন সংযুক্ত বাক্য কিংবা অর্ধবাক্য তাঁর কথায় পাওয়া যেতো না। তাঁর কথাবার্তাগুলি হতো অতিশয় মিষ্ট, শ্রোতাদের মনে রাখার মতো এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ। গরিমা অহংকারবোধ কিংবা বাজারি অভদ্রতার কোন লেশমাত্রও তাঁর কথায় ছিলো না। কথাবার্তা বলা প্রসঙ্গে নবী ﷺ-এর এই কয়েকটি বুনিয়াদী নীতিকে মানুষ যদি অনুসরণ করে তা হলে ইহকাল ও পরকালের সর্বত্র তাদের জন্য মান-সম্মান, প্রতিপত্তি ও বন্ধুত্ব এবং সার্বিক নিরাপত্তা অবধারিত।

١٩٧. عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ رَدَّدَهَا ثَلاَثًا وَاِذَ اَتٰى قَوْمًا سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاَثًا -

১৯৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন (গুরুত্বপূর্ণ) কোন কথা বলতেন, তখন কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। আর যখন কোন সম্প্রদায়ের কাছে যেতেন তখন তাদেরকে তিনবার সালাম দিতেন (যেন প্রত্যেকে শুনতে পায়)।

ফায়দা ঃ নবী করীম ﷺ তাঁর উম্মতের প্রতি খুবই দয়ালু ও উদার ছিলেন। সে কারণে প্রিয় সাহাবাদেরকে তিনি যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতেন তখন তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে কথাটি পুনঃ পুনঃ বলতেন যেন শ্রোতাদের সকলে কথাটি ভালভাবে শুনে নিতে এবং বুঝতে সক্ষম হয়। যেন অর্ধ কথা শোনে কিংবা মোটেই না শোনার কারণে কারোর মনে এমন ধরনের কোন খুঁতখুঁত ভাব অবশিষ্ট না থাকতে পারে যে, না জানি নবী ﷺ কি কথাটি বলেছেন, কিংবা আমরাও যদি কথাটি শুনতে পেতাম! অনুরূপ তিনি কোথাও গেলে কিংবা কোন সম্প্রদায়ে তাঁর আগমন ঘটলে উপস্থিত লোকদেরকে তিনি তিনবার সালাম উচ্চারণ করতেন। এর কারণ ছিলো যেন সকলেই প্রিয় নবী ﷺ -এর এই সালাম ও দু'আর কথাটি শুনতে পারে এবং আনন্দিত হতে পারে। কারোর মনে যেন এমন কোন দুঃখ অবশিষ্ট না থাকে যে, তিনি তো আমাদের সালাম প্রদানের দ্বারা কৃতার্থ করলেন না। এ বিষয়ে আরো আলোচনা সম্মুখস্থ হাদীসেও আসবে।

١٩٨. اَخْبَرَنَا الزُّهْرِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُسَرِّدُ سَرْدَكُمْ هٰذَا وَلٰكِنْ يَتَكَلَّمُ بِكَلاَمٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مِنْهُ -

১৯৮. যুহরী (র) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তোমাদের দ্রুত কথা বলার মত দ্রুতগতিতে কথা বলতেন না। তিনি কথাবার্তা বলতেন ধীরে ধীরে থেমে থেমে। তাঁর কথাগুলি এতো স্পষ্ট হতো যে, যে কোন ব্যক্তিই তা একবার শোনার দ্বারা মুখস্থ করে ফেলতো।

١٩٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৯৯. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন।

٢٠٠. عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ تَبَسَّمَ فِىْ حَدِيْثِهِ -

২০০. হযরত আবূ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোনো কথা বলতেন তখন (মমত্ববোধের কারণে) কথা বলার মুহূর্তে তার ওষ্ঠাধারে স্মিত হাসির রেখা ফুটে থাকতো।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ অতিশয় হাসিমুখে কথাবার্তা বলতেন। দম্ভপূর্ণ ও রূঢ় কথাবার্তা তাঁর জীবনে আদৌ ছিলো না।

٢٠١ . عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ طَوِيْلَ الصَّمْتِ -

২০১. হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস প্রমাণ করে যে, বাচালতা ও বেশি কথা বলার তুলনায় স্বল্পভাষিতা ও কম কথা বলা অধিকতর ভালো অভ্যাস। নীরবতা ও মৌনতার মধ্যেই বস্তুত ইহকাল ও পরকালের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এ কারণেই প্রিয় নবী ﷺ-এর হাদীস-সমূহে এ বিষয়ের যথেষ্ট আলোচনা বিদ্যমান। যেমন ইরশাদ হচ্ছে, যে ব্যক্তি চুপ থাকে সে মুক্তি পায়। কোন সন্দেহ নেই যে, বাচালতা ও অনর্থক কথা বলা মানুষের জন্য নানা রকম বিপদের কারণ হয়ে ﷺ। নবী -এর হাদীসে এ ধরনের বদ্ অভ্যাসের অনেক নিন্দা করা হয়েছে।

صِفَةُ مَشْيِهِ وَالْتِفَاتِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর পথচলা এবং চলাপথে এদিক সেদিক দৃষ্টিপাত করার নীতি

٢٠٢. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ -

২০২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন পথ চলতেন তখন মনে হতো তিনি যেন (লাঠি কিংবা অন্য কোন জিনিসের উপর) ভর দিয়ে পথ চলছেন। (অর্থাৎ তিনি সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পথ চলতেন।)

٢٠٣ . عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَشَى تَكَفَّأُ -

২০৩. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাঁটার সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পথ চলতেন।

٢٠٤. عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ اَتَى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا هُوَ وَصَاحِبُ يَطْلُبَانِ النَّبِىَّ ﷺ فَلَمْ يَجِدَاهُ فَلَمْ يَنْشَبْ اَنْ جَاءَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ -

২০৪. হযরত আসিম ইব্ন লাকীত ইব্ন সাবুরা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি (হযরত আসিমের পিতা) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হন। এ সময় তিনি ও তাঁর এক সাথী উভয়ে নবী ﷺ-কে খুঁজছিলেন। কিন্তু তারা নবী ﷺ-কে উপস্থিত পাননি। তারা কিছুক্ষণ পরেই নবী ﷺ এমন অবস্থায় আগমন করলেন যেন তিনি (মাটিতে পা টেনে চলার পরিবর্তে) মাটি থেকে পা তুলে তুলে সম্মুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে হাঁটছেন।

٢٠٥. عَنْ اَبِىْ عِنَبَةَ الْخَوْلاَنِيِّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَشٰى اَقْلَعَ -

২০৫. হযরত আবূ ইনাবা খাওলানী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হাঁটতেন তখন মাটি থেকে সবলে পা তুলে তুলে হাঁটতেন।

٢٠٦. عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكْفِيًا كَاَنَّمَا يَتَقَلَّعُ مِنْ صَبَبٍ لَمْ اَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ﷺ الصَّبَبُ الْمُنْحَدِرُ مِنَ الاَرْضِ -

২০৬. হযরত আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিয়ম ছিলো তিনি যখন পথ চলতেন তখন সম্মুখের দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে চলতেন। (আপাত দৃষ্টিতে মনে হতো) তিনি যেন সবলে পা উত্তোলন পূর্বক ঢালু জায়গা দিয়ে অবতরণ করছেন। আমি তাঁর মত (গুণাবলি সম্পন্ন) মানুষ না পূর্বে কখনো দেখেছি আর না পরে। আরবী ভাষায় 'الصبب' শব্দের অর্থ হলো ঢালুভূমি।

٢٠٧. عَنْ رَبِيْعَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَىٰ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَسَاَلْنَا عَنْ صِفَةِ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا يَمْشِىْ فِىْ صَبَبٍ -

২০৭. হযরত রাবীয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-এর দরবারে গেলাম এবং তাঁকে নবী ﷺ-এর অনুপম গুণাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন পথ চলতেন তখন তিনি যেন কোনো ঢালু ভূমি দিয়ে চলছেন। (অর্থাৎ চলার পথে তাঁর হাঁটার গতি ছিল কিছুটা দ্রুত।)

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসসমূহে নবী ﷺ-এর পথ চলার নিয়মনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। এ সকল হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, তাঁর পথ চলার মধ্যে তিন ধরনের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো ঃ

এক. তিনি নম্রতা অবলম্বনের লক্ষ্যে সম্মুখের দিকে ঝুঁকে চলতেন। অহংকারসুলভ বুকটান করে হাঁটতেন না। (তবে যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদগণের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। কেননা তাদের ব্যাপারে নির্দেশ হলো কাফিরদের মুকাবিলায় বিনয় ও নম্রতার প্রকাশ নয় ; বরং নিজেদের শক্তি, বীরত্ব ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার প্রকাশ করা আবশ্যক।)

দুই. নবী ﷺ পথ চলার সময় মাটি থেকে পা তুলে তুলে সবল পুরুষের মত হাঁটতেন। অলস ও খোঁড়ার মত মাটিতে পা টেনে চলতেন না। কেননা এটি অপছন্দনীয় ও দোষের।

তিন. তিনি তুলনামূলকভাবে দ্রুত চলতেন। খুব ধীর গতিতে অলসের মত কিংবা মেয়েলি চলন তাঁর ছিলো না।

দীন ইসলামের হেফাযতকারীগণ যেভাবে নবী ﷺ-এর অন্যান্য গুণ, বৈশিষ্ট্য, নীতি ও চরিত্রের আমলী সংরক্ষণ করেছেন তদ্রূপ তাঁর চাল-চলন ও হাঁটার পদ্ধতিও তাঁরা যথার্থভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ছোট থেকে ছোট কোন গুণ কিংবা কোন অভ্যাসকে উপেক্ষা করেননি। বস্তুত এটি সাহাবায়ে কিরামের এমন এক কৃতিত্ব যার উপমা ইতিহাসের কোনো কালেও দেখা যায় না। এটি নবী ﷺ-এর শেষ নবী হওয়ার এত প্রকৃষ্ট দলীল যা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। অর্থাৎ যে ভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর রিসালাত ও নবুওয়াতের যাবতীয় বিষয় কিয়ামত পর্যন্ত সময়কালের জন্য সংরক্ষিত হয়ে আছে, সেভাবে তাঁর আকার-আকৃতি, চাল-চলন, উঠা-বসা ইত্যাদির পদ্ধতিও যথাযথভাবে সংরক্ষিত। আর এভাবেই অনাগত ভবিষ্যত বংশধরের জন্য নবী ﷺ-এর মহান সত্তা একটি সমুজ্জ্বল আদর্শ হয়ে অটুট থাকবে।

২٠٨. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا خَرَجَ مَشٰى اَصْحَابُهُ اَمَامَهُ وَتَرَكُوْا ظَهْرَهُ لِلْمَلاَئِكَةِ -

২০৮. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন বাড়ির বাহির হতেন তখন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর আগে আগে চলতেন। তাঁরা নবী ﷺ -এর পশ্চাৎদিক ফেরেশ্‌তাগণের চলার জন্য ছেড়ে দিতেন।

ফায়দা ঃ অন্যান্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, নবী ﷺ-এর সঙ্গে ফেরেশ্‌তাগণও হেঁটে থাকেন। এ ফেরেশ্‌তাগণ হাঁটতেন নবী ﷺ -এর পেছনে পেছনে। এ কারণেই সাহাবীগণ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন এবং নিজেরা তাঁর পশ্চাৎ দিকে হাঁটতেন না। বরং পশ্চাৎ দিকটি ফেরেশ্‌তাগণের জন্য ছেড়ে দিয়ে নিজেরা আগে আগে হাঁটতেন। তাছাড়া আরো কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ নম্রতা ও বিনয় অবলম্বনের লক্ষ্যেও নিজে লোকজনের আগে আগে চলাকে পছন্দ করতেন না। বরং নিজে পেছনে থেকে সাহাবীদেরকে আগে আগে চলতে দিতেন।

٢٠٩. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا مَشٰى مَشٰى مَشْيًا مُجْتَمِعًا لَيْسَ فِيْهِ كَسَلٌ -

২০৯. হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হাঁটতেন তখন পা তুলে সবল পুরুষের মত হাঁটতেন। তাঁর হাঁটার মধ্যে কোনরূপ আলস্য ও কুঁড়েমির লেশমাত্রও ছিল না।

٢١٠. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ جَلَسْنَا خَلْفَهُ -

২১০. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হতাম তখন আমরা তাঁর পেছনে বসে যেতাম।

٢١١. عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ سَاَلْتُ هِنْدَ ابْنِ اَبِىْ هَالَةَ عَنْ مَشْيِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ يَمْشِىْ تَكَفِّيًا وَيَخْطُوْ هَوْنًا ذَرِيْعَ الْمَشْيَةِ اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا يَتَصَبَّبُ اَوْ يَمْشِىْ فِىْ صَبَبٍ اِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيْعًا، خَافِضَ الطَّرْفِ نَظْرُهُ اِلَى الْاَرْضِ اَكْثَرُ مِنْ نَظْرِهِ اِلَى السَّمَاءِ جُلُّ نَظَرِهِ الْمُلَاحَظَةُ يَسُوْقُ اَصْحَابَهُ، وَيَبْدَاُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ -

২১১. হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হিন্দ ইব্ন আবূ হালা (রা)-এর কাছে নবী ﷺ-এর পথচলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তখন্ তিনি বললেন, নবী ﷺ সামান্য ঝুঁকে পথ চলতেন। গাম্ভীর্য ও ঔদার্য রক্ষাপূর্বক তিনি পা তুলতেন। তাঁর পথ চলায় ঈষৎ দ্রুততা ছিলো। চলার সময় মনে হতো তিনি যেন ঢালু ভূমি দিয়ে অবতরণ করছেন। কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি যেন কোনো ঢালু ভূমিতে হাঁটছেন। এভাবে তিনি যখন কারোর দিকে দৃষ্টিপাত করতেন তখন সম্পূর্ণভাবে তার দিকে ফিরে তিনি দৃষ্টিপাত করতেন। (পথ চলার সময়) তাঁর চোখের দৃষ্টি যমীনের দিকে অবনমিত থাকতো। এ জন্য আসমানের দিকে তাকানো অপেক্ষা যমীনের দিকে তাঁর দৃষ্টি অধিক থাকতো। অধিকাংশ সময় তিনি চোখের পার্শ্বদেশ দিয়ে তাকাতেন। (লজ্জাশীলতার কারণে) পূর্ণচোখে তাকানো পছন্দ করতেন না। পথচলার সময় সাহাবীদেরকে এভাবে আগে আগে হাঁটতে দিতেন যেন নিজে পেছন থেকে তাদের পরিচালনা করছেন। পথিমধ্যে কারো সঙ্গে দেখা হলে সর্বাগ্রে তিনিই সালাম দিতেন।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসেও নবী ﷺ -এর পথচলার নীতি আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের তুলনায় আলোচ্য হাদীসে কতিপয় অতিরিক্ত গুণের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন ঃ

১. নবী ﷺ অধিকাংশ সময় চোখের দৃষ্টি অবনমিত করে রাখতেন। এদিক সেদিক তাকাতেন না। সাধারণত মাটির দিকেই পতিত থাকতো তাঁর দৃষ্টি। কখনো কখনো আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাতেন কিন্তু তা ছিলো ওহী লাভের অপেক্ষায়।

২. তিনি যখন কারোর দিকে তাকাতেন তখন অতিশয় লজ্জাশীলতার কারণে কখনো পূর্ণচোখে তাকাতেন না। বরং একপার্শ্ব দিয়ে তাকাতেন।

৩. তিনি যেহেতু কিছুটা দ্রুত চলতেন তাই সাহাবীদেরকে নিজের সামনে হাঁটতে দিতেন। ফলে তারাও যেন সমান্তরালে দ্রুত চলেন এবং তাদের কেউ যেন পিছিয়ে না পড়েন। সাথে সাথে এ ভাবে পেছনে চলার মধ্যে নিজের নম্রতা ও বিনয়ের প্রকাশও উদ্দেশ্য ছিল। দাম্ভিক ও অহংকারীদের ন্যায় সকলের আগে আগে চলাকে তিনি পছন্দ করতেন না। অপর হাদীসে বলা হয়েছে যে, সাহাবীগণ নবী ﷺ-এর আগে আগে চলার মধ্যে আরো একটি গূঢ় রহস্য ছিল এই যে, তার পশ্চাৎ দিকটি ফেরেশ্‌তাদের হাঁটার জন্য রক্ষিত হতো। হাদীসটিতে বলা হয়েছে, নবী ﷺ-এর পশ্চাদদিকে ফেরেশ্‌তাগণ হাঁটেন। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। একটি কাজের পেছনে একাধিক রহস্য বিদ্যমান থাকা বিচিত্র নয়। বিশেষত নবী ﷺ-এর কাজকর্মসমূহ অগণিত হিকমত ও রহস্যপূর্ণ ছিল। আর তিনি শ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে এমনটাই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪. নবী ﷺ-এর নিয়ম ছিলো তিনি যখনই কারোর সাক্ষাতে যেতেন তখন সালাম দানে নিজেই অগ্রবর্তী থাকতেন। মহান আল্লাহ্ এ মহান নবী ﷺ ও তাঁর বংশধরের প্রতি অগণিত ও অসংখ্য দরূদ ও সালাম নাযিল করুন। আমীন!

٢١٢ . عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُسْرٍ صَاحِبُ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَتَى الْمَنْزِلَ لَمْ يَأْتِهِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ وَلٰكِنْ يَاْتِيْهِ مِنْ قِبَلِ جَانِبِهٖ حَتّٰى يَسْتَأْذِنَ -

২১২. নবী ﷺ-এর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুস্‌র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কারো বাড়ি যেতেন তখন দরজার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াতেন না বরং এক পার্শ্বে দাঁড়াতেন। (যেন অজান্তে গৃহবাসীদের উপর দৃষ্টি পতিত না হয়) আর অনুমতি পাওয়া ব্যতিরেকে গৃহে প্রবেশ করতেন না।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীস হলো অনুমতি চাওয়া বিষয়ক। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নীতি ছিলো তিনি যখন কারোর বাড়ি যেতেন তখন সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সেই বাড়ির দরজা বরাবর হয়ে প্রবেশ করতেন না, বরং এক পার্শ্ব বরাবরে প্রবেশ করতেন। উদ্দেশ্য ছিলো যেন অজান্তে গৃহবাসীদের উপর তার দৃষ্টি গিয়ে না পড়ে। তারপর গৃহকর্তার পক্ষ থেকে অনুমতি লাভের পর তিনি গৃহে প্রবেশ করতেন। আলোচ্য হাদীসে আরো বলা হয়েছে যে, তিনি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে প্রবেশ করতেন। তিনি এ সালামকেও একাধিকবার পুনরাবৃত্তি করে বলতেন, যেন ঘরের লোকজন তা ভালভাবে শুনতে পায়।

কারোর গৃহে প্রবেশ করার পূর্বে অনুমতি নেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যক। অনুমতি ব্যতীত কারো গৃহে প্রবেশ জায়েয নয়। অবশ্য নিজের ঘরে যখন অপর কোন গায়র মুহাররাম

মহিলা নেই বলে নিশ্চিতভাবে জানা থাকে তখন অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করতে কোন আপত্তি নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও উত্তম হলো নিজের ঘরেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করা।

দ্বিতীয়ত ঃ ঘরে প্রবেশ করার সময় 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা চাই। এটি ঘরে উপস্থিতদের জন্য সালামতী ও নিরাপত্তার একটি দু'আ। অপরের গৃহে প্রবেশের জন্য তিনবার পর্যন্ত অনুমতি প্রার্থনা করা যেতে পারে। তৃতীয়বারেও যদি কোন উত্তর না পাওয়া যায় কিংবা অনুমতি না মিলে তখন ফিরে আসা চাই।

٢١٣. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبْوَا بُ النَّبِىِّ ﷺ تُقْرَعُ بِالاَظْفَارِ -

২১৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর গৃহের দরজাগুলিতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা টোকা দেওয়া হতো।

ফায়দা ঃ এ হাদীস দ্বারা ঘরের দরজায় টোকা দেয়ার নীতি সম্পর্কে জানা যায়। ঘরের দরজায় টোকা দেওয়ার সময় ভারসাম্য বজায় রাখা আবশ্যক। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দেওয়া কিংবা আঘাত করা ভদ্রতা ও আদবের খেলাফ। তাতে গৃহবাসী লোকজনের মনকষ্ট হয়ে থাকে। টোকা দেওয়ার উত্তম পদ্ধতি হলো আগন্তুক প্রথমে মুখে আওয়াজ করবে। আওয়াজ ঘরের ভিতর পর্যন্ত না পৌঁছার আশংকা থাকলে সেখানে আস্তে আস্তে টোকা দিবে।

٢١٤ . عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِيْعَ اَبَا ذَرٍّ يَصِفُ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ كَانَ يَطَأُ بِقَدَمَيْهِ لَيْسَ لَهُ اَخْمَص يَقْبُلُ جَمِيْعًا وَيَدْبُرُ جَمِيْعًا ، لَمْ اَرَمِثْلَهُ -

২১৪. হযরত সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রা) বলেন, তিনি হযরত আবূ যার গিফারী (রা)-কে নবী ﷺ-এর নিয়ম-নীতি ও গুণাবলি বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, নবী ﷺ তাঁর পা যুগল উপরে তুলে এভাবে হাঁটতেন যেন তাঁর পায়ের কোন তালুই ছিলো না। তিনি (সামনে অগ্রসর হতে চাইলে) পূর্ণভাবে অগ্রসর হতেন। আবার (পেছনের দিকে যেতে ইচ্ছা করলে) পূর্ণভাবে পেছনে সরে যেতেন। আমি কখনো তাঁর মত কোন মানুষকে দেখিনি।

ফায়দা ঃ পা তুলে হাঁটার অর্থ হলো তিনি মাটির উপর পা স্থাপন করতেন। কিন্তু স্থাপনের পর কোনরূপ বিলম্ব না করেই তৎক্ষণাৎ এমনভাবে পা তুলে নিতেন যে, মনে হতো পায়ের তালুদ্বয়কে মাটিতে পূর্ণভাবে স্পর্শ করতেই দেননি। আসলে তাঁর পায়ের তালু (মাটি থেকে) সামান্য উপরে উঠা অবস্থায় থাকতো। এটিও এক ধরনের পৌরুষ সুলভ সৌন্দর্য।

٢١٥. عَنْ اَبِىْ الطُّفَيْلِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا مَشٰى كَاَنَّمَا يَمْشِىْ فِىْ صَبُوْبٍ -

২১৫. হযরত আবূ তুফায়েল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন হাঁটতেন তখন মনে হতো তিনি কোন ঢালু ভূমিতে হাঁটছেন।

ফায়দা ঃ আলোচ্য হাদীসের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কথাবার্তা অনুচ্ছেদের শুরুভাগে আলোচিত হয়েছে। নবী ﷺ-এর পবিত্র সত্তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ছিলো দিব্যি মুজিযাপূর্ণ। এ জন্য

তাঁর পথ চলার নীতির মধ্যেও অতিপ্রকৃত বিষয়ের ন্যায় কতিপয় অলৌকিক পদ্ধতি বিদ্যমান ছিলো। যেমন ঃ

এক. তিনি কিছুটা দ্রুতবেগে হাঁটতেন। অথচ তিনি দ্রুতবেগে হাঁটার মোটেই ইচ্ছা করতেন না। এদিকে সাহাবীদের অবস্থা ছিলো নবী ﷺ-এর সঙ্গে দ্রুতগতিতে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা হাঁপিয়ে পড়তেন। আর এ কারণেই তিনি নিজে সাহাবীদের পেছনে হাঁটতেন। যেন তাঁরা নবী ﷺ -এর সঙ্গ থেকে পেছনে দূরে রয়ে না যান।

দুই. তিনি সম্মুখের দিকে ঝুঁকে দৃঢ় পদে একজন পুরুষের ন্যায় হাঁটতেন। মাটির উপর পায়ের তালুর স্পর্শ লাগতে দিতেন না। এমন কি হযরত আবূ যার গিফারী (রা) তাঁর বর্ণনায় বলেন, لَيْسَ لَهُ أَخْمَصَ প্রিয় নবী ﷺ -এর পায়ের তালু ছিলোই না। বর্ণিত রহস্যটি সম্মুখে না রাখা হলে নবী ﷺ-এর হাঁটা সম্পর্কীয় উভয় উক্তির মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করা জটিল হবে। এ কারণেই হযরত আবূ যার (রা) আরো বলেন, لَمْ أَرَى مِثْلَهُ আমি তাঁর ন্যায় কোন মানুষকে দেখিনি।

তিন. তিনি সমতল ভূমিতে এভাবে হাঁটতেন যেন কোনো ঢালু যমীন দিয়ে নিচের দিকে অবতরণ করছেন। উপরোক্ত রহস্য জানা না থাকলে পথ চলার এই অলৌকিক পদ্ধতিটিও হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। এ কারণে হযরত আলী (রা) স্পষ্টভাবে বলতে বাধ্য হন যে, لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ আমি নবী ﷺ -এর ন্যায় পূর্বে আর না তাঁর পরে তাঁর গুণাবলির কোন মানুষকে দেখেছি।

কাজেই আমরাও সম্মানিত পাঠক বৃন্দের কাছে আবেদন করবো যে, নবী ﷺ-এর পবিত্র আকার-আকৃতি সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ বিশেষত তাঁর পথচলা সম্পর্কীয় হাদীসগুলি অধ্যয়ন করার সময় একথাটি অবশ্যই সামনে রাখতে হবে যে, যেভাবে তাঁর মহান সত্তা মাথা থেকে পা পর্যন্ত সবটুকু ছিলো অলৌকিক। ঠিক তেমনি তার পথ চলার বিষয়টিও ছিলো একটি অলৌকিক ব্যাপার। হযরত আলী ও হযরত আবূ যার (রা) প্রমুখ উচ্চমানের সাহাবী যাঁরা নবী ﷺ -কে খুবই নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরাও নিজেদের বক্তব্যে সেই রহস্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

ذِكْرُ قَوْلِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَجْلِسِهِ ﷺ

কোন মজলিস ত্যাগ করার সময় নবী ﷺ -এর পঠিত দু'আ

٢١٦ . عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اجْتَمَعَ اِلَيْهِ اَصْحَابُهُ فَاَرَادَ اَنْ يَّنْهَضَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ –

২১৬. হযরত রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিয়ম ছিল যে, তাঁর সাহাবীগণ কখনো তাঁর কাছে জমায়েত হওয়ার পর যখন তাঁরা মজলিস ত্যাগ করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ হে আল্লাহ্! তুমি মহান ও পবিত্র। আমরা তোমারই হাম্দ ও প্রশংসা করি।আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতিরেকে অপর কোনো ইলাহ্ নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।

٢١٧. عَنْ رَافِعٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنْهَضَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ هٰؤُلَاءِ كَلِمَاتُ اَحْدَثْتَهُنَّ قَالَ اَجَلْ جَاءَنِىْ بِهِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

২১৭. হযরত রাফি' ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন কোন মজলিস ত্যাগ করতে ইচ্ছা করতেন তখন এ দু'আ পড়তেন ঃ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ আল্লাহ্! তুমি মহান ও পবিত্র। আমরা তোমারই হাম্দ ও প্রশংসা করি। আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ শব্দগুলো পাঠ করার জন্য আপনি নিজ থেকে মনোনীত করে নিয়েছেন ? নবী ﷺ উত্তর দিলেন, না। এ শব্দগুলো হযরত জিব্রীল (আ) আমার কাছে নিয়ে আসেন।

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যাবতীয় শিক্ষার সারনির্যাস হলো তিনি নিজের কাজ-কর্ম, রীতি-নীতি ও কর্মপদ্ধতির দ্বারা সর্বদা মানুষকে মহান আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য সচেষ্ট থাকতেন। উম্মতকে তিনি এমন শিক্ষা ও পথনির্দেশ দিয়ে যান যাতে প্রকৃত ইলাহ্ মহান আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়ে ওঠে। এবং জীবনের কোন অবস্থাতেই যেন তারা প্রকৃত মাওলা থেকে উদাসীন না থাকে। যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগীর এই হলো সারনির্যাস। এরই মধ্যে নিহিত আছে মানব জীবনের সর্বাঙ্গীণ সফলতা ও কল্যাণ। উপরোক্ত হাদীসদ্বয়েও নবী ﷺ এমন কিছু দু'আ ও কালেমা শিক্ষা দেন যেখানে আল্লাহ্ পাকের হামদ ও প্রশংসা, তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা, তাঁর একত্ববাদের স্বীকৃতি এবং তাঁর কাছে সর্বদা তাওবা ও ইস্তিগফার করা ইত্যাদির প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে কোন সন্দেহ নেই, মানুষ যখন কোনো মজলিসে কিংবা কোন মাহফিলে বসে তখন সেখানে দুনিয়া-আখিরাত সব ধরনের কথাবার্তা চলে। কখনো কখনো অর্থহীন আলাপ-আলোচনাও শুরু হয়। কাজেই এ স্থানেও নবী ﷺ উম্মতকে আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোযোগী করার লক্ষ্যে বর্ণিত দু'আটি পাঠ করেন। তা ছাড়া সেই মজলিসে জানা কিংবা অজানাভাবে যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায় বর্ণিত দু'আর বরকতে তা থেকেও ক্ষমা পাওয়া যায়। এ দু'আর বিষয়ে অপর একখানা হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ দু'আটি হলো মজলিসের কাফ্ফারা স্বরূপ। (আবূ দাউদ, পৃষ্ঠা ৬৬৭)

ذِكْرُ مُحَبَّتِهِ لِلطِّيْبِ وَتَطَيَّبَهُ بِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর সুগন্ধি পছন্দ করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করার বর্ণনা

٢١٨. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَقْبَلَ بِطِيْبِ رِيْحِهِ -

২১৮. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন আমাদের দিকে আসতেন তখন পূর্বেই তাঁর সুগন্ধির কারণে আমরা টের পেতাম যে তিনি আসছেন।

ফায়দা ঃ আলোচ্য অনুচ্ছেদ দ্বারা গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হলো নবী ﷺ-এর সুগন্ধির প্রতি অনুরাগ ও সুগন্ধি ব্যবহার করার বিষয়টি বর্ণনা করা। সে মতে এ অনুচ্ছেদে তিনি এতদসংক্রান্ত হাদীসগুলিকেই সন্নিবেশিত করেছেন। কতিপয় হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, তিনি কোন সুগন্ধি ব্যবহার করা ব্যতিরেকেও একান্ত অলৌকিকভাবে তাঁর মুবারক দেহের ঘামের মধ্যে এতটুকু সুগন্ধি বিদ্যমান ছিলো যা সাধারণ ব্যবহারের আতর জাতীয় জিনিস অপেক্ষাও উন্নতমানের ছিলো। নবী ﷺ-এর শরীর থেকে সেই সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়তো। তিনি যে পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন সেই পথও সুগন্ধিতে ভরে যেতো। সাহাবীগণ সহজেই উপলব্ধি করতেন যে, নবী ﷺ এ পথ দিয়ে হেঁটে গিয়েছেন। কতিপয় সাহাবী তো তাঁর মুবারক ঘর্মবিন্দুগুলিকে আতর হিসাবেও ব্যবহার করতেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে হযরত উম্মে সুলাইম (রা) বলেন, নবী ﷺ তার গৃহে এসে (দুপুরের আহারোত্তর) বিশ্রাম নিতেন। তখন তিনি নবী ﷺ-এর বিশ্রাম গ্রহণের জন্য একটি চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন। তাঁর শরীরে প্রচুর ঘাম হতো। উম্মে সুলাইম (রা) সে ঘামগুলি একত্র করে নিজেদের খুশবু ও সুগন্ধির সঙ্গে মিশিয়ে নিতেন। একদা নবী ﷺ তাকে বললেন, উম্মে সুলাইম! এটি কি জিনিস ? উম্মে সুলাইম (রা) বললেন, এটি আপনার শরীরের মুবারক ঘাম। আমরা এগুলিকে নিজেদের আতর জাতীয় দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়ে থাকি। কেননা, এ ঘামগুলি সকল সুগন্ধি অপেক্ষাও উন্নতমানের।

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, আমি কখনো কোন মৃগনাভি কিংবা কোন আতর এমন পাইনি যার সুগন্ধি নবী ﷺ-এর ঘাম মুবারক অপেক্ষা উত্তম। (শামাইলে তিরমিযী)

একটি হাদীসে হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, যখনই কোন পথ দিয়ে নবী ﷺ হেঁটে যেতেন এবং তারপর অন্য কেউ সে পথ দিয়ে হেঁটে যেতেন তখন সে নবী ﷺ-এর সুগন্ধির দ্বারা কিংবা বর্ণনাকারী বলেছেন, নবী ﷺ-এর ঘাম মুবারকের সুগন্ধি দ্বারা বুঝতে পারতো যে, এ পথে তাঁর পদচারণা হয়েছিল।

সারকথা হলো, সুগন্ধি ব্যবহার করা নবী ﷺ-এর আদর্শ ও মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুগন্ধি খুবই পছন্দ করতেন। পরবর্তী হাদীসগুলিতে এ বিষয়ে আরো আলোচনা আসবে।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) একটি হাদীসে বলেন, আমি নবী ﷺ-এর গায়ে সবচেয়ে উন্নত যে সুগন্ধি থাকত সেটি মাখিয়ে থাকতাম। (মিশ্কাত)

٢١٩. عَنْ اَنَسٍ قَالَ مَارَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيْبٌ فَرَدَّهُ -

২১৯. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এমনটা কখনো দেখিনি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সুগন্ধি পেশ করা হয়েছে আর তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ফায়দা ঃ নবী ﷺ-এর নীতি ছিলো যে, তাকে যদি সুগন্ধি জাতীয় কোন জিনিস হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হতো তখন তা ফিরিয়ে দিতেন না। জামি 'তিরমিযী গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ তিনটি জিনিস এমন যা ফিরিয়ে দেয়া যায় না। এক. বালিশ, দুই. সুগন্ধি ও তিন. দুধ। অপর একটি হাদীসে হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, নবী ﷺ কখনোই সুগন্ধি জাতীয় জিনিস ফিরিয়ে দিতেন না। একটি হাদীসে হযরত আবূ উসমান নাহদী (রা) বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন যে, কেউ যদি তোমাদেরকে রেহানা ফুল উপহার দেয় তাহলে সেটি ফিরিয়ে দিও না। কেননা এটি বেহেশ্ত থেকে আগত একটি ফুল।

٢٢٠. عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَنَسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ بِهَا -

২২০. হযরত মূসা ইব্ন আনাস তাঁর পিতা হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট একটি উত্তম আতর ছিলো। তিনি তা ব্যবহার করতেন।

٢٢١. عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَهُ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا -

২২১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী ﷺ-এর কাছে একটি উত্তম আতর ছিলো। তিনি তা মাখতেন।

٢٢٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ مِثْلَهُ -

২২২. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুখ্তার (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

ফায়দা ঃ 'সুক্কাহ' শব্দটির দু'টি ব্যাখ্যা আছে। এক. সুক্কাহ্ অর্থ আতরদানী, আতর রাখার পাত্র। সাধারণত শব্দটি এ অর্থে অধিক প্রচলিত। তবে 'কামূস' অভিধানে মিশ্রণ দ্বারা তৈরি এক ধরনের বিশেষ আতরকে সুক্কাহ বলা হয়। কামূস অভিধানে দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে আরো বোঝা যায় যে, সুগন্ধি নবী ﷺ -এর কাছে খুবই পছন্দের জিনিস ছিলো। বিশেষ সুক্কাহ্ নামক সুগন্ধি বেশি ব্যবহার করতেন। এ সুক্কাহ্ নানা জাতীয় সুগন্ধির মিশ্রণ দ্বারা তৈরি করা হতো।

٢٢٣. عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ حُبِّبَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ -

২২৩. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ ইরশাদ করেন যে, জগতে আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি অধিক প্রিয় করা হয়েছে।

ফায়দা : নবী ﷺ এমন এক যুগে এমন এক সমাজে প্রেরিত হয়েছিলেন যে সমাজে নারীর অস্তিত্বকে একটি অভিশাপ, চরম লাঞ্ছনা ও অপমানজনক বলে জ্ঞান করা হতো। প্রাচীন আরবীয়রা আত্মসম্মানের হানি বোধ করে নারীদেরকে জীবন্ত কবর দিতো। তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সম্মান দান তো সে সমাজের কল্পনাতেও ছিলো না। জাহেলী সমাজে এভাবে তাদেরকে মানুষ সমাজ-বহির্ভূত মূল্যহীন পণ্য হিসাবে গণ্য করা হতো। কিন্তু জগতে ইসলাম আগমনের পর ইসলাম সর্বপ্রথম এ অমানবিক নীতির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে রুখে দাঁড়ায়। ইসলাম নারীদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারায় নারীদের প্রতি যে ঘৃণাবোধ বিদ্যমান ছিলো তা দূরীভূত করে তাদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা ও দয়ার বীজ বপন করে। সমাজে তাদের ন্যায্য (ভারসাম্যপূর্ণ) অধিকারকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করে। তাদেরকে পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে রায় দেয়। অধিকন্তু একজন মুসলিম যে মানে নিজের জীবন যাপন করে সে মানে তার স্ত্রী ও কন্যাদেরকে জীবন যাপন করতে দেওয়াকে ফরয তথা অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের অতিরিক্ত মর্যাদা আছে (সেটি হলো পুরুষ নারীদের তত্ত্বাবধায়ক) আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা : ২২৮)

এ কারণে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতিতে নারীদের প্রতি বিশেষ ধরনের একটি আকর্ষণ ও ভালবাসা দিয়ে দিয়েছেন। মানুষ হিসাবে সকলের প্রকৃতির মধ্যেই কমবেশি এ আকর্ষণ বিদ্যমান। নবী ﷺ যেহেতু মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানব এবং মানবতার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন ছিলেন, সেহেতু তাঁর মধ্যে মানবীয় প্রকৃতিও ছিলো পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। তাই তাঁর পবিত্র সত্তায় প্রকৃতিগত এ সব বিষয়ের চাহিদাও ছিলো পূর্ণমানের। উপরোক্ত উক্তিটি নবী ﷺ -এর সেই প্রকৃতিগত ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। কুরআন পাকের মধ্যে কথাটির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে : وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً এবং তাঁর

নিদর্শনাবলির মধ্যে আরো রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন নারীদেরকে, যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও। এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়ার সৃষ্টি করেছেন। (সূরা রূম ঃ ২১)

٢٢٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكْرَهُ اَنْ يَخْرُجَ اِلَى اَصْحَابِهِ تَفْلُ الرِّيْحِ وَكَانَ اِذَا كَانَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَسَّ طِيْبًا -

২২৪. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নীতি ছিল তিনি সাধারণ গন্ধ নিয়ে সাহাবীদের সাক্ষাতে যাওয়া অপছন্দ করতেন। এজন্য তিনি রাতের শেষ ভাগে সুগন্ধি লাগাতেন।

٢٢٥. عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرُدُّ الطِّيْبَ وَيُحَدِّثُ اَنَّهُ ﷺ كَانَ لاَيَرُدُّهُ -

২২৫. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না। আর তিনি (এ ব্যাপারে) নবী ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করে বলতেন, নবী ﷺ নিজেও কখনো সুগন্ধির হাদিয়া ফিরিয়ে দিতেন না।

٢٢٦. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خِصَالٌ لَمْ يَكُنْ فِىْ طَرِيْقٍ فَيَسْلُكُهُ اَحَدٌ اِلاَّ عُرِفَ اَنَّهُ سَلَكَهُ مِنْ طِيْبِ عَرْفِهِ اَوْ رِيْحِ عَرَقِهِ -

২২৬. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর পবিত্র সত্তায় বহু উত্তম গুণ বিদ্যমান ছিলো। একটি হলো তিনি যে পথ দিয়েই যেতেন তারপর সে পথ দিয়ে অন্য কেউ গমন করলে সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর দেহ থেকে ছড়ানো সুগন্ধির দ্বারা টের করতে পারতো যে, এ পথে তাঁর পদচারণা হয়েছিল।

٢٢٧. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَطْلُبُ الطِّيْبَ فِىْ جَمِيْعِ رِبَاعِ نِسَائِهِ -

২২৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিয়ম ছিলো তিনি সকল বিবির ঘরে গিয়ে সুগন্ধি খোঁজ করতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে, নবী ﷺ-এর কাছে সুগন্ধি জাতীয় জিনিস খুবই পছন্দনীয় ছিলো। তিনি আপন বিবিদের প্রত্যেকের গৃহে সুগন্ধির ব্যবস্থা রাখতেন। তারপর সে গৃহে তাঁর যাওয়া হলে সেই সুগন্ধি ব্যবহারপূর্বক নিজের ও বিবির জন্য মনস্তুষ্টির আয়োজন করে নিতেন।

٢٢٨. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ أُحِبُّ الطِّيْبِ اِلَىٰ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْعُوْدُ -

২২৮. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় সুগন্ধি ছিল উদ্ বা আগর জাতীয় সুগন্ধি।

ফায়দা ঃ 'উদ্' এক ধরনের সুগন্ধি বিশেষ। ধুপ জ্বালানোর মত এটি ব্যবহার করা হয়। এ সুগন্ধিটি নবী ﷺ-এর কাছে সবেচেয়ে পছন্দনীয় সুগন্ধি ছিলো।

٢٢٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَطَيَّبُ مَا يَجِدُهُ حِيْنَ يُرِيْدُ اَنْ يُحْرِمَ -

২২৯. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইহ্‌রাম বাঁধার সময় নিজের কাছে থাকা সবচেয়ে উন্নতমানের সুগন্ধিটি গায়ে মাখতেন।

٢٣٠. عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْرَفُ بِرِيْحِ الطِّيْبِ -

২৩০. হযরত ইব্‌রাহীম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-কে তাঁর সুগন্ধি থেকেই চেনা যেত।

صِفَةُ لِبَاسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা

আলোচ্য অনুচ্ছেদে যেসব হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে নবী ﷺ -এর জামা, তাঁর জোব্বা, লুঙ্গি, চাদর, পাগড়ি, টুপি, পায়জামা, গরম কাপড়, আংটি, আংটিতে পাথর বসানোর স্থান, আংটির উপর অংকিত নক্‌শা, মোজা, জুতা, ধনুক, তীর, তলোয়ার, বর্ম, শিরস্ত্রাণ, ঝাণ্ডা, পতাকা, বর্শা, ছুরি, চেয়ার, তাঁবু, ঘোড়া, বাহনরূপে খচ্চর, বাহনের গদি, উট, রণক্ষেত্রে উচ্চারিত তাঁর বিভিন্ন শব্দ, বিছানা, ব্যবহৃত লেপ, হেলান দেয়ার জিনিস, বালিশ, খাটিয়া, চাটাই, তাঁর শয়নকালে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত, শয়নপূর্বে দু'আ পাঠ, সুরমা ব্যবহার, রাত্রিকালের আমল, বিছানায় শোয়া অবস্থার আমল, জাগ্রত হওয়ার মুহূর্তে তাঁর আমল, বিছানা ত্যাগ পরবর্তী আমল ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে এসবের সবিস্তার আলোচিত হচ্ছে।

ذِكْرُ قَمِيْصِهِ وَحَمْدِ رَبِّهِ عِنْدَ لُبْسِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর জামা এবং জামা পরিধানের সময় মহান আল্লাহ্র প্রতি হাম্‌দ ও প্রশংসা

٢٣١. عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ كَانَ اَحَبُّ الثِّيَابِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْقَمِيْصَ

২৩১. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল জামা।

٢٣٢. عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ مِثْلَهُ -

২৩২. হযরত ইব্‌ন বুরায়দা তাঁর পিতার সূত্রে হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

ফায়দা ঃ নবী করীম ﷺ পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করেছেন। যেমন জুব্বা, কাবা, জামা, লুঙ্গি, পরিধানের চাদর জোড়া ইত্যাদি। কিন্তু এসবের মধ্যে জামা ছিল তাঁর কাছে অধিকতর পছন্দনীয় বস্ত্র। কোন সন্দেহ নেই যে চাদর, জুব্বা, কাবা ইত্যাদির তুলনায় একমাত্র জামাই হলো এমন একটি পোশাক যা দামে সস্তা হওয়ার পাশাপাশি মানুষের সতর পরিপূর্ণভাবে ঢেকে রাখে। এ পোশাক ব্যবহারে শরীরের উপর অস্বাভাবিক বোঝা অনুভূত হয় না। এটি সামলিয়ে রাখতেও তেমন কোন বেগ পেতে হয় না। অথচ সামাজিক ভদ্রতা ও সৌন্দর্য রক্ষার কাজ পরিপূর্ণভাবে অর্জিত হয়ে থাকে। তাই বলা চলে যে, এক জামার মধ্যে অনেকগুলি উপকারিতা বিদ্যমান। পক্ষান্তরে জুব্বা ওজনে বেশ ভারী। তাছাড়া যতক্ষণ তা পরণে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীরের উপর একটি বোঝা আছে বলে অনুভূত হয়। এ কারণে মানুষ জুব্বা বিশেষ বিশেষ সময়ে পরিধান করে থাকে। কাবা কিংবা চাদরের অবস্থাও অনুরূপ। লুঙ্গি কিংবা পরিধেয় চাদরের দ্বারা সতর ঢেকে রাখার বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আপন সতর রক্ষিত রাখার জন্য তখন ব্যক্তিকে পৃথকভাবে খেয়াল রাখতে হয়। আর সামাজিক ভদ্রতা ও সৌন্দর্য রক্ষার তো এখানে প্রশ্নই আসে না। আর এ কারণে মানুষ সাধারণত এ পোশাকটি বাড়ির ভিতর ব্যবহার করে। কিন্তু আরবীয়দের সেই জামা আমাদের দেশে ব্যবহৃত জামার মত কেবল হাঁটু পর্যন্ত ছিলো না বরং পায়ের গোছা পর্যন্ত লম্বিত থাকতো। জামার ক্ষেত্রে এ সকল উপকারিতার কারণে নবী ﷺ জামাকে অধিকতর পছন্দ করতেন।

আলিমগণ পোশাকের বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ কিছু পোশাক ওয়াজিব, কিছু মুস্তাহাব, কিছু হারাম, কিছু মাকরূহ আর কিছু হলো মুবাহ। যেমন ঃ

এক. নিজের সতর ঢেকে রাখার প্রয়োজনে যতটুকু বস্ত্র পরিধান করতে হয় ততটুকু পরিধান করা ওয়াজিব অর্থাৎ ফরয।

দুই. যে পোশাক পরিধানের জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে সেটি পরিধান করা মুস্তাহাব ও সাওয়াবের কাজ। যেমন ঈদের জন্য কিংবা কোন প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতের জন্য উন্নতমানের এবং বিশেষ ধরনের পোশাক পরিধান। অনুরূপভাবে জুম'আর সালাতের জন্য সাদা কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব।

তিন. যেসব বস্ত্র পরিধান করতে শরীয়তে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি পরা হারাম। যেমন, পুরুষের জন্য রেশমের কাপড় (বিনা ওযরে) পরিধান করা, কিংবা মহিলাদের জন্য এমন পাতলা কাপড় ব্যবহার করা যার দ্বারা শরীরের ঔজ্জ্বল্য বাহির থেকে দেখা যায়। কিংবা এমন আটসাঁট পোশাক ব্যবহার করা যার দ্বারা শরীরের লুক্কায়িত ও সংরক্ষিত অঙ্গগুলি বাহির থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায়। এসব পোশাক ব্যবহার করা হারাম ও শরীয়তে নিষিদ্ধ।

চার. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও ভাল মানের বস্ত্র থাকা সত্ত্বেও কোন অপরিষ্কার ময়লা কিংবা পুরাতন ছেঁড়া পোশাক পরিধান করা মাকরূহ। অনুরূপভাবে যে পোশাক ব্যক্তির সামাজিক মান-মর্যাদার বিপরীত হয় যেমন কোন সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য ছেঁড়া পুরাতন বস্ত্র পরিধান করা কিংবা অহংকার গর্ব প্রকাশ ইত্যাদির জন্য অতিশয় দামী পোশাক পরিধান মাকরূহ।

পাঁচ. উল্লেখিত পন্থাগুলি ব্যতিরেকে অবশিষ্ট যেকোন পোশাক যদি অহংকার কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য না থাকে তা হলে সেটি পরিধান করা মুবাহ।

٢٣٣. عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا اَىُّ اللِّبَاسِ كَانَ اَحَبُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ اَعْجَبَ اِلَيْهِ ؟ قَالَ اَلْحِبْرَةُ -

২৩৩. হযরত কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ পোশাকটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে অধিকতর প্রিয় ছিলো? কিংবা তিনি বলেছেন, কোন্ পোশাকটি নবী ﷺ-এর কাছে অধিকতর পছন্দনীয় ছিল ? তিনি উত্তর দিলেন, হিব্‌রা। (অর্থাৎ ডোরাদার ইয়ামেনি চাদর।)

٢٣٤. عَنْ زَيْدِبْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ نَحْوَهُ -

২৩৪. হযরত যায়দ ইব্ন হুবাব (রা) হযরত হাম্মাম (রা)-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ফায়দা ঃ ইয়ামন অঞ্চলে তৈরি ডোর বিশিষ্ট চাদরকে 'হিব্‌রা' বলা হতো। এ চাদরগুলি সাধারণত তৈরি করা হতো পশম দ্বারা। সেখানে আরবে এটি ছিলো সবচেয়ে গাম্ভীর্যপূর্ণ

পোশাক। আর এ কারণেই বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের জন্য নবী ﷺ এই পোশাকের ব্যবহার বেশি পছন্দ করতেন।

٢٣٥. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصٌ قُطْنِيٌّ قَصِيْرُ الطُّوْلِ قَصِيْرُ الْكُمَّيْنِ –

২৩৫. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সুতি কাপড়ের একটি জামা ছিলো। এ জামাটি দৈর্ঘেও ছিলো খাট আর আস্তিনগুলিও ছিলো ছোট ছোট।

ফায়দা ঃ বর্ণিত জামাটি নবী ﷺ সম্ভবত এমন সময়ে পরিধান করতেন যে সময় মানুষ হালকা পোশাক পরিধান করে থাকে, যেমন গরমের মৌসুমে। কিংবা এটি ছিলো তার ভিতর বাড়িতে পরিধানের জামা।

٢٣٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ قَمِيْصًا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ مُسْتَوِى الْكُمَّيْنِ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهٖ –

২৩৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ টাখ্‌নুর উপর (পায়ের গিরার) উপর পর্যন্ত লম্বিত জামা পরিধান করতেন। সে জামার আস্তিনগুলি তাঁর আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত ছিলো।

٢٣٧. عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ قَمِيْصُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى رُسْغِهٖ –

২৩৭. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর জামার (আস্তিন) হাতের কব্‌জি পর্যন্ত লম্বা ছিলো।

٢٣٨. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ كَانَ قَمِيْصُ النَّبِيِّ ﷺ اَسْفَلَ مِنَ الرُّسْغِ –

২৩৮. হযরত আসমা বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর জামার আস্তিন তাঁর হাতের কব্‌জির নিচ পর্যন্ত লম্বা ছিলো।

ফায়দা ঃ উপরোক্ত হাদীসগুলিতে নবী ﷺ-এর জামা ও আস্তিনের দৈর্ঘ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবী ﷺ-এর জামা টাখ্‌নু থেকে উপরে থাকতো। আর আস্তিন হাতের কব্‌জি পর্যন্ত কিংবা কব্‌জি থেকে সামান্য নিচ পর্যন্ত লম্বিত থাকতো। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রকমের বর্ণনা বিদ্যমান। আলিমগণ বলেছেন, আস্তিনের দৈর্ঘ হাতের কব্‌জি পর্যন্ত

হওয়া উত্তম। আর কব্জি থেকে কিছু নিচ পর্যন্ত হওয়া জায়েয। ইমাম জাযরী (র) বলেন, জামার আস্তিনের ক্ষেত্রে সুন্নত হলো হাতের কব্জির সমান হওয়া। পক্ষান্তরে জামা ব্যতীত চোগা ইত্যাদির আস্তিন কবজির নিচ পর্যন্তও হতে পারে। তবে আঙ্গুল যেন ছাড়িয়ে না যায়। (হযরত শায়খ মুহাম্মদ যাকারিয়্যা তাঁর 'খাসাইলে নববী' গ্রন্থে এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।) কিন্তু জামা বা এ জাতীয় পোশাকের আস্তিন কনুইয়ের উপর পর্যন্ত হওয়া ভালো নয়। এটি আদবের খেলাফ। কনুই খোলা রাখার কারণে সালাতও মাকরূহ হয়ে থাকে।

٢٣٩ . عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ الاَنْمَارِىُّ قَالَ كَانَتْ كِمَامُ النَّبِىِّ ﷺ اِلَى بَطْحٍ -

২৩৯. হযরত আবূ কাবশা আনমারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর টুপি (মাথার তালুর সঙ্গে) চেপে লেগে থাকতো। অর্থাৎ তাঁর টুপি মুবারক খাড়া থাকতো না। কেননা তিনি অধিকাংশ সময় পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় থাকতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীসে নবী ﷺ-এর টুপির কথা বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ এমন টুপি পরিধান করতেন যা মাথার সঙ্গে লেগে থাকতো। কারণ হলো, তিনি অধিকাংশ সময় মাথায় পাগড়ি বেঁধে রাখতেন। তবে এ পাগড়ি ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকতো। বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তীতে করা হবে।

٢٤٠ . عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ مَا اَتَّخِذَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصٌ لَهُ زِرٌّ -

২৪০. হযরত আবদুল মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) থেকে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনও বোতাম বিশিষ্ট জামা পরিধান করেন নি।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নবী ﷺ-এর জামা মুবারকে কোন বোতাম বা ঘুন্টি ইত্যাদি থাকতো না। কতিপয় হাদীসে বলা হয়েছে তিনি কাঁটা বা খড়ি জাতীয় জিনিস লাগিয়ে নিতেন। আবার কোন কোন হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর জামার গলা সাধারণত খোলাই থাকতো।

٢٤١ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَمِيْصٌ قُطْنِىٌ قَصِيْرُ الطُّوْلِ قَصِيْرُ الْكُمَّيْنِ -

২৪১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর একটি সুতি জামা ছিল। এ জামাটি দৈর্ঘেও ছিলো খাটো আবার আস্তিনগুলিও ছিলো ছোট।

٢٤٢. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاِسْمِهِ اِزَارًا كَانَ اَوْ قَمِيْصًا اَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِىْ هٰذَا اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهٖ وَخَيْرِمَا صُنِعَ لَهٗ، وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَ شَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ -

২৪২. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন (আল্লাহ্ পাকের শুকরিয়া প্রকাশের উদ্দেশ্যে) কাপড়টির একটি নাম রাখতেন। সেটি লুঙ্গি হোক কিংবা জামা কিংবা পাগড়ি। তারপর এ দু'আ পাঠ করতেন। اللهم لك الحمد كما .... واعوذبك من شره شرما صنع له —হে আল্লাহ্! সকল হামদ্ ও প্রশংসা একমাত্র তোমারই জন্য। তুমি যেভাবে আমাকে এ কাপড় পরিধান করতে দিয়েছো, সেভাবে আমি তোমার শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। (হে আল্লাহ্!) আমি তোমার কাছে ঐ কাপড়ের কল্যাণ এবং এ কাপড় যে কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে সে কাজের কল্যাণ লাভের প্রার্থনা করছি। এবং আমি তোমার কাছে এ কাপড়ের অনিষ্টতা এবং কাপড়টি যে কাজের জন্য তৈরি সে কাজের অনিষ্টতা থেকে পানাহ চাই—অর্থাৎ এ কাপড় আমার জন্য যেন আত্মম্ভরিতা ও লোক দেখানোর কারণ না হয় এবং এ কাপড় পরিধান করে আমার থেকে যেনো কোন পাপ কাজ কিংবা অন্যায় আচরণ ঘটতে না পারে।

ফায়দা ঃ যাবতীয় নিয়ামত তা প্রকাশ্য হোক আর অপ্রকাশ্য একমাত্র মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত। কোন একটি নিয়ামতের উপর এই মহান স্রষ্টা ও মহান অধিপতির যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হোক তা তুচ্ছ ও নগণ্য। প্রত্যেক মানুষের জন্য কর্তব্য যে, তার মহান প্রভুর দেয়া এ নিয়ামতরাজির শুকরিয়া সকল অবস্থায় আদায় করে যাওয়া। শোকর আদায় করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথম হলো, নিজের কাজকর্ম ও আমলের দ্বারা শুকরিয়া আদায় করা। অর্থাৎ এ নিয়ামতকে সঠিক স্থানে সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। নিয়ামত দানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তথা আল্লাহ্ পাকের ইবাদত ও বন্দেগীর প্রতি যত্নবান হবে। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, মুখের দ্বারা এ জগত পালনকর্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি নিয়ামতকে যদি তাঁর নির্দেশ মোতাবেক ব্যবহার করা হয় তাহলে মানুষের জন্য সেই নিয়ামত কল্যাণ তথা ইবাদতে পরিণত হয়। বরং বলা চলে যে, তখন এটি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে, অধিকতর কল্যাণের পথ খুলে দেয়। পক্ষান্তরে সেই নিয়ামত যদি তাঁর নির্দেশের বিপরীতে ব্যয় বা ব্যবহার করা হয় তখন সেটি মানুষের জন্য অনিষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের নাফরমানী ও অবাধ্যতার পথ সুগম করে। কাজেই আল্লাহ্ পাকের কোন নিয়ামত লাভ হওয়ার মুহূর্তেই তাঁর কাছে নিয়ামতের কল্যাণের দু'আ করা এবং অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়া উচিত। নবী ﷺ-এর নতুন পোশাকের ব্যাপারটিও ছিল এরূপ। এ কারণেই তিনি উপরোক্ত দু'আ পাঠ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

٢٤٣. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ قَمِيْصًا كَانَ اَوْ اِزَارًا اَوْ عِمَامَةً، ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَاصُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّمَا صُنِعَ لَهُ ـ قَالَ اَبُوْ نَضْرَةَ وَكَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاىْ اَحَدَ عَلَى صَاحِبِهِ ثَوْبًاقَالَ تُبْلٰى وَيُخْلِفُ اللّٰهُ ـ

২৪৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন কোন নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন (কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে) সে পোশাকের নাম উল্লেখ করতেন। সেটি জামা হোক কিংবা লুঙ্গি কিংবা পাগড়ি। তারপর দু'আ পাঠ করতেন ঃ اللهم لك الحمد .... واعوذبك من شره وشرماصنع له –হে আল্লাহ্! সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া তোমারই জন্য। তুমি আমাকে এ পোশাক পরিধান করতে দিয়েছো। তোমার নিকট এ পোশাকের কল্যাণ এবং এ পোশাক যে কাজের জন্য তৈরি তার কল্যাণ লাভের প্রার্থনা করি। এবং আমি এ পোশাকের অনিষ্টতা ও যে কাজের জন্য পোশাকটি তৈরি করা হয়েছে সে কাজের অনিষ্টতা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।

হযরত আবূ নাদ্‌রা (র) বলেন, সাহাবাদের নিয়ম ছিলো তাঁরা নিজের সাথীদের কাউকে নতুন পোশাক পরিধান করতে দেখলে দু'আ করে বলতেন تبلى ويخلف الله –তুমি এ পোশাকটি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় পুরাতন হওয়া পর্যন্ত পরিধান কর। তারপর আল্লাহ্ তোমাকে এর পরিবর্তে নতুন পোশাক দান করবেন।

٢٤٤. عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُشَيْرٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ فِىْ رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَبَايَعْنَاهُ وَاِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْاَزْرَارِ فَاَدْخَلْتُ يَدِىْ فِىْ جَيْبِهِ فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ فَمَا رَاَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا ابْنَهُ فِىْ شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ اِلَّا مُطْلَقِىْ اِزْرَارِهِمَا لَايَزُرَّانِ اَبَدًا ـ

২৪৪. উরওয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কুশাইর (র) মুআবিয়া ইব্‌ন কুররা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা কুররা ইব্‌ন ইয়াস (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন; আমি মুযায়না গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হই। এবং আমরা তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করি। এ সময় নবী ﷺ-এর জামার বোতাম খোলা অবস্থায় ছিলো। আমি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নবী ﷺ-এর পেছনের উন্মুক্ত অংশে হাত রাখলাম। এবং তখন তাঁর মোহরে নবুওয়াত স্পর্শ করলাম। হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত উরওয়া বলেন, সে অনুযায়ী আমি কখনো হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন কুররা কিংবা তাঁর পুত্রকে শীতের মৌসুমে হোক আর গরমের মৌসুমে হোক জামার বোতাম লাগানো অবস্থায় দেখিনি। তাঁরা সর্বদা জামার বোতাম খোলা রাখতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে নবী ﷺ-এর প্রতি সাহাবায়ে কিরামের সীমাহীন ভক্তি ও ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁদের এহেন অতিশয় ভালবাসা ও মুহব্বতের কারণে আজ পর্যন্ত নবী ﷺ-এর প্রতিটি আচরণ ও প্রতিটি আমল অবিকৃত অবস্থায় সংরক্ষিত হয়ে আসছে। তাঁদের অবস্থা ছিলো এমন যে, যিনি নবী ﷺ-কে জামার বোতাম খোলা অবস্থায় দেখেছেন তাঁর গোটা জীবনে কখনো জামায় বোতাম সংযুক্ত করেন নি। উভয় জগতের প্রেমাস্পদ নবী ﷺ-এর এক একটি আচরণ এ প্রক্রিয়ায়ই সংরক্ষিত হয়ে আসছে। সাহাবীগণ তাঁর প্রতিষ্ঠিত আমলের উপর নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছেন। এ কারণে তাঁর শুধু শিক্ষাগুলিই নয় বরং তাঁর গোটা জীবনের সকল কিছু যথার্থভাবে সংরক্ষিত। বস্তুত এটি তাঁর সত্যিকার নবী ﷺ হওয়ার একটি দলিল এবং তাঁর নবুওয়াতের একটি উজ্জ্বল মু'জিযা।

٢٤٥. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَنْ اَبِيْهِ قُرَّةَ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَهُ وَاِنَّ قَمِيْصَهُ لَمُطْلَقَ فَاَنْخَلْتُ يَدِىْ مِنْ حَبِيْبِ قَمِيْصِهِ فَمَسِسْتُ الْخَاتِمِ-

২৪৫. হযরত মুআবিয়া ইব্‌ন কুর্‌রা তার পিতা কুর্‌রা ইব্‌ন ইয়াস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি মুযায়না গোত্রের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে নবী ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হই। এ সময় নবী ﷺ-এর জামার বোতাম খোলা ছিল। কাজেই আমি আমার হাত তাঁর জামার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করি এবং মোহরে নবুওয়াত স্পর্শ করি।

٢٤٦ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَانِ خَشْنَانِ غَلِيْظَانِ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اِنَّ ثَوبَيْكَ هٰذَيْنِ خَشْنَانِ غَلِيْظَانِ تَرْشَحْ فِيْهَا فَيَثْقُلاَنِ عَلَيْكَ-

২৪৬. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর গায়ে খদ্দরের দু'টি মোটা জাতীয় বস্ত্র ছিল। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ দু'টি বস্ত্র তো খুবই অসম ও মোটা জাতীয়। এগুলির দ্বারা আপনি ঘর্মাক্ত হয়ে যান। এগুলি আপনার শরীরের উপর আরো ভারী হয়ে দাঁড়ায়। (আপনি এগুলির পরিবর্তে কোন পাতলা বস্ত্র ব্যবহার করলে কত ভাল হতো।)

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, নবী ﷺ-এর পোশাক-পরিচ্ছদে কোনই আড়ম্বর ছিল না। যখন যা মিলত তা-ই তিনি পরিধান করতেন। এতটুকুই নয়, বরং সাধারণভাবে তিনি সাদাসিধে ও মোটা কাপড়ের পোশাককেই অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁর মধ্যে রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ লৌকিকতা মোটেই ছিলো না। দুনিয়াদার বড়লোকেরা যেমন রাজকীয় জাঁকজমকপূর্ণ লৌকিকতা ও ভণিতা ইত্যাদি কামনা করে থাকে, নবী ﷺ-এর

মন-মানসিকতায় তার লেশমাত্রও ছিলো না। ইচ্ছা করলে উন্নত থেকে উন্নততর পোশাক জুটিয়ে নেয়া তাঁর জন্য মোটেই কষ্টকর ছিলো না। পরপর বিজয় লাভ এবং বিজয় পরবর্তী অগণিত ধন-সম্পদ তাঁর কদম মুবারক চুম্বন করছিলো। কখনো কখনো গনীমতের মালের বিশাল স্তূপ হয়ে যেতো। কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তিনি হক্দারদের মাঝে তা বণ্টন করে দিতেন। কোন কারণবশত যদি কিছু সম্পদ অবশিষ্ট থেকে যেত কিংবা তা গ্রহণ করার মতো কেউ উপস্থিত না থাকতো তা হলে সে রাতে তাঁর চোখে ঘুম থাকতো না।

আল্লাহ্ পাক সকল মুসলমানকে তাঁর আদর্শের পরিপূর্ণ অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন!

٢٤٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَانِ يَنْسَجَانِ فِىْ بَنِىْ النَّجَّارِ وَكَانَ يَخْتَلِفُ اِلَيْهَا يَقُوْلُ عَجِلُوْا بِهِمَا عَلَيْنَا نَتَجَمَّلُ بِهِمَافِىْ النَّاسِ -

২৪৭. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এমন দুটি বস্ত্র ছিলো যেগুলি বনু নাজ্জার গোত্রে তৈরি করা হতো। নবী ﷺ তাদের কাপড় তৈরির কাজ দেখার জন্য তাদের সেখানে আসা-যাওয়া করতেন। তিনি তাদেরকে (উৎসাহ দিয়ে) বলতেন, কাপড়গুলি জলদি তৈরি করো। আমরা এগুলি পরিধান করে মানুষের মাঝে আল্লাহ্ পাকের দেয়া সৌন্দর্য প্রকাশ করি।

ফায়দা ঃ আলোচ্য হাদীসে সেই সৌন্দর্য ও শালীনতা প্রকাশ করার আলোচনা করা হয়েছে, সেটি হলো সেই সৌন্দর্য ও শালীনতা যা সালাত আদায়কালে অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ يَابَنِىْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ হে আদম সন্তান! তোমরা সালাত আদায়কালে পোশাকের সৌন্দর্য ও শালীনতা অবলম্বন কর। এ কারণেই ফিকহ্‌বিদগণ লিখেছেন, মসজিদে সালাতের জন্য সুন্দর ও শালীন পোশাক পরিধান করে যাওয়া চাই। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কর্মনীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা সাধারণভাবে মসজিদে যাওয়ার সময় ভিতর বাড়িতে ব্যবহৃত সেই সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত পোশাকই নিয়ে প্রবেশ করি। অথচ এ পোশাকে পার্থিব কোন নেতা বা কর্তার নিকট গমন করা মোটেই পছন্দ করি না। আমাদের এ নীতি যেমন মহান আল্লাহ্ পাকের নির্দেশের বিপরীত তেমনি এটি মাহবুবে ইলাহী নবী ﷺ -এর সুন্নতেরও বিরোধী।

ذِكْرُ وَقْتِ لِبَاسِهِ إِذَا اسْتَجَدَّهُ ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নতুন পোশাক পরিধান করার বর্ণনা

٢٤٨. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ الاَسْوَدِ الْاِصْفَهَانِىْ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا لَبِسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ـ

২৪৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ আল ইস্‌ফাহানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ প্রথম কোনো নতুন পোশাক পরিধান করলে জুমু'আর দিনে শুরু করতেন।

ফায়দা : ইসলামে জুমু'আর দিনকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে। জুমু'আর দিনটি মুসলমানদের জন্য ছোট আকারের ঈদের দিন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা জুমু'আর সালাত ঈদের সালাতের মত সম্মিলিতভাবে আদায় করা ফরয করেছেন, যাতে সমস্ত মুসলিম কোনো একটি বড় স্থানে সমবেত হয়ে জুমু'আর সালাত আদায় করে এবং পরস্পর দেখা-সাক্ষাত করতে ও একে অপরের খোঁজ-খবর নিতে পারে। বিভিন্ন হাদীসেও জুমু'আর সালাতের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। জুমু'আর দিন গোসল করা নতুন কিংবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করা এবং চুল কাটানো সুন্নত। জুমু'আর দিনের ইবাদত বন্দেগীর জন্যও বিরাট পুরস্কার ও সাওয়াব রয়েছে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জুমু'আর দিনে আল্লাহ্ তা'আলা এমন একটি সময় রেখেছেন যে, সে সময় বান্দা যে দু'আ করুক না কেন তা অবশ্যই কবুল করা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বর্তমানে জুমু'আর গুরুত্ব একেবারেই হারিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত দুই ঈদ ছাড়া মুসলিমদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর কোন পর্ব বা দিন থাকলে তা হচ্ছে জুমু'আর দিন। সম্ভব হলে সেদিন নতুন পোশাক কিংবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পবিত্র কাপড় পরিধান করা উচিত। এদিনেই অনুষ্ঠানাদি ও বিয়ে-শাদী এবং বেশি বেশি ইবাদত করা উচিত। বিশেষত নবী ﷺ-এর ওপর অনেক বেশি করে দরূদ ও সালাম পেশ করা কর্তব্য। কেননা, হাদীসে এ কাজের অনেক বেশি ফযিলত উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথের হিদায়াত দান করুন।

٢٤٩. عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ قَمِيْصًا اَوْ رِدَاءً اَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِمَا صُنِعَ لَهُ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ـ

২৪৯. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখনই কোনো নতুন পোশাক পরিধান করতেন তখন শোকর প্রকাশের উদ্দেশ্যে জামা, চাদর বা আমামা হিসেবে তার নামকরণ করতেন এবং পরে এই দু'আটি পড়তেন। (দু'আটির অনুবাদ ২৪৩ নং হাদীসে উল্লেখিত আছে।)

ذِكْرُ جُبَّتِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর জুববা মুবারক-এর বর্ণনা

٢٥٠. عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَتْ لَهُ جُبَّةٌ طَيَالِسَةٌ مَكْفُوْفَةٌ بِالدِّيْبَاجِ يَلْقَى فِيْهَا الْعَدُوَّ ـ

২৫০. হযরত আসমা বিন্ত আবূ বাক্‌র (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ-এর একটি তায়ালেসানী জুব্বা। (আয়তাকার ঢিলেঢালা জামা) ছিলো যার হাতায় রেশমী ফিতা লাগানো ছিলো। এটি পরিধান করে তিনি শত্রুদের সাথে লড়াই করতে যেতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করে যুদ্ধের ময়দানে গমন সুন্নত।

٢٥١. عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ ذَايَزَنَ اَهْدٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلَّةً اُشْتُرِيَتْ بِثَلاَثَةٍ وَّثَلاَثِيْنَ بَعِيْرًا فَلَبِسَهَا مَرَّةً ـ

২৫১. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন যে, (হিমইয়ারের মুসলমান বাদশাহ্) যু-ইয়াযান নবী ﷺ-কে এমন একটি পোশাক হাদিয়া দিলেন যা তেত্রিশটি উটের বিনিময়ে খরিদ করা হয়েছিল। নবী ﷺ এ কাপড় জোড়া একবার মাত্র পরিধান করেছিলেন।

ফায়দা ঃ যেহেতু এই পোশাক সেট ছিলো একজন বাদশাহ্‌র প্রেরিত এবং মূল্যবান উপহার, তাই নবী ﷺ তা একবার মাত্র পরিধান করে পরিত্যাগ করেছিলেন। পুনরায় আর কখনো তা পরিধান করেননি। কারণ তিনি অতি মূল্যবান জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ পছন্দ করতেন না। তিনি বলেছেন ঃ অতি মূল্যবান ও জমকালো পোশাক কেবল তারাই পরিধান করে আখিরাতে যাদের কোন অংশ নেই।

٢٥٢. عَنْ دَحِيَّةَ الْكَلْبِيِّ اَنَّهُ اَهْدٰى اِلَى النَّبِيِّ ﷺ جُبَّةً مِنَ الشَّامِ وَخُفَّيْنِ فَلَبِسَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ حَتّٰى تَخَرَّقَا فَلَمْ يَتَبَيَّنْ اَوْ لَمْ يُعْلَمْ اَذَكِيَانِ هُمَا اَوْ مَيْتَةٌ حَتّٰى تَخَرَّقَا ـ

২৫২. হযরত দিহ্ইয়া কালবী (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী ﷺ-কে শামদেশে (সিরিয়া) তৈরি একটি জুব্বা এবং দু'টি চামড়ার মোজা উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ঐ মোজা দু'টি এত অধিক ব্যবহার করেছিলেন যে তা জীর্ণ হয়ে ফেটে গিয়েছিলো। কিংবা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) তা মৃত জন্তুর চামড়া দ্বারা প্রস্তুত ছিলো না যবেহ্‌কৃত জন্তুর চামড়া দ্বারা প্রস্তুত ছিল তা জানা যায়নি। কিন্তু ব্যাপক ব্যবহারে তা ফেটে গিয়েছিলো।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ উপহার গ্রহণ করতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না কাফিরদের তৈরি দ্রব্যাদির নাপাক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত ও অকাট্যরূপে কোন কিছু জানা যায় ততক্ষণ তা নাপাক নয়। তাই নবী ﷺ তাঁকে উপহার হিসেবে প্রদত্ত মোজা মৃত জন্তুর চামড়ায় প্রস্তুত ছিলো না যবেহ্কৃত জন্তুর চামড়ায় প্রস্তুত ছিলো সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন বোধ করেননি। কারণ, পাকা করার পর মৃত জন্তুর চামড়াও পবিত্র হয়ে যায়। সুতরাং উপহার দেয়া মোজা ব্যবহার করতে করতে ছিঁড়ে গিয়েছিল। হানাফীদের মতেও যে কোন চামড়া তা মৃত কিংবা যবেহ্কৃত জন্তুর থেকে হোক পাকানোর পর পবিত্র হয়ে যায় এবং তা ব্যবহার করা বৈধ।

٢٥٣. عَنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَاَتْبَعْتُهُ بِاِدَاوَةٍ مِّنْ مَاءٍ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قُمْتُ لاُوَضِّئَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ رُوْمِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمِّ فَاَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِهَا وَطَرَحَهَا عَاتِقِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَالْخِمَارِ ثُمَّ صَلَّى -

২৫৩. হযরত মুগীরা ইব্ন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য বাইরে গেলে আমি একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে গেলাম। তিনি প্রয়োজন সেরে আসলে আমি তাঁকে ওযূ করানোর জন্য এগিয়ে গেলাম। সে সময় তাঁর পরিধানে ছিলো একটি রূমী জুব্বা যার হাতা ছিলো অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই তিনি জুব্বা থেকে হাত বের করলেন এবং জুব্বাটা কাঁধের ওপর রেখে ওযূ করলেন এবং মোজা ও মাথায় বাঁধা কাপড়ের ওপর মাসেহ্ করে সালাত পড়লেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ অন্যান্য দেশের তৈরি পোশাকও ব্যবহার করতেন। তিনি রোমের তৈরি জুব্বা পরিধান করেছিলেন। যেহেতু তার আস্তিন ছিলো অত্যন্ত সংকীর্ণ। তাই তিনি আস্তিন ওপরে টেনে তোলেননি বরং আস্তিনের মধ্য থেকে হাত বের করে জুব্বাটিকে কাঁধের ওপর রেখে ওযূ করেছেন। এখানে শুধু জুব্বা সম্পর্কে বর্ণনাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। তাই তিনি এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আনুষঙ্গিকভাবে এ হাদীসে মোজা এবং মাথার কাপড়ের ওপর মাসেহ্ করা সম্পর্কে যে উল্লেখ রয়েছে, ফিকহ্ গ্রন্থসমূহে তার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এখানে সে সব মাসয়ালা বর্ণনা করার অবকাশ নেই। অধিকাংশ উলামার মতে শুধু পাগড়ি কিংবা রুমালের উপর মাসেহ্ করা এবং মাথা আদৌ মাসেহ্ না করা জায়েয নয়। এতে ওযূ পরিশুদ্ধ হবে না।

٢٥٤. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ -

২৫৪. হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন নবী ﷺ -কে ওযূ করতে দেখলাম। সেই সময় তিনি রোমের তৈরি সংকীর্ণ হাতাওয়ালা জুব্বা পরিধান করেছিলেন।

٢٥٥. عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ سَفَرٍ فَذَهَبَ يَحْسُرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ مِنْ جُبَّةٍ رُوْمِيَّةٍ فَلَمْ يَخْرُجْ ذِرَاعَيْهِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ـ

২৫৫. হযরত মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। তিনি রোমের তৈরি তাঁর পরিধানের জুব্বাটির হাতা ওপরে গুটাতে শুরু করলেন। কিন্তু হাতা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে হাত বের করতে সক্ষম হলেন না। তখন নিজের হাত জুব্বার ভেতর থেকে বের করে ফেললেন।

٢٥٦. عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مُشَمِّرًا ـ

২৫৬. হযরত আবূ হুজায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী ﷺ বাইরে বের হলে তাঁর গায়ে লাল ডোরা বিশিষ্ট পোশাক ছিলো এবং তা তাঁর পায়ের নলা পর্যন্ত উঠানো ছিলো।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী ﷺ পায়ের নলা পর্যন্ত দীর্ঘ লাল পোশাক পরিধান করেছেন। পুরুষদের নিরেট লাল রঙের কাপড় পরিধান সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। জুব্বাটি ছিলো লাল ডোরা বিশিষ্ট যা সবার মতেই জায়েয। নবী ﷺ পায়ের গোছার মধ্যভাগ পর্যন্ত উঁচু পোশাক পরতেন। এটাই সুন্নত। পায়ের গিরা পর্যন্ত লম্বা পোশাক পরিধান করাও জায়েয। এর চেয়ে অধিক লম্বা পোশাক পরিধান করা মাকরূহ, কারণ তা কাফির ও অহংকারী লোকদের প্রতীক।

٢٥٧. عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ لَيْلَةِ اِضْحِيَانٍ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَيْهِ وَاِلَى الْقَمَرِ فَلَهُوَ اَحْسَنُ فِىْ عَيْنِىْ مِنَ الْقَمَرِ ـ

২৫৭. হযরত জাবির ইব্ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক চাঁদনি রাতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে লাল ডোরা বিশিষ্ট পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। (তাঁর গায়ে ঐ পোশাকটি এতই সুন্দর মনে হচ্ছিলো যে) আমি একবার নবী ﷺ -এর দিকে দেখছিলাম এবং আরেকবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমার দৃষ্টিতে পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে নবী ﷺ -কেই অধিক সুন্দর মনে হলো।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটিতেও নবী ﷺ-এর লাল রঙের পোশাক পরিধান করার উল্লেখ আছে। তাই গ্রন্থকার এখানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এ হাদীসটিতে নবী ﷺ

-এর পোশাকের বর্ণনার চেয়ে তাঁর দেহ মুবারকের সৌন্দর্যের বর্ণনা অনেক বেশি প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অনুপম রূপ ও অতুলনীয় সৌন্দর্য পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও অধিক ছিলো তা হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীর অতিশয়োক্তি নয়। বরং বাস্তবেও তিনি তাই ছিলেন। প্রকৃত সত্য হলো, নবী ﷺ -এর অতুলনীয় রূপ ও সৌন্দর্যের সঠিক অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা মানবীয় ক্ষমতার বাইরে। তাছাড়া যে কোন মুসলিমের আকীদা-বিশ্বাস হলো, গোটা সৃষ্টিজগতের মধ্যে নবী ﷺ -এর রূপ ও সৌন্দর্য অদ্বিতীয়, অতুলনীয়। তাই এতে সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ্ নবী ﷺ -কে বাতেনী ও রূহানী নূর ও তাজাল্লীর সাথে সাথে অতুলনীয় অনুপম রূপ ও সৌন্দর্য পূর্ণাঙ্গরূপে দিয়েছিলেন। হাফিয শীরাযী (র) সত্যই বলেছেন ঃ

حسن یوسف ید بیضاء دم عیسی داری + انچه خوبان همه دارند توتنها داری -

ইউসুফ (আ)-এর সৌন্দর্য, ঈসা (আ)-এর প্রাণসঞ্চারী বিশ্বাস ও মূসা (আ)-এর বিস্ময়কর শুভ্র হাত সবগুলো গুণ আপনার একার মধ্যেই রয়েছে।

ذِكْرُ اِزَارِهٖ وَكِسَائِهٖ ﷺ

নবী ﷺ -এর লুঙ্গি ও চাদরের বর্ণনা

٢٥٨. عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ قَالَ اَخْرَجَتْ اِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا وَاِزَارًا غَلِيْظًا فَقَالَتْ قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ هٰذَيْنِ -

২৫৮. হযরত আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা) একখানা তালি লাগানো চাদর ও একখানা মোটা লুঙ্গি বের করে আমাদের দেখিয়ে বললেন, এই দু'খানা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ওফাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।

ফায়দা ঃ এই হাদীসটিতে নবী ﷺ -এর ব্যবহৃত লুঙ্গি ও চাদরের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত সরল-সহজ জীবন যাপন করতেন। নবী ﷺ-এর যুগেই বিভিন্ন এলাকা বিজিত হতে শুরু হয়েছিলো। এই সময় তাঁর দরবারে ধনসম্পদের স্তূপ জমা হতো। কিন্তু তিনি তা অন্যদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করে দিতেন এবং নিজে সাধারণ কিছু পরিধান করতেন। তবে কোন সময়ে বিশেষ কোন উপলক্ষে মূল্যবান পোশাকও পরতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, যা সাধারণত উপহার হিসেবে তাঁর কাছে আসতো। কিন্তু তিনি এসব পোশাক একবার মাত্র পরিধান করে কিংবা বিশেষ কোন উপলক্ষে পরিধান করে রেখে দিতেন। ইতোপূর্বে একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়ামানের বাদশাহ যু-ইয়াযান তাঁকে এরূপ মূল্যবান এক সেট পোশাক পাঠালে তিনি একবার

মাত্র তা পরিধান করেছিলেন পরে আর কখনো তা পরিধান করেননি। যাতে তাঁর পবিত্র জীবন গর্ব ও অহংকারের লেশমাত্র থেকে পবিত্র থাকে। তাঁর এই উত্তম আদর্শ অনুযায়ী উম্মতেরও আমল করা উচিত। তবে যে ক্ষেত্রে গর্ব ও অহংকারের আশংকা থাকবে না সেক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর উদ্দেশ্যে মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধানে কোন ক্ষতি নেই।

শরীরের নিচের অংশ ঢাকার জন্য যেসব পোশাক পরিধান করা হয় সে সব পোশাককে আরবীতে 'ইযার' বলা হয়। লুঙ্গি এবং পায়জামা দু'টিই এর অন্তর্ভুক্ত। 'রিদা (رِدَاء) বা 'কিসা' (كِسَاء) সে সব পোশাককে বলে যা শরীরের ওপরের অংশ ঢাকার জন্য ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্রতিটি সুতি বা পশমী বস্ত্রকে 'রিদা' এবং পশমী চাদর বা হাল্কা কম্বলকে 'কিসা' বলা হয়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাধারণত লুঙ্গি পরিধান করতেন। এটাই ছিলো আরবের সাধারণ পোশাক। তিনি কখনো পায়জামা পরেছেন কিনা সে বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। তবে তিনি যে পায়জামা খরিদ করেছিলেন তা নিশ্চিত। বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত, তিনি পায়জামার প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, এর দ্বারা সতর ঢাকার কাজটি অধিক সুন্দরভাবে হয়। পরবর্তীকালে দুনিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে ইসলাম যতই ছড়িয়ে পড়েছে সাহাবা কেরাম বিজিত এলাকাসমূহে তত বেশি বসতি স্থাপন করেছেন এবং সাথে সাথে সেখানে পায়জামার প্রচলনও বৃদ্ধি পেয়েছে।

٢٥٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ غَدَاةٍ اِلَى الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ اَسْوَدَ ـ

২৫৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন সকাল বেলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হলেন। সেই সময় তাঁর গায়ে ছিলো কালো পশমের তৈরি নক্শাদার কম্বল।

ফায়দা ঃ এ হাদীসে নবী ﷺ-এর কম্বলের বর্ণনা আছে। তিনি কালো পশমের তৈরি নক্শাদার কম্বল ব্যবহার করেছেন।

٢٦٠. عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ اِلَى مَكَّةَ فَاَجَارَهُ اَبَانُ بْنُ سَعِيْدٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَمِّ اَلَا اَرَاكَ مُتَخَشِّعًا اَسْبِلْ كَمَا يُسْبِلُ قَوْمُكَ قَالَ هٰكَذَا يَأْتَزِرُ صَاحِبُنَا اِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ ـ

২৬০. হযরত সালামা ইব্‌ন আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে) নবী ﷺ উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-কে মক্কায় পাঠালে আবান ইব্‌ন সাঈদ তাঁকে নিজের আশ্রয়ে থাকতে দিলেন এবং বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই! তুমি এরূপ বিনম্রতা অবলম্বন করেছো কেন। তুমি তোমার পরিধেয় বস্ত্র তোমার কাওমের লোকজনের মত নিচে লটকিয়ে পরিধান করো। উসমান (রা) বললেন, আমাদের সরদার রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত উঁচু করে লুঙ্গি পরে থাকেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ ও সমস্ত সাহাবায়ে কিরাম অহংকার থেকে দূরে থাকার জন্য লুঙ্গি ও পায়জামা পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত উঁচু করে পরতেন। এটাই ইসলামের পদ্ধতি। পক্ষান্তরে কাফির ও মুশরিকরা অহংকার ও গর্বিত ভঙ্গিতে মাটি ছোঁয়া করে লুঙ্গি পরিধান করতো। এটাই ছিলো কুফরীর প্রতীক। অহংকারী লোকেরাই আজকাল ভূমি পর্যন্ত লটকিয়ে লুঙ্গি, পায়জামা, সেলোয়ার এমনকি প্যান্ট পরাকেও মর্যাদার ব্যাপার বলে মনে করে। অপরদিকে নেক্‌কার পরহেয্‌গার ও দীনদার মুসলমানরা পায়জামা পায়ের গিরার ওপরে পরিধান করে থাকেন। সালাতের অবস্থায় পায়ের গিরার নিচে লুঙ্গি অথবা পায়জামা পরিধান মাকরূহ তাহ্‌রীমী।

٢٦١. عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّتِي تُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهَا اَنَّهُ رَاى اِزَارَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْفَلَ اِلَى نِصْفِ السَّاقِ -

২৬১. হযরত আশআস ইব্‌ন সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার ফুফুকে তাঁর চাচার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তাঁর চাচা দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরনের লুঙ্গি তাঁর পায়ের নলার অর্ধেক নিচে পর্যন্ত ঝুলে ছিলো।

٢٦٢. عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَيْتُ اِزَارَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَسْفَلَ مِنْ عَضَلَةِ السَّاقِ -

২৬২. হযরত উবায়দা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় এসে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরনের লুঙ্গি তাঁর পায়ের গোছার নিচে পর্যন্ত নামানো।

٢٦٣. عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتَّزَرَ يَضَعُ صَنَفَةَ اِزَارِهِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى -

২৬৩. হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ লুঙ্গি পরিধান করলে লুঙ্গির প্রান্তের অর্ধাংশ তাঁর বাম উরুর ওপর রাখতেন (যাতে চলার সময় খুলে না যায়)।

٢٦٤. عَنْ اَبِىْ الْعَالِيَةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِزَارُهُ اِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَكَانَ لَهُ اِزَارٌ قَدْ اَسْبَلَ خُيُوْطَةً فَلَمْ يَجُزَّهُ وَلَمْ يَكُفَّهُ -

২৬৪. আবুল আলীয়া (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর লুঙ্গি পায়ের নলার অর্ধাংশ পর্যন্ত থাকতো। তাছাড়া তাঁর একটি লুঙ্গির সুতা ঝুলে ছিল। তিনি সেগুলি কেটেও ফেলেন নি কিংবা সেলাই করে আটকিয়েও দেননি।

٢٦٥. اَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَاْتَزِرُ فَيَضَعُ حَاشِيَةَ اِزَارِهِ مِنْ مُقَدَّمِهِ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ وَيَرْفَعُ مُؤَخَّرَهُ فَقُلْتُ مَاهٰذِهِ الاِزَارَةُ ؟ فَقَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَاْتَزِرُهَا -

২৬৫. ইকরিমা (র) বর্ণনা করেন ঃ আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে দেখেছি তিনি লুঙ্গির সম্মুখ ও প্রান্তভাগ পায়ের উপর ঝুলিয়ে পরতেন এবং পেছনের অংশ উঁচু রাখতেন। আমি তাঁকে বললাম, এটা লুঙ্গি পরিধানের কোন্ নিয়ম ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এভাবেই লুঙ্গি পরিধান করতে দেখেছি।

ফায়দা ঃ সাহাবায়ে কিরাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে যেভাবে কাজকর্ম করতে দেখতেন নিজেরাও সেভাবেই তা করার অভ্যাস গড়ে তুলতেন। সুতরাং ইব্ন আব্বাস (রা) শেষ বয়সে নবী ﷺ-এর শরীর মুবারক কিছুটা মোটা হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে যেভাবে লুঙ্গি পরতে দেখেছেন তিনিও তা অনুসরণের জন্য সেভাবেই পরতে শুরু করেছিলেন এবং ইকরিমার প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে, আমি যেহেতু নবী ﷺ-কে এভাবে লুঙ্গি পরতে দেখেছি তাই আমিও সেভাবেই পরে থাকি। সত্যিই প্রকৃত ভালবাসা ও ভালবাসার পাত্রের সাথে সম্পর্কের দাবি হলো, যিনি ভালবাসবেন তিনি প্রেমাস্পদের প্রতিটি ভঙ্গিকে আত্মস্থ করে নিবেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এ আগ্রহ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। এ ব্যাপারে তাঁরা নিজেরাই ছিলেন উদাহরণ। মহান আল্লাহ্ সমস্ত মুসলিমকে তাঁর হাবীবের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্যের তাওফীক দান করুন।

٢٦٦. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ يَحْيٰى مِثْلَهُ -

২৬৬. মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইয়াহ্ইয়াও উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٦٧. عَنِ الْهُجَيْمِىْ اَنَّهُ لَقِىَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ مُتَّزِرٌ بِاِزَارِ قُطْنٍ قَدْ انْتَثَرَتْ حَاشِيَتُهُ -

২৬৭. হযরত হুজায়মী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সেই সময় তিনি এমন একখানা সুতি লুঙ্গি পরিহিত ছিলেন, যার প্রান্তভাগ ছিল এলোমেলো।

٢٦٨. عَنِ الْحَسَنِ (الْبَصْرِىُّ) اَنَّ شَيْخًا مِنْ بَنِىْ سَلِيْطٍ اَخْبَرَهُ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُكَلِّمُهُ فِىْ شَىْءٍ اُصِيْبَ لَنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ - فَاِذَا هُوَ قَاعِدٌ وَعَلَيْهِ حَلْقَةٌ قَدْ اَطَافَتْ بِهٖ وَهُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَعَلَيْهِ اِزَارُ قُطْنٍ لَهُ غَلِيْظٍ -

২৬৮. হাসান বস্‌রী (র) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেন) বনী সালীত গোত্রের এক সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে বলেন যে, আমি জাহেলী যুগে একটি বিষয়ে কথা বলার জন্য নবী ﷺ -এর কাছে গেলাম। তিনি সে সময় উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর চারপাশে মানুষ বৃত্তাকারে বসেছিলো এবং তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলছিলেন। সেই সময় তিনি একখানা মোটা সুতি লুঙ্গি পরেছিলেন।

ফায়দা ঃ এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খুব মোটা সুতি লুঙ্গিও পরিধান করেছেন।

٢٦٩. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كِسَاءً فَدَكِيًا فَاَدَارَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ هٰؤُلَاءِ اَهْلُ بَيْتِىْ وَحَامَتِىْ -

২৬৯. হযরত উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফাদাকে তৈরি একটি চাদর নিলেন এবং তার মধ্যে আহ্‌লে বায়তদের নিয়ে বললেন, এরাই হচ্ছে আমার আহলে বায়ত এবং আমার পরিবার।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটিতেও যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাদরের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তাই সেই সূত্র ধরে গ্রন্থকার হাদীসটি এখানে উল্লেখ করেছেন। নবী ﷺ-এর আহলে বায়তদেরকে চাদরের মধ্যে নেয়া সম্পর্কিত ঘটনা সবিস্তার জানার জন্য তাফসীর গ্রন্থ সমূহে সূরা আহ্‌যাবের يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الاية আয়াতটির ব্যাখ্যা দেখা যেতে পারে।

صِفَةُ رِدَائِهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পবিত্র চাদরের বর্ণনা

٢٧٠ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِى غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ ـ

২৭০. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাথে পথে চলছিলাম। সে সময় তাঁর গায়ে নাজরানে তৈরি মোটা পাড়বিশিষ্ট একখানা চাদর ছিলো।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটিতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পবিত্র চাদরের বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তিনি নাজরানের তৈরি মোটা পাড় বিশিষ্ট চাঁদর ব্যবহার করেছেন।

٢٧١ . عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ طُوْلُ رِدَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعَةَ اَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَاعَيْنِ وَنِصْفًا وَكَانَ لَهُ ثَوْبٌ اَخْضَرُ يَلْبَسُهُ لِلْوُفُوْدِ اِذَا قَدِمُوْا عَلَيْهِ ـ

২৭১. হযরত উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চাদর চার হাত লম্বা ও আড়াই হাত প্রস্থ ছিল। তাঁর কাছে সবুজ রঙের একখানা কাপড় ছিল। বাইরের প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে সাক্ষাতের জন্য আসলে তিনি তা পরিধান করে তাদের সাক্ষাৎ দিতেন।

ফায়দা ঃ নবী চার হাত দীর্ঘ ও আড়াই হাত প্রস্থের চাদর ব্যবহার করেছেন। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, তাঁর কাছে সবুজ রঙের একটি জুব্বা ছিলো। বিশেষ করে বাইরের প্রতিনিধিদল আগমন করলে তিনি সেটি পরিধান করে তাদেরকে সাক্ষাৎ দিতেন।

٢٧٢ . عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ كَانَ يَخْرُجُ فِيْهِ اِلَى الْوَفْدِ رِدَاءٌ وَثَوْبٌ اَخْضَرَ طُوْلُهُ اَرْبَعَةُ اَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٍ وَهُوَ عِنْدَ الْخُلَفَاءِ الْيَوْمَ قَدْ كَانَ خَلِقَ فَطَوَوْهُ بِثَوْبٍ يَلْبَسُوْنَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى ـ

২৭২. হযরত উরওয়া (রা) বলেন, যে পোশাক পরিধান করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বহিরাগত প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ দান করতেন তা ছিলো একখানা সবুজ চাদর ও জুব্বা। চাদরখানার দৈর্ঘ ছিলো চার হাত এবং প্রস্থ ছিলো দুই হাত ও এক বিঘত। নবী ﷺ-এর সেই জুব্বাটি বরকত লাভের জন্য বর্তমানে খলীফাদের কাছে সংরক্ষিত। জুব্বাটি খুবই পুরানো হয়ে

গিয়েছে। সংরক্ষণ ও সাবধানতার জন্য তাঁরা সেটিকে ভাঁজ করে আরেকটি কাপড়ের মধ্যে রেখেছেন। এবং তাঁরা কেবল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সময় তা ব্যবহার করে থাকেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের পোশাক ব্যবহার করতেন। এসব পোশাকের মধ্যে বিশেষ করে উক্ত সবুজ রঙের চাদর ও জুব্বার উল্লেখ পাওয়া যায়– যা তাঁর পরবর্তী খলীফাগণও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে দুই ঈদে ও অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যবহার করতেন। এ দু'টি পোশাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি সাধারণত আমাদের হিসাব অনুসারে দুই গজ লম্বা ও সোয়া গজ চওড়া চাদর ব্যবহার করতেন।

٢٧٣. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَوْمًا حَتّٰى بَلَغَ وَسَطَ الْمَسْجِدِ فَادْرَكَهُ اَعْرَابِىٌّ فَجَبَذَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ وَكَانَ رِدَاءً خَشِنًا فَحَمَّرَ رَقَبَتَهُ۔

২৭৩. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একদিন উঠে দাঁড়ালেন এবং মসজিদের মাঝখানে গিয়ে পৌছলেন। তখন এক বেদুঈন তাঁর কাছে গিয়ে পৌছলো এবং পেছন দিক থেকে তাঁর চাদর ধরে সজোরে টান দিলো। চাদর বেশ মোটা ছিলো। চাদর ধরে টান দেয়ায় তাঁর ঘাড়ে লাল দাগ পড়ে গেল।

ফায়দা ঃ এখানে নবী ﷺ-এর চাদরের উল্লেখ করাই কেবল গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ মোটা চাদর ব্যবহার করতেন।

٢٧٤. عَنْ اِسْمٰعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ثَوْبَانِ مَصْبُوْغَانِ بِالزُّعْفَرَانِ رِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ۔

২৭৪. ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন জা'ফর তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি এমন অবস্থায় নবী ﷺ-কে দেখেছি যখন তাঁর গায়ে জাফরানী রঙের দুইখানা কাপড় অর্থাৎ একখানা চাদর ও পাগড়ি ছিলো।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটিতেও নবী ﷺ-এর পবিত্র চাদরের উল্লেখ আছে। এ কারণে গ্রন্থকার হাদীসটি এখানে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া হাদীসটি থেকে এ কথাও জানা যায় যে, নবী ﷺ জাফরানী রঙের কাপড়ও ব্যবহার করেছেন। অধিক ব্যবহার অথবা ধোয়ার কারণে যার সুবাস নিঃশেষ হয়ে এসেছিলো।

বিভিন্ন হাদীসে পুরুষের জন্য জাফরানী রঙের এমন কাপড় ব্যবহারের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে যাতে এখনো জাফরানের প্রভাব অবশিষ্ট আছে। সুতরাং কুবলা বিনত্

মাখরামা (রা) একটি হাদীসে বলেন, আমি জাফরানী রঙের দু'খানা চাদর পরিহিত অবস্থায় নবী ﷺ-কে দেখেছিলাম। কাপড়ে তখন আর জাফরানের কোন প্রভাব অবশিষ্ট ছিলো না। সুতরাং এ সব হাদীসের মধ্যে সমন্বয় হলো, জাফরানের সুগন্ধ বিদূরিত হওয়ার পরে তিনি ঐ সব কাপড় ব্যবহার করেছেন।

٢٧٥. عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ثَوْبَيْنِ اَصْفَرَيْنِ ـ

২৭৫. ইসমাঈল ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন জা'ফর (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ-এর পবিত্র দেহে হলুদ রঙের দু'খানা কাপড় দেখেছি।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, নবী ﷺ হলুদ রঙের কাপড় ব্যবহার করেছেন যাতে জাফরানের সুগন্ধি অবশিষ্ট ছিলো না।

٢٧٦. عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِنَّ النَّجَاشِيَّ كَتَبَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اِنِّى قَدْ زَوَّجْتُكَ امْرَاَةً مِنْ قَوْمِكَ وَهِىَ عَلَى دِيْنِكَ اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ وَاُهْدِىْ لَكَ هَدِيَّةً جَامِعَةً قَمِيْصًا وَسَرَاوِيْلَ وَعِطَافًا وَ خُفَّيْنِ سَاذِجَيْنِ، فَتَوَضَّاءَ النَّبِىُّ ﷺ وَمَسَحَ عَلَيْهَا قَالَ سُلَيْمَانُ قُلْتُ لِلْهَيْثَمِ مَا الْعِطَافُ؟ قَالَ الطَّيْلَسَانُ، قُلْتُ لِلْهَيْثَمِ اَلَيْسَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ؟ اِبْنَ حُجَيْرَةَ قَالَ قَوْمُهُ لِى وَشَدَّهُ اِبْنُ حُجَيْرَةَ ـ

২৭৬. দালহাম ইব্‌ন সালিহ্‌ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি শুনেছি, আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বুরাইদা (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, (হাবশার বাদশাহ্‌) নাজাশী, নবী ﷺ -কে পত্র লিখে জানালেন যে, আপনার কওমের ও আপনার দীনের অনুসারী উম্মে হাবিবা বিন্‌ত আবূ সুফিয়ানকে আপনার সাথে বিয়ে দিয়েছি এবং আপনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ উপহার অর্থাৎ কামিজ, পায়জামা, ইতাফ ও সাদা চামড়ার তৈরি মোজাও পাঠাচ্ছি। বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ ওযূ করে সেই মোজার ওপর 'মাসেহ্‌' করলেন। হাদীসের বর্ণনাকারী সুলাইমান বলেন, আমি আমার উস্তাদ হায়সামকে জিজ্ঞেস করলাম 'ইতাফ' কি? তিনি বললেন, কাঁধের ওপর রাখার সবুজ রঙের তায়লিসান চাদর। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি আবার হায়সামকে বললাম, সালহাম এবং আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন বুরায়দার মাঝখানে কি আর কোন বর্ণনাকারী নেই ? তিনি বললেন, তাদের মাঝখানে বর্ণনাকারী হলেন ইব্‌ন হুজায়রা। তিনি অত্যন্ত নির্ভরতার সাথে জোর দিয়ে বললেন যে, তাদের দু'জনের মধ্যকার বর্ণনাকারী ইব্‌ন হুজায়রা।

ফায়দা ঃ উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা বিন্ত আবূ সুফিয়ান (রা)-এর আসল নাম রামলা বিন্ত আবূ সুফিয়ান। প্রথমে তাঁর বিয়ে হয়েছিলো আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশের সাথে। আবদুল্লাহ্ মক্কা থেকে হিজরত করে হাবশায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে মুরতাদ হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং ঐ অবস্থায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু উম্মে হাবীবা (রা) ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। হাবশার বাদশাহ্ নাজাশী রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভিপ্রায় অবহিত হয়ে তাঁর সাথে উম্মে হাবীবার বিয়ে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল পরিমাণ মাহর আদায় করেন এবং বিভিন্ন আসবাবপত্রও উপহার হিসাবে প্রদান করেন। এসব উপহার সামগ্রীর মধ্যে কামিজ, পায়জামা, চাদর ও চামড়ার মোজার কথা এ হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নাজাশী চারশ দিনার মাহ্র নির্ধারণ করেছিলেন এবং নিজেই তা আদায় করেছিলেন। এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়, চোখে না দেখলেও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি নাজাশীর কত ভক্তি ও ভালবাসা ছিলো।

হাদীসে মোজার ওপর 'মাসেহ্' করার কথা বলা হয়েছে। এটা ফিকহ্র মাসয়ালা। চামড়ার মোজার ওপর 'মাসেহ্' করা সকল ইমামের মতে জায়েয। এমনকি সুতি বা পশমী মোজাও যদি এতটা মোটা হয় বা, তা পরে জুতা ছাড়াই রাস্তা চলা সম্ভব তাহলে অধিকাংশ ইমামের মতে তার ওপর 'মাসেহ্' করাও জায়েয। এর সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত এবং নিজ বাড়িতে অবস্থানকারীর জন্য একদিন ও একরাত। মোজা পরিধানকারী যদি এই সময়সীমার মধ্যে ওযূ করার জন্য মোজা না খুলে তার ওপর 'মাসেহ্' করেন তাহলে ওযূ বিশুদ্ধ হবে। বিস্তারিত জানার জন্য ফিকহ্ গ্রন্থসমূহ দ্রষ্টব্য।

ذِكْرُ حُلَّتِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর পোশাকের বর্ণনা

٢٧٧. عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِشْتَرٰى حُلَّةً بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ نَاقَةً فَلَبِسَهَا -

২৭৭. ইসহাক ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সাতাশটি উটের বিনিময়ে এক সেট পোশাক খরিদ করেছিলেন এবং তা পরিধানও করেছিলেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মূল্যবান পোশাক খরিদ করেছেন এবং তা পরিধানও করেছেন। তাছাড়া পূর্বে হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, হিমইয়ায়ের মুসলিম শাসক যু-ইয়াযান নবী ﷺ-এর জন্য তেত্রিশটি উটের বিনিময়ে পূর্ণাঙ্গ এক সেট পোশাক কিনে উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি ঐ পোশাক একবারমাত্র পরিধান করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ সাধারণত মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন না। তবে মাঝেমধ্যে পরিধান করেছেন। কারণ তিনি মূল্যবান ও চটকদার পোশাক পছন্দ করতেন না। কেননা এতে অহংকার ও আত্মপ্রীতি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। যাহোক, মানুষের কর্তব্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী পোশাক পরিধান করা, যাতে আল্লাহ্‌র নিয়ামতের প্রকাশ ও শুকরিয়া আদায় হয় এবং তাঁর নিয়ামতের অবমাননা না হয়। সুতরাং নবী ﷺ একটি হাদীসে বলেছেন ঃ لِبَاسَكُمْ اَحْسَنُوْا –উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করো। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِذَا اَتَاكَ اللّٰهُ مَالاً فَلْيُرَ اَثْرُ نِعْمَةِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهٖ (جَامِعُ الصَّغِيْرُ، ٢٣٥ جلد -١)

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ধন-সম্পদ দান করে থাকেন। তখন তোমার মধ্যে তাঁর নিয়ামত, মেহেরবানী ও পুরস্কারের চিহ্ন প্রকাশ পাওয়া উচিত অর্থাৎ তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত।

٢٧٨. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِىْ لِمَّةٍ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ اَحْسَنَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ -

২৭৮. বারাআ ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কখনো লাল চাদরে আবৃত কোন দীর্ঘ বাবরি চুল বিশিষ্ট লোককে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে অধিক সুন্দর দেখিনি।

ফায়দা ঃ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, পৃথিবীতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে অধিক সুদর্শন মানুষ সৃষ্টি হয়নি এবং হবেও না। তাঁর অতুলনীয় রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কিত বিভিন্ন হাদীস ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, নবী ﷺ যখন লাল রঙের পোশাক পরিধান করতেন তখন তাঁকে আরো অধিক সুন্দর মনে হতো। সম্পূর্ণ লাল রঙের পোশাক পরিধান করা পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। অন্য সব বর্ণনায় একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, নবী ﷺ যে লাল রঙের চাদর পরেছেন তা ছিলো কালো ডোরা বিশিষ্ট।

ذِكْرُ بُرْدَتِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর চাদরের বর্ণনা

٢٧٩. عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ اَىُّ اللِّبَاسِ اَحَبُّ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَوْ اَعْجَبُ اِلَيْهِ؟ قَالَ الْحِبَرَةُ ـ

২৭৯. কাতাদা (র) বর্ণনা করেন, আমি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ-এর কোন্ পোশাক সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় বা প্রিয় ছিলো ? তিনি বললেন, ইয়ামানের সুতির নক্‌শা করা চাদর।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, গায়ের ওপর রাখার মত পোশাকের মধ্যে ইয়ামানের তৈরি নক্‌শা করা চাদর তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিলো। অন্যান্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, পোশাকের মধ্যে জামা ছিলো তাঁর সবচেয়ে প্রিয়।

٢٨٠ . عَنْ اَنَسٍ اَنَّ اَعْرَابِيًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَسَأَلَهُ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ ـ

২৮০. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ-এর কাছে এক বেদুঈন এসে তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, সেই সময় নবী ﷺ-এর গায়ে একখানা ডোরা বিশিষ্ট চাদর ছিলো।

٢٨١. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ اَصْحَابِهِ وَاِذَا هُوَ مُحْتَبِىْ بِبُرْدِهِ قَدْ وَقَعَ هُدْبُهَا عَلٰى قَدَمِهِ ـ

২৮১. সুলাইমান ইব্‌ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তিনি তাঁর সাহাবাদের সাথে বসেছিলেন। একখানা চাদর দিয়ে তিনি তাঁর পিঠ ও পায়ের নলা জড়িয়ে রেখেছিলেন। চাদরের পাড় তাঁর পায়ের ওপর পড়েছিলো।

ফায়দা ঃ হাঁটু খাড়া করে পিঠ ও পায়ের গোছা কাপড়ে জড়িয়ে বসাকে 'ইহ্‌তিবা' বলে। এভাবে বসা সবচাইতে আরামদায়ক। এভাবে বসলে যথেষ্ট আরাম পাওয়া যায় এবং ক্লান্তি অনুভূত হয় না।

٢٨٢. عَنْ سُلَيْمِ بْنُ جَابِرٍ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَةٌ اِنَّ اَهْدَابَهَا لَعَلٰى قَدَمَيْهِ ـ

২৮২. সুলাইম ইব্ন জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে হাযির হলাম। তখন তিনি 'ইহ্তিবা' আকারে চাদর বেঁধে বসেছিলেন এবং চাদরের প্রান্তভাগ তাঁর দুই পায়ের ওপর পড়েছিলো।

٢٨٣ . عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَبِسَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَااَحْسَنَهَا عَلَيْكَ ! يَشْرَبُ بَيَاضُكَ سَوَادَهَا وَسَوَادُهَا بَيَاضَكَ ـ

২৮৩. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, একবার নবী ﷺ কালো রঙের ডোরা বিশিষ্ট চাদর পরিধান করলে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আপনার গায়ে এই কাল চাদরখানা কি সুন্দরই না মানিয়েছে। আপনার দেহের লাল-সাদা মিশ্রিত রং চাদরের কাল রঙকে অধিক ফুটিয়ে তুলছে এবং এর কাল রঙ আপনার শরীরের লাল-সাদা মিশ্রিত বর্ণকে আরো দীপ্তিময় করে তুলছে।

ফায়দা ঃ এটা স্বাভাবিক, সাদা ও কাল রঙের দু'টি জিনিসকে একত্র করলে বিপরীত দু'টি রং একটি আরেকটির ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। সেই সৌন্দর্য ও হৃদয়গ্রাহিতার কথা প্রকাশ পেয়েছে হযরত আয়েশা (রা)-এর মুখ থেকে। এ হাদীস থেকে এ কথাও জানা যায় যে, নবী ﷺ কাল রঙের চাদরও ব্যবহার করেছেন।

٢٨٤ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَلْبَسُ بُرْدَةً حِبَرَةً فِىْ كُلِّ عِيْدٍ ـ

২৮৪. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রত্যেক ঈদের সময় ডোরাদার ইয়ামানী চাদর পরিধান করতেন।

ফায়দা ঃ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত একটি হাদীসে বলা হয়েছে নবী ﷺ ডোরাদার ইয়ামানী চাদর পরিধান করা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। এ ধরনের চাদরকে আরবীতে 'আল হিবারা' বলা হয়। নবী ﷺ ঈদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময় এ ধরনের চাদর পরতেন। কোন আনন্দ উৎসব বা ঈদ প্রভৃতির সময় (সম্ভব হলে) উত্তম ও নতুন পোশাক পরিধান করার নির্দেশ রয়েছে।

٢٨٥ . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ بُرْدُ اَحْمَرُ يَلْبَسُ فِىْ الْعِيْدَيْنِ وَفِىْ الْجُمُعَةِ ـ

২৮৫. জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর একখানা লাল ডোরা বিশিষ্ট চাদর ছিলো। তিনি তা দুই ঈদ ও জুমু'আর দিনে পরিধান করতেন।

ফায়দা ঃ ওপরে উদ্ধৃত দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উত্তম পোশাক পরিধান করতেন।

٢٨٦. عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَاَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلَّةً حَمْرَاءَ مَارَاَيْتُ شَيْئًا قَطُّ اَحْسَنَ مِنْهُ ـ

২৮৬. বারাআ' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর গায়ে লাল ডোরা বিশিষ্ট এক সেট পোশাক দেখেছি। ঐ ধরনের পোশাকে আমি তাঁর চেয়ে সুন্দর আর কাউকে দেখিনি।

ফায়দা ঃ এখানেও লাল পোশাক বলতে লাল ডোরা বিশিষ্ট পোশাকই বোঝানো হয়েছে।

٢٨٧ . عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَاَيْتُ اَحَدًا فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُتَرَجِّلًا اَزْيَنَ وَاَجْمَلَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ شَعْرُهُ قَرِيْبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ ـ

২৮৭. বারাআ' ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লাল পোশাক পরিহিত এবং চুল চিরুনি করা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কোন লোককে আমি দেখিনি। এ সময় তাঁর চুল প্রায় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিলো।

ফায়দা ঃ চুলে তেল দেওয়া ও চিরুনি করা মুস্‌তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এজন্য উৎসাহিত করেছেন। তিনি নিজেও তাঁর চুল সময়মত চিরুনি করতেন। কিন্তু সর্বক্ষণ চুল চিরুনি করা ও পরিচর্যা করতে নিষেধ করেছেন। পুরুষদের উচিত দিনে একবার কিংবা একদিন পরপর চুল চিরুনি করা। একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন ঃ মাথার চুল উস্‌কু-খুস্‌কু ও অযত্নে রাখা উচিত নয়। মাথার চুল সম্পর্কে নবী ﷺ থেকে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কোন হাদীসে বলা হয়েছে, তাঁর মাথার চুল কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত লম্বা ছিলো। কোন হাদীসে বলা হয়েছে, তাঁর মাথার চুল কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত লম্বা ছিলো। আবার কোন হাদীসে বলা হয়েছে যে, তা প্রায় কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিলো। এটা মূলত বিভিন্ন সময় ও অবস্থার বর্ণনা। যখন তিনি চুল কাটাতেন তখন তা কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ থাকতো, কিছুদিন পর তা কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌছে যেতো এবং আরো দুই-চারদিন চুল কাটানোর সুযোগ না হলে তা প্রায় কাঁধ পর্যন্ত নেমে যেতো। চুল কাটানোর সময় তিনি অবশ্যই তা কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ রাখতেন। এর চাইতে বেশি ছোট করে কাটাতেন না। এই তিন প্রকারে চুল রাখা সুন্নত।

٢٨٨ . عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ النَّفْرِ بِالْاَبْطَحِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ سَاقِهِ مِنْ وَّرَائِهِ ـ

২৮৮. আওন ইব্‌ন আবূ হুজায়ফা তাঁর পিতা জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, (বিদায় হজ্জের সময়) মক্কা থেকে যাত্রা করলে আমি আবতাহ্ নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে হাযির হলাম। তিনি তখন লাল ডোরা বিশিষ্ট পোশাক পরে বাইরে আসলেন। সেই (লাল পোশাকে) তাঁর পায়ের নলার লাল সাদা মিশ্রিত রঙের দীপ্তি এখনো যেন আমি আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকেও জানা যায় যে, তিনি লাল ডোরা বিশিষ্ট পোশাক পরিধান করেছেন।

٢٨٩ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى اُسَامَةَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قِطْرِىٌّ -

২৮৯. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ উসামা ইব্‌ন যায়িদ -এর কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে আসলেন। সেই সময় তাঁর গায়ে কাতারে তৈরি অথবা মোটা বুটিদার একখানা চাদর ছিলো।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজনে অতি প্রিয়জনের কাঁধে হাত রেখে চলা জায়েয।

٢٩٠ . عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ اَمْشِى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِىٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ -

২৯০. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে পথ চলছিলাম। সেই সময় তাঁর গায়ে একখানা মোটা পাড়ের নাজরানী চাদর ছিলো।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ নাজরানে তৈরি মোটা পাড়বিশিষ্ট চাদরও ব্যবহার করেছেন।

٢٩١ . عَنْ اَبِى رِمْثَةَ اَنَّهُ رَاَى النَّبِىَّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ -

২৯১. আবূ রামসা (রা) বর্ণনা করেন, তিনি নবী ﷺ-কে দুইখানা সবুজ চাদর পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। (একখানা ছিলো তাঁর গায়ে এবং আরেকখানা ছিলো লুঙ্গি হিসেবে পরনে)।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, তিনি ﷺ সবুজ রঙের চাদরও পরিধান করতেন।

٢٩٢ . عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ ثَوْبَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّذِىْ كَانَ يَخْرُجُ فِيْهِ اِلَى الْوَفْدِ ثَوْبٌ اَخْضَرُ طُوْلُهُ اَرْبَعَةُ اَذْرُعٍ وَعَرْضُهُ ذِرَاعَانِ وَشِبْرٌ فَهُوَ عِنْدَ الْخُلَفَاءِ قَدْ خَلِقَ فَبَطَنُوْهُ بِثَوْبٍ يَلْبَسُوْنَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالاَضْحٰى -

২৯২. উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত যে, যে পোশাক পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করতেন তা ছিল সবুজ রঙের। তার দৈর্ঘ ছিলো চার হাত এবং প্রস্থ ছিলো আড়াই হাত। অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় এখন তা খলীফাদের কাছে রক্ষিত আছে। সাবধানতার জন্য তাঁরা সেটি ভাঁজ করে অন্য কাপড়ের মধ্যে রেখেছেন। শুধুমাত্র ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার সময় তাঁরা তা পরিধান করে থাকেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটিও ইতিপূর্বে ২৭২ ক্রমিকে উল্লিখিত হাদীসে কিছুটা শাব্দিক তারতম্য সহকারে বর্ণিত হয়েছে। দু'টি হাদীসের বিষয়বস্তু একই।

ذِكْرُ عِمَامَتِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর পাগড়ির বর্ণনা

٢٩٣. عَنْ جَعْفَرَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ۔

২৯৩. হযরত জাফর ইব্‌ন আম্‌র ইব্‌ন হুরাইস (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি নবী ﷺ-কে কালো পাগড়ি বাঁধা অবস্থায় খুত্‌বা দিতে দেখেছি।

٢٩٤. عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ دَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ۔

২৯৪. আবূ যুবায়র (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মাথায় কালো পাগড়ি বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

٢٩٥. عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَعَمَّمَ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ۔

২৯৫. হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে কালো পাগড়ি বাঁধতে দেখেছেন।

ফায়দা ঃ পাগড়ি পরা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ প্রায়ই পাগড়ি পরতেন। তিনি পাগড়ি পরতে উৎসাহিত করতেন। হযরত উবাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা পাগড়ি পরিধান করো। কারণ পাগড়ি ফেরেশ্‌তাদের বিশেষ প্রতীক (অর্থাৎ ফেরেশ্‌তাগণ পাগড়ি পরে থাকেন) আর পাগড়ির প্রান্তভাগকে পিঠের ওপর লটকিয়ে দাও। (মিশকাত, পৃষ্ঠা ৩৭৭)

এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে নবী ﷺ ওপরে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রে কালো রঙের পাগড়ি পরেছেন। তবে বেশির ভাগ সময়ে তিনি সাদা পাগড়ি পরিধান করতেন। যেহেতু রঙের মধ্যে সাদা রঙই ছিলো তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়। একটি হাদীসে নবী ﷺ বলেছেন ঃ সাদা পোশাকই তোমাদের সর্বোত্তম পোশাক। তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে দাফন করো। তাই অধিকাংশ সময় তাঁর পাগড়ি হতো সাদা রঙের। কিন্তু বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কালো রঙের পাগড়ি ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ মক্কা বিজয় কিংবা খুত্‌বা ইত্যাদির সময়। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, এসব ক্ষেত্রে নবী ﷺ -এর কালো পাগড়ি পরিধান ছিলো নেতৃত্বের প্রতীকস্বরূপ। আরবী ভাষায় কালো রঙকে سواد বলে। আর سواد শব্দ থেকেই سود শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ নেতৃত্ব। বড় আকারের মানব সমাবেশকে আরবীতে سواد اعظم বলা হয়। সুতরাং ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, বনূ আব্বাস (রা) এই দিকটি বিবেচনা করেই কালো রঙকে নিজেদের প্রতীক বানিয়েছিল।

নবী ﷺ -এর পবিত্র পাগড়ির পরিমাপ সম্পর্কে আল্লামা জাযরী (র) লিখেছেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর পাগড়ির সঠিক পরিমাপ জানার জন্য অনুসন্ধান চালিয়েছি, যাতে কোন এক জায়গা থেকে তা জানতে পারি। কিন্তু আমি সঠিক পরিমাপ জানতে পারিনি। তবে আমার এক নির্ভরযোগ্য মুরব্বী আল্লামা নববী (র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ -এর পাগড়ি ছিলো দুই প্রকারের। ছোট এবং বড়। তাঁর ছোট পাগড়ির দৈর্ঘ ছিলো সাত হাত এবং বড় পাগড়ির দৈর্ঘ ছিলো বার হাত। (মিরকাত)

পাগড়ির বহুবিধ পার্থিব উপকারিতাও রয়েছে। যেমন সূর্যের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া, প্রভাব ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি, দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া ইত্যাদি।

٢٩٦ . عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَالْغُبَارُ عَلٰى كَتِفَيْهِ ـ

২৯৬. হযরত জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যে সময় মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি ছিলো এবং তাঁর দুই কাঁধের ওপর ধুলাবালি জমে ছিলো।

٢٩٧. عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْتَمُّ؟ قَالَ يُدِيْرُ كُوْرَ الْعِمَامَةِ عَلٰى رَأْسِهٖ وَيَغْرِسُهَا مِنْ وَرَائِهٖ وَيُرْخِىْ لَهَا ذُؤَابَةً بَيْنَ كَتِفَيْهِ، قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ـ

২৯৭. খালিদ হায্যা (র) আবূ আবদুস্ সালাম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিভাবে পাগড়ি পরতেন ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাগড়িটা মাথায় জড়াতেন এবং তার প্রান্তভাগ পেছনের দিকে ভাঁজের মধ্যবর্তী স্থানে লটকিয়ে দিতেন। নাফি' (হাদীস বর্ণনাকারী) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-ও সব সময় এভাবে পাগড়ি বাঁধতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীসে নবী ﷺ -এর পাগড়ি বাঁধার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। এটাই পাগড়ি বাঁধার সুন্নত পদ্ধতি। আলিমগণ আজ পর্যন্ত এই নিয়মেই পাগড়ি বেঁধে থাকেন।

٢٩٨. عَنْ جَعْفَرَ بْنِ مَحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَسَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيْمًا عِمَامَةً يُقَالُ لَهَا السَّحَابُ فَاقْبَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ ﷺ هٰذَا عَلِيٌّ قَدْ اَقْبَلَ فِيْ السَّحَابِ فَحَرَّفَهَا هٰؤُلَاءِ فَقَالُوْا عَلِيٌّ فِيْ السَّحَابِ ـ

২৯৮. জাফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তাঁর দাদা বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আলী (রা)-কে সাহাব (মেঘ) নামক একটি পাগড়ি পরিয়েছিলেন। এক সময় আলী (রা) সেই পাগড়ি পরে নবী ﷺ-এর কাছে আসলেন। তিনি বললেন, এই তো সাহাব (মেঘ) পরে আলী (রা) এসেছেন। কিন্তু এই সব লোক এই বিষয়টিকে বিকৃত করে বলতে শুরু করেছে যে, আলী (রা) মেঘের মধ্যে আছেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীসটি বর্ণনায় গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এ কথা তুলে ধরা যে, নবী ﷺ-এর কাছে 'আস্ সাহাব' (মেঘ) নামের একটি পাগড়ি ছিলো। তিনি হযরত আলী (রা)-কে সেই পাগড়িটা উপহার দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা) সেটি পরিধান করতেন। একদিন তিনি সেটি পরিধান করে নবী ﷺ-এর দরবারে হাযির হলে তিনি বললেন, দেখো! আলী সাহাব পাগড়ি পরিধান করে আসছে। বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসের এই কথাটা বিকৃত করে গোঁড়া শী'আরা এই বলে তাদের দাবি প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছে যে, নবী ﷺ বলেছেন, হযরত আলী মেঘের মধ্যে অর্থাৎ আসমানে আছেন। সুতরাং তারা বিশ্বাস করে যে, হযরত আলী (রা)-কে আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। কিছুকাল পরে তিনি এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। এটা যে বিকৃতি ও সত্য গোপন তা সুস্পষ্ট। নবী ﷺ তো বলেছিলেন যে, আলী 'সাহাব' নামক পাগড়ি পরে আসছে।

٢٩٩. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا اعْتَمَّ سَدَلَ عِمَامَتَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ ـ

২৯৯. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ পাগড়ি পরিধান করলে তাঁর শামলা (প্রান্তভাগ) দুই কাঁধের মধ্যখানে লট্‌কিয়ে দিতেন।

٣٠٠. عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَسْدُلُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ ـ

৩০০. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পাগড়ির প্রান্তভাগে দুই কাঁধের মধ্যস্থানে লট্‌কিয়ে দিতেন।

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর অভ্যাস ছিলো পাগড়ি বাঁধলে তিনি তার প্রান্তভাগ দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে লট্‌কিয়ে দিতেন। এটাই উত্তম ও সুন্নত পন্থা।

٣٠١. عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَوَضَّاُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قَطَرِيَّةٌ

৩০১. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে ওযূ করতে দেখলাম। সেই সময় তিনি কাতারে তৈরি একটি পাগড়ি পরেছিলেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাতারে তৈরি পাগড়িও পরিধান করেছেন। قطرى বলে কাতার শহরের সাথে সম্পর্কিত বোঝানো হয়েছে। সেই যুগে ঐ শহর থেকে উন্নতমানের কাপড় প্রস্তুত হয়ে আসতো।

٣٠٢. عَنْ اَنَسٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ ـ

৩০২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন নবী ﷺ কাল রঙের পাগড়ি পরিধান করে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

ذِكْرُ قَلَنْسُوَتِهِ ﷺ
নবী ﷺ -এর টুপির বর্ণনা

٣٠٣. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ ـ

৩০৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন কোন সময় সাদা টুপি পরিধান করতেন।

٣٠٤. عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ شَامِيَّةٌ ـ

৩০৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শামে (সিরিয়ার) তৈরি সাদা টুপি পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

٣٠٥. عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ مِنَ الْقَلَانِسِ فِى السَّفَرِ ذَوَاتَ الاٰذَانِ وَفِى الْحَضَرِ الْمُشَمَّرَةِ يَعْنِىْ الشَّامِيَّةَ ـ

৩০৫. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, সফরে নবী ﷺ এমন টুপি পরিধান করতেন যা দ্বারা কান ঢাকা যায় এবং বাড়িতে অবস্থানকালে শামে তৈরি (সাধারণ) টুপি পরিধান করতেন।

ফায়দা ঃ নবী ﷺ -এর অভ্যাস ছিলো সফরে ধুলাবালি ও বাতাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কান ঢাকা যায় এবং কোন প্রকার কষ্ট না হয় এমন টুপি ব্যবহার করা।

٣٠٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثُ قَلَانِسَ قَلَنْسُوَةٌ بَيْضَاءُ مُضَرَّبَةٌ وَقَلَنْسُوَةٌ بُرْدٌ حِبَرَةٌ وَقَلَنْسُوَةٌ ذَاتُ اٰذَانٍ يَلْبَسُهَا فِىْ السَّفَرِ وَرُبَّمَا وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِذَا صَلّٰى-

৩০৬. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর তিন প্রকার টুপি ছিলো। সাদা তুলার আস্তরণ বিশিষ্ট টুপি, ডোরাদার ইয়ামানী চাদর দ্বারা নির্মিত টুপি এবং কান ঢাকা যায় এমন টুপি যা তিনি সফরকালে পরতেন এবং কখনো কখনো সালাত পড়ার সময় সেটিকে সামনে রেখে দিতেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ তিন রকম টুপি ব্যবহার করেছেন। বর্তমানেও পবিত্র মক্কায় তুলার আস্তরণ বিশিষ্ট টুপির প্রচলন আছে এবং সেখানকার মানুষ সাধারণত এই টুপি ব্যবহার করেন। নবী ﷺ কখনো ইয়ামানের তৈরি ডোরাদার কাপড়ের টুপিও ব্যবহার করেছেন। তাছাড়া কান ঢাকা যায় এমন টুপিও তিনি ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে এর আগের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষোক্ত ধরনের টুপি যেহেতু তিনি সফরের প্রয়োজনে ব্যবহার করতেন তাই সালাতের সময় তা খুলে সামনে রেখে দিতেন।

٣٠٧. عَنْ حُزَيْزِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ بُسْرٍ فَقُلْتُ اَخْبِرْنِىْ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَلَهُ قَلَنْسُوَةٌ طَوِيْلَةٌ وَقَلَنْسُوَةٌ لَهَا اُذُنَانِ وَقَلَنْسُوَةٌ لَاطِيَةٌ-

৩০৭. হুজাইয ইব্‌ন উসমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন বুস্‌র (রা)-এর সাথে দেখা হলে আমি তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে বললাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর কাছে তিন ধরনের টুপি দেখেছি। একটি লম্বা টুপি, একটি দুই কান বিশিষ্ট (কান ঢাকা যায় এমন) টুপি এবং একটি মাথার সাথে লেগে থাকা টুপি।

ফায়দা ঃ এ হাদীসেও নবী ﷺ -এর তিন প্রকারের টুপি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'লম্বা টুপি' অর্থ ইয়ামানে তৈরি লম্বা ডোরাদার টুপি, সফরকালীন কান ঢাকা টুপি এবং মাথার সাথে লেপটে থাকা তুলার আস্তরণ বিশিষ্ট টুপি।

ذِكْرُ سَرَاوِيْلِهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পায়জামার বর্ণনা

٣٠٨. عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَبْلَ اَنْ يُهَاجِرَ فَبِعْتُهُ شِقَّ سَرَاوِيْلَ فَوَزَنَ لِىْ وَاَرْجَعَ -

৩০৮. ইব্ন সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হিজরতের পূর্বে মক্কায় আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর খিদমতে হাযির হলাম এবং তাঁর কাছে পায়জামার এক টুকরা কাপড় বিক্রি করলাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে ওযন করে তার মূল্য দিলেন এবং ওযনে বেশি দিলেন।

٣٠٩. عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ اَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِى بَزًّا مِنْ هَجَرَ اِلٰى مَكَّةَ فَاَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاشْتَرٰى سَرَاوِيْلاً وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالاَجْرِ فَقَالَ اِذَا وَزَنْتَ فَارْجَحْ -

৩০৯. সুওয়াইদ ইব্ন কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং মাখরামা আল আবদী (রা) হাজার এলাকা থেকে কিছু কাপড় মক্কায় বিক্রি করার জন্য আনলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদের কাছে এসে একটি পায়জামা খরিদ করলেন। সেখানে এক ব্যক্তি ছিলো যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওযন করে দিতো। তিনি তাকে বললেন, ওযন করে দেয়ার সময় ওযনে বেশি করে দিবে।

ফায়দা ঃ এ দু'টি হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ পায়জামা খরিদ করেছিলেন। তবে, এ ব্যাপারে তিনি নিজে পায়জামা পরিধান করেছেন কিনা মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশ আলিমের মত হচ্ছে, তিনি নিজে পায়জামা পরিধান করেছেন তার কোন প্রমাণ নেই। তিনি সব সময় লুঙ্গি পরিধান করেছেন। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, তাঁর কাছে পায়জামা ছিলো এবং তিনি নিজে তা খরিদ করেছিলেন। কোন জিনিস সাধারণত ব্যবহার করার জন্যই খরিদ করা হয়। সুতরাং তা ব্যবহারেও কোন দ্বিধা থাকা উচিত নয়, বিশেষত সাহাবায়ে কিরাম (রা) যখন পায়জামা পরিধান করেছেন এবং তিনি তা নিষেধ করেন নি।

ذِكْرُ صُوْفِهِ ﷺ

নবী ﷺ-এর পশমী পোশাকের বর্ণনা

٣١٠ . عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ خِيْطَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ جُبَّةٌ مِنْ صُوْفِ اَنْمَارٍ فَلَبِسَهَا فَمَا اَعْجَبَ بِثَوْبٍ مَااَعْجَبَ بِهِ فَجَعَلَ يَمَسُّهُ بِيَدِهِ هٰكَذَ وَيَقُوْلُ اُنْظُرُوْا مَااَحْسَنَهَا وَفِى الْقَوْمِ اَعْرَابِىٌّ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هَبْهَا لِىْ فَخَلَعَهَا فَدَفَعَهَا فِىْ يَدِهِ قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِمِثْلِهِ اَن يَحَاكَ وَتُوُفِّى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَحَاكَةِ ـ

৩১০. হযরত সাহল ইব্‌ন সাদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য বিভিন্ন রংয়ের সংমিশ্রণে একটি পশমী জুব্বা তৈরি করা হলে তিনি তা পরিধান করলেন এবং ঐ পোশাকে তিনি যত খুশি হয়েছিলেন ইতিপূর্বে আর কোন পোশাকে তত খুশি হননি। তিনি জুব্বাটি হাত দিয়ে এভাবে স্পর্শ করছিলেন এবং বলছিলেন, দেখো এটা কত সুন্দর! এই সময় সেখানে উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বেদুঈন ছিলো। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি আমাকে উপহার দিন। তিনি তখনই জুব্বাটি খুলে তার হাতে তুলে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, পরে তিনি অনুরূপ আরেকটি জুব্বা বানানোর নির্দেশ দিলেন। উক্ত জুব্বা তৈরি করার কাজ চলছিলো–এমন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ওফাত হয়ে গেল।

ফায়দা ঃ এই পশমী পোশাকটি তাঁর খুবই পছন্দ হয়েছিলো। তিনি সেটির প্রশংসাও করেছিলেন। কিন্তু বেদুঈন লোকটি সেটি তাঁর কাছে উপহার হিসাবে চেয়ে নিলে তিনি অনুরূপ আরেকটি জুব্বা তৈরির নির্দেশ দিলেন। এ হাদীস থেকে নবী ﷺ-এর বদান্যতা ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বিনাদ্বিধায় তাঁর প্রিয় জুব্বাটি চাওয়া মাত্র বেদুঈনকে হাদিয়া হিসেবে প্রদান করলেন।

٣١١ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ جُبَّةِ صُوْفٍ لَيْسَ عَلَيْهِ اِزَارٌ وَلَا رِدَاءٌ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ ـ

৩১১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (কোন এক সময়) নবী ﷺ শুধুমাত্র পশমী জুব্বা পরিধান করে সালাত পড়ছিলেন। সেই সময় তাঁর পরনে কোন লুঙ্গি বা চাদর ছিলো না। প্রত্যেক বার 'রুকূ' করার সময় তিনি হাত উঠিয়েছিলেন।

٣١٢. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَّةً فِىْ جُبَّةٍ مِنْ صُوْفٍ رُوْمِيَّةٍ ضَيِّقَةِ الْكُمَّيْنِ-

৩১২. হযরত উবাদা ইব্ন সামিত (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একবার রোমে তৈরি সংকীর্ণ হাতা বিশিষ্ট পশমী জুব্বা পরে আমাদের সালাত পড়িয়েছেন।

٣١٣ . عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ جُبَّةً مِنْ صُوْفٍ-

৩১৩. হযরত উরওয়া ইব্ন মুগীরা (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গায়ে একটি পশমী জুব্বা দেখেছি।

٣١٤. عَنِ الْمُغِيْرَةَ قَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ جُبَّةُ صُوْفٍ-

৩১৪. হযরত মুগীরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে একটি পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি।

ফায়দা ঃ এসব হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী ﷺ পশমী জুব্বা পরিধান করেছেন।

٣١٥. عَنْ اَنَسٍ قَالَ لَبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصُّوْفَ وَاحْتَذَى الْمَخْصُوْفَ وَلَبِسَ خَشِنًا وَ اَكَلَ بِشَعًا - فَسَاَلْتُ الْحَسَنَ مَاالْبَشَعُ ؟ قَالَ غَلِيْظُ الشَّعِيْرِ مَاكَانَ يُسِيْغُهُ اِلاَّ بُجْرِعَةِ مَاءٍ-

৩১৫. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ পশমী কাপড়, তালি দেওয়া জুতা ও মোটা বস্ত্র পরিধান করেছেন এবং অরুচিকর খাবার খেয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হাসানকে জিজ্ঞেস করলাম অরুচিকর খাবার কি ? তিনি বললেন, মোটা যব যা পানি ছাড়া গলাধঃকরণ করা যায় না।

ফায়দা ঃ এই হাদীস থেকে অনুমান করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত সহজ-সরল জীবন যাপন করেছেন। তিনি রাজা-বাদশাদের মত আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করেননি। সুতরাং পশমী ও সূতী মোটা কাপড় পেলে তাই পরেছেন। তালি দেওয়া জুতা ব্যবহার করেছেন এবং অতি সাধারণ খাবার পেলে তাই খেয়েছেন। যা পেয়েছেন দ্বিধাহীন চিত্তে সহজে তাই ব্যবহার করেছেন, যদিও সামান্য ইংগিত দিলে সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারতো। তিনি উত্তম পোশাক ও উন্নতমানের সুস্বাদু খাদ্য যোগাড় করতে পারতেন। কিন্তু তিনি কখনো সেদিকে আগ্রহান্বিত হননি। তাঁর এই সাদামাটা পূত-পবিত্র জীবন মানুষের মনকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলো। তাঁর পবিত্র জীবন দেখেই মানুষ ইসলামের সত্যতা ও কল্যাণকারিতা উপলব্ধি করতো। এত অল্প সময়ে অলৌকিকভাবে গোটা

বিশ্বে ইসলামের বিস্তারের সবচেয়ে বড় কারণ ছিলো তাঁর পবিত্র জীবন। তাঁর পবিত্র জীবন আজও সারা বিশ্বের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। আল্লাহ্‌ প্রত্যেক মুসলমানকে তাঁর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের তাওফীক দান করুন।

٣١٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُبَّمَا صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ جُبَّةٍ مِنْ صُوْفٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا ـ

৩১৬. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ কখনো কখনো শুধু পশমী জুব্বা পরে সালাত পড়েছেন। সেটি ছাড়া তাঁর গায়ে অন্য কোন কাপড় থাকতো না।

٣١٧. عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ الصُّوْفَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيُرَقِّعُ الْقَمِيْصَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَقُوْلُ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ ـ

৩১৭. আবূ আইউব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ পশমী বস্ত্র পরিধান করতেন, জুতা সেলাই করতেন, জামায় তালি লাগাতেন, গাধার পিঠে আরোহণ করতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের প্রতি আগ্রহী নয় সে আমার (উম্মত) নয়।

٣١٨. عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ شَكَّ اَبُوْ زُهْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلْبَسُ الصُّوْفَ وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَعْتَقِلُ الشَّاةَ وَيَاْتِيْ مَدْعَاةَ الضَّعِيْفِ ـ

৩১৮. আবূ বুরদা তাঁর পিতা (আবূ মূসা আশআরী) (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, (বর্ণনাকারী আবূ যুহরা আবূ মূসা আশআরী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে ইনশাআল্লাহ্‌ বলেছেন।) তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ ﷺ মোটা পশমী কাপড় পরিধান করতেন, গাধার পিঠে সওয়ার হতেন, বকরী দোহন করতেন এবং দুর্বল ও অসহায়দের ডাকে সাড়া দিতেন।

ফায়দা : নবী ﷺ কতটা সহজ-সরল জীবন যাপন করতেন এ দু'টি হাদীস থেকেও তা জানা যায়। তিনি এমন কি পারিবারিক কাজকর্ম করতেও দ্বিধা সংকোচ অনুভব বা অপমান বোধ করতেন না। তিনি নিজের সব রকম কাজ নিজেই করতেন।

٣١٩. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ صُنِعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بُرْدَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ صُوْفٍ فَلَبِسَهَا فَاَعْجَبَتْهُ فَلَمَّا عَرِقَ فِيْهَا فَوَجَدَ رِيْحَ الصُّوْفِ فَقَذَفَهَا ـ

৩১৯. হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর জন্য একখানা কালো পশমী চাদর তৈরি করা হলে তিনি তা পরিধান করলেন এবং খুবই পছন্দ করলেন। কিন্তু ঘামে ভিজে তা থেকে পশমের গন্ধ আসছে দেখে তিনি তা পরিত্যাগ করলেন।

ফায়দা ঃ এ হাদীস থেকে জানা যায়, নবী ﷺ পশমের তৈরি কালো রঙের চাদরও ব্যবহার করেছেন যা তাঁর খুব পছন্দনীয় ছিলো। তবে ঘামের গন্ধের কারণে তা বর্জন করেন। এ হাদীস থেকে তাঁর সুন্দর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

ذِكْرُ لِبَاسِهِ الْكَتَانَ وَالْقُطْنَ وَالْيَمْنَةَ ﷺ

নবী ﷺ-এর কাতান, তুলা ও ইয়ামানী পোশাক ব্যবহার করার বর্ণনা

٣٢٠. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا جَلِيْسُ لأَيُّوْبِ قَالَ دَخَلَ الصَّلْتُ بْنُ رَاشَدٍ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوْفٍ وَاِزَارُ صُوْفٍ وَعِمَامَةُ صُوْفٍ فَاشْمَازَّمِنْهُ مُحَمَّدُ وَقَالَ اَظُنُّ اَنَّ اَقْوَامًا يَلْبِسُوْنَ الصُّوْفَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ لَبِسَهُ عِيْسٰى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَقَدْ حَدَّثَنِىْ مَنْ لاَ اَتَّهِمُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ لَبِسَ الْكَتَانَ وَالْقُطْنَ وَالْيَمْنَةَ وَسُنَّةُ نَبِيِّنَا ﷺ اَحَقُّ اَنْ تُتَّبَعَ ـ

৩২০. হাম্মাদ ইব্ন যায়দ (রা) হযরত আইউব (রা)-এর এক বন্ধুর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, সালত ইব্ন রাশিদ মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের কাছে গেলেন। সে সময় তিনি (সালত ইবন রাশেদ) পশমী জুব্বা, পশমী লুঙ্গি ও পশমী পাগড়ি পরিহিত ছিলেন। মুহাম্মাদ ইব্ন সীরীন তাঁর এই পোশাক অপছন্দ করলেন এবং বললেন, আমার ধারণা কিছু সংখ্যক লোক পশমী পোশাক পরিধান করে এবং বলে যে, ঈসা ইব্ন মারিয়াম (আ)-ও পশমী পোশাক পরিধান করেছেন। অথচ আমি যাকে মিথ্যা বলার সন্দেহ করতে পারি না– এমন একজন লোক আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সুতি, তুলা এবং নক্শাদার ইয়ামানী কাপড়ের পোশাক ব্যবহার করেছেন। আমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নতই অধিক অনুসরণযোগ্য।

ফায়দা ঃ সালত ইব্ন রাশিদ (রা) যেভাবে আপাদমস্তক শুধু পশমী পোশাক পরিধান করেছিলেন তা দেখে এ ধারণা হতে পারতো যে, এটি সুন্নত পোশাক। তাই ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সীরীনের অপছন্দ করার অর্থ এ নয় যে, নবী ﷺ কর্তৃক পশমী পোশাক পরিধান প্রমাণিত নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে পশমী বস্ত্র ছাড়া নবী ﷺ অন্যান্য পোশাকও পরিধান করেছেন এবং সেটিই তাঁর অগ্রাধিকারযোগ্য সুন্নত। সুতরাং পশমী পোশাককে প্রতীক